দুই শতাধিক
ইমাম ও দায়ীদের ফাত্ওয়া মতে
শরীয়াত পরীবর্তনকারী শাসকগণ মুরতাদ ও ত্বাগুত

শাইখ আবূ সুহাইব আবদুল আযীয্।

প্রকাশনায়ঃ
আদ্-দ্বীন পাবলিকেশন্স
৩৮/ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
web: www.esabahmedia.com

রচনায়ঃ
শাইখ আবূ সুহাইব আবদুল আযীয।

অনুবাদক
শাইখ সোলাইমান বিন আব্দুল্লাহ।

প্রকাশনায়ঃ
আদ্-দ্বীন পাবলিকেশন্স
৩৮/ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
web: www.esabahmedia.com

প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
মুফতি ইমতিয়াজ আহমদ
জি, গ্রাফ কম্পিউটার

গ্রাফিক্স
তওফিক আল-আজাদ

বিঃ দ্রঃ কোন রকম যোজন-বিয়োজন ব্যতীত সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য কেউ ছাপাতে চাইলে প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের সাতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

মূল্যঃ ১০০ (একশত) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। রহমত ও পরিপূর্ণ শান্তি বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর। যিনি ছিলেন সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ট মহামানব ও সর্বশ্রেষ্ট সমরবিদ। অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার পরিজন, আত্নীয়-স্বজন ও সাহাবাগণের উপর এবং সমস্ত উম্মাহ এর উপর।

বান্দার ইবাদাত, মোয়ামেলাত ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইন ও বিধান রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহর যিনি মানুষের প্রভু ও সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা। এছাড়া বিবাদ-বিসম্বাদ মিমাংসাকারী ও ঝগড়া-ঝাটি নিস্পত্তিকারী আইন প্রণয়নের অধিকার ও একমাত্র তাঁরই।

কোন আইন বান্দাদের জন্য উপযোগী, তা তিনিই জানেন। কিন্তু বর্তমানের শাসকগণ আল্লাহর শরীয়াতকে পরিবর্তন করেছে। তারা সূদ, যিনাকে হালাল করেছে, অথচ শরীয়াত প্রণেতা তা হারাম করেছেন। নিশ্চয় শরীয়াত পরীবর্তন করা আসমান ও যমীনে এর রবকে অস্বীকার করাকে বলে। ‘পরির্বতন’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা’আলা যা কিছু হালাল করেছেন, তা হারাম অভিহিত করা, অথবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল আখ্যায়িত করা। কেননা হালাল তো ওটা হবে যা আল্লাহ হালাল করেছেন, এবং হারামও ওটা হবে যা আল্লাহ তা’আলা হারাম ঘোষণা করেছেন। সূতরাং সৃষ্টি যেমন তারই অধিকার, তদ্রূপ নির্দেশ প্রদান শুধু তারই কর্তৃত্বে থাকবে, (সূরা-আরাফ,৫৪)। নিশ্চয় আইন রচনা করা হচ্ছে-প্রভুত্বের বৈশিষ্ট সমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট। যে ব্যক্তি নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য উক্ত অধিকার মঞ্জুর করবে, সে তো নিজেকে অথবা অন্যকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সমকক্ষ স্থির করল।

মানব রচিত আইনকে বিচারক বানানো এবং এর নিকট বিচার নিয়ে যাওয়া, নিঃসন্ধেহে যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, সে এই আইনপ্রণেতার গোলামী করল এবং উক্ত আইন যারা অনুসরন করবে এবং আনুগত্য করবে, তবে ঐ আইন প্রণেতা আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে নিজের দাসে পরিণত করল। এটা সকলের জানা কথা- যে ব্যক্তি কবিরা গুণাহে লিপ্ত হবে, যেমনঃ সুদ হারাম বিশ্বাস করা সত্বেও তা ভক্ষণ করবে এবং যে ব্যক্তি এমন আইন প্রণয়ন করল যার দ্বারা এসকল কবিরা গুণাহের কাজ গ্রহণ করা বৈধ্য হয়ে যায় এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অতএব যেমন কোন ব্যক্তি সুদের চর্চা করল অথচ সে এটা

হারাম বলে স্বীকার করে, তবে সে একটি কবিরা গুণাহে লিপ্ত হল। কিন্তু যে ব্যক্তি এমন আইন রচনা করল, যা সুদকে বৈধ করল, তবে সে কাফির, মুরতাদ।

শরীয়াত পরিবর্তনকারী কাফির শাসক এর সাথে যুদ্ধ করতে হবে; যে তাকে রক্ষা করবে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে; এবং যে দল তাকে রক্ষা করবে, তার আইন ও পদ্ধতির পৃষ্টপোষকতা করবে তাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে।

বর্তমানে কিছু আলেমের পক্ষ থেকে (যারা ত্বগুতের খাদেম) আল্লাহর শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকদের মুসলিম শাসক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং এদের আনুগত্য করা ওয়াজিব বলে প্রচার করা হচ্ছে অথচ এ সমস্ত শাসকগণ, আল্লাহর শরীয়াতকে পরিবর্তন করেছে, ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের সাথে দুশমনী অব্যাহত রেখেছে। নারী নেতৃত্ব হালাল করেছে। তারপরেও এ শাসকগণ কিভাবে মুসলিম শাসক হাতে পারে? মূলত এ আক্বিদা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর আক্বিদা নয়। বরং এ আক্বিদা হচ্ছে পথভ্রষ্ট মুর্জিয়া ও জাহমিয়াদের। যা সত্বর দলীল ভিত্তিক জানতে পারবেন (ইনশাআল্লাহ)।

সম্মানিত **শাইখ আবু সুহাইব ইবনে আঃ আযীয এর "দুই শতাধিক ইমাম ও দায়ীদের ফাত্‌ওয়া"** বইটিতে তিনি ত্বাগুতের পরিচয় তুলে ধরেছেন, এবং আল্লাহর শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকগণ মুরতাদ ও ত্বাগুত, এ বিষয়ে দুইশত এর অধিক ইমাম ও দায়ীদের ফাত্‌ওয়া, এবং মুর্জিয়াদের সংশয় নিরসন সংকলন করেছেন। আল্লাহ তাঁকে এই পরিশ্রমের (ইহকাল ও পরকালে) উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

বইটির সুন্দর সাবলিল ও সরল ভাষায় আরবী হতে বঙ্গানুবাদ করেছেন **"শাইখ সোলাইমান বিন আব্দুল্লাহ"** আল্লাহ তাঁকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। এছাড়াও যারা বিভিন্নভাবে বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

বইটি পাঠ করে যদি মুসলিম সমাজে "আল্লাহর শারীয়াত পরিবর্তনকারী শাসক মুরতাদ ও ত্বাগুত" এ পরিচয় জ্ঞাত হয় এবং ত্বাগুত ও মুরতাদদের উৎখাতে জিহাদের অনুপ্রেরণা সঞ্চার হয়, তবে আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বার্থক বলে মনে করব। আমরা এ বইখানা ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি তারপরও যদি কোন স্থানে কোন ভূল পরিলক্ষিত হয়, তবে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনে প্রয়াস পাব এবং চিরদিন কৃতজ্ঞতাপার্শ্বে আবদ্ধ থাকব (ইনশা'আল্লাহ)।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থটিকে কবুল কর এবং একে নাজাতের উছিলা বানাও। আমীন!

বিনীত প্রকাশক

ভূমিকা

اِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُه، وَنَسْتَعِيْنُه، وَنَسْتَغْفِرُه، وَنِعُوْذُبِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّأٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَدِيَ لَه، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَاِلاَهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَه، لاَشَرِيْكَ لَه، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه، وَرَسُوْلُه، قَالَ اللهُ تَعَالَي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴿٣:١٠٢﴾ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴿٤:١﴾ وَقَالَ جَلَّ جَلَالُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴿٣٣:٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴿٣٣:٧١﴾

امَّا بَعْدُ:

ইসলাম ও ইসলামী জামায়াতের বহু সংখ্যক আলিম শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসক ও বিচারকদের 'কাফির' হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন কারণে তাদের মুরতাদ হওয়ার বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য সাধারণ মুসলমান নয়; বরং ইসলামের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যাদের নিকট থেকে লোকদের মধ্যে ফতুয়া প্রকাশ পায় এমন আলিমগণও এ সকল শাসক ও বিচারকের ইসলামী বিধান সম্পর্কে সর্বদা অজ্ঞতার সাগরে নিমজ্জিত রয়েছেন।

এমনকি বিদ্যাহীন এসকল প্রবক্তার অনেকের সাথে আমি আলোচনা করেছি, অতঃপর তাদের অধিকাংশকে এ সকল শাসনকর্তা ও বিচারকদের ক্ষেত্রে মুরজিয়া মাজহাব গ্রহণ করতে দেখেছি। এবং তারা বিশ্বাস করেন এটিই হচ্ছে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাজহাব'। তাদের কেউ কেউ মনে করেন, বর্তমান কালে মুসলিম বিশ্বের দুইজন আলেম ব্যক্তি অন্য কেউ এ সকল শাসকদেরকে 'কাফির' বলেননি। তাঁরা হলেনঃ (১) শায়খ ডঃ উমার আবদুর রহমান, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আমেরিকার জেলখানা থেকে মুক্ত করুন। (২) শায়খ ডঃ শহীদ (আমরা এমনটি মনে করি) আবদুল্লাহ আয্যাম

(রঃ)। অথবা কেউ মন্তব্য করেন, আর তারাই বর্তমানে উত্তম জাতী "এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে"।

অতএব উপরোল্লেখিত কারণে, এবং এই মা'সআলা সম্পর্কে আলিমদের উক্তি ও ফাত্ওয়া সমূহ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় এটি আয়ত্ব করা কষ্টসাধ্য হওয়ার জন্য আমি এই প্রচুর প্রমাণ সম্বলিত ছোট্ট রিসালাকে সংকলণ করেছি। এই বিষয়ে মূল বক্তব্য হচ্ছে 'মুসলমানদেরকে ত্বাগুত সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেয়া।' ঈমানের মূল দাবী হচ্ছে প্রত্যেক মু'মিনের ত্বাগুত- এর পরিচয় লাভ করা ওয়াজিব। কেননা এর দ্বারা সে ত্বাওয়াগীত (ত্বাগুত এর বহুবচন) থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। কেননা ত্বাগুত থেকে বেঁচে থাকা ও তাকে অস্বীকার করা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)- এর অন্যতম শর্ত। কেননা لَا إِلَهَ (লা ইলাহা) (কোন ইলাহ নাই) অর্থ আল্লাহ ব্যতীত যতগুলো ইলাহের ইবাদত করা হয় ঐ সকল বাতিল মাবূদকে অস্বীকার করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে সুদৃঢ় হাতল ধারণ করে নিয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ২৫৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের পূর্বে ত্বাগুতকে অস্বীকার করতে বলা হয়েছে।

অতএব হে তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম, ঐ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অতঃপর إِلَّا اللَّهُ ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত) এই বাক্যের দ্বারা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সকল আমলে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বলা হয়েছে।

সুতরাং সলাত তারই জন্য, অনুরূপভাবে বিধান দেয়া ও আইন প্রণয়ন তারই অধিকার, মাসজিদ তারই, তদ্রূপ ফয়সালা তারই জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং আপনার সকল কর্মে আল্লাহ তায়ালাকে বিচারক নির্ধারণ করা আপনার উপর ওয়াজিব। এই বিষয়টি আক্বীদার গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। নবীন ও প্রবীন অনেক আলিম এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা এই সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এগুলোর নাম করণ করেছেন 'কিতাবুল ঈমান'।

উপরোল্লেখিত সকল কারণে, সত্য অন্বেষণকারীদের সহজ করার লক্ষ্যে, 'ত্বালিবে ইলমের জন্য' সত্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ, ফাতওয়া প্রদানকারী ব্যক্তিদের আলোর পথ দেখানোর মানসে, যারা মনে করেন, মহান দু'জন শায়খ অর্থাৎ উমর আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ আয্যাম ব্যতীত অন্য কেউ এসকল শাসকদের কাফির ফতুয়া প্রদান করেননি। আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কিছু প্রবীন আলিম ও আহলে সুন্নাতের বর্তমানের কিছু আলিম ও দায়ীদের ফাত্ওয়া ও মন্তব্য সংকলন করেছি। এই রিসালার তত্ত্বউপাত্তগুলো বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা প্রবন্ধ ও ম্যাগাজিন হতে সংগ্রহ করেছি।

আমি এই রিসালাকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে দু'টি অনুচ্ছেদ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। আর তৃতীয় অধ্যায়ে মুর্জিয়া মাজহাবের কয়েকটি সংশয়ের প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সাথে সাথে শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকদের বিরূদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব- এর বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকদের মুরতাদ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের প্রমাণসমূহ।

প্রথম অনুচ্ছেদঃ বিচার ও মকদ্দমা সম্পর্কীয় কয়েকটি কুরআনের আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ত্বাগুতকে অস্বীকার করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মুরতাদ শাসকদের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ এর দায়ী ও শায়খদের ফাত্ওয়া ও মন্তব্যসমূহ।

প্রথম অনুচ্ছেদঃ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের প্রবীন আলিমদের মন্তব্য ও ফাত্ওয়া সমূহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ আহলে সুন্নাহ- এর বর্তমান সময়ের আলিমদের মতামত ও ফাত্ওয়া সমূহ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ প্রয়োগ ক্ষেত্রে নয় তত্ত্বগতভাবে মন্তব্য ও ফাত্ওয়া সমূহ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ মুর্জিয়া মাজহাবের কয়েকটি সংশয়ের প্রতিবাদ এবং শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকদের বিরূদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব- এর বিবরণ।

মুখবন্ধ

আমরা ঐ সকল শাসক যারা রহমান- এর শরীয়াতকে অন্য শরীয়াতে পরিবর্তন করে তাদের কাফির হওয়া প্রসঙ্গে অকাট্য বিধানের দ্বারা তাদের মুরতাদ হওয়ার প্রমাণ ও এই বিষয়ে মুসলিম জাতি ও তাদের ইমামদের ইজমা- এর বিষয়টি উল্লেখের পূর্বে সম্মানিত পাঠকদের নিকট এই মাসআলার গুরুত্ব সম্পর্কে পরিচয় করে দিতে চাই। তা হচ্ছে বান্দাদের মধ্যে বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র এক আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করা। কেননা তিনিই একমাত্র বিধান দাতা ও তিনিই শরীয়াত প্রণেতা। তিনি ব্যতীত অন্য কারো এই অধিকার নেই যে সে যে ব্যক্তিই হোক না কেন নিজের জন্য উক্ত অধিকার দাবী করবে।

অনুরূপভাবে আমরা সম্মানিত পাঠকদের জানিয়ে দিতে চাই যে, বর্তমান যুগের শাসকবৃন্দ শরীয়াত প্রণয়নের অধিকার আল্লাহর নিকট থেকে কিভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তা নিজেদের জন্য দাবী করছে এবং যারা তাদের নিকট রব্বুল আলামীনের শরীয়াতকে সালিস মানার কথা বলেন তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। আমরা এই অনুচ্ছেদটি 'যিলাল' গ্রন্থের রচয়িতা উসতাদ, সাইয়িদ কুতুব (রঃ) এর অমূল্য বাণী হতে চয়ন করেছি। তিনি তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও বাস্তব প্রেক্ষাপট সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন।

তিনি বলেনঃ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুণ!) 'এটি হচ্ছে বিধান দেয়া, শরীয়াত ও মকদ্দমার বিষয়। এর অন্তরালে রয়েছে প্রভুত্ব, তাওহীদ ও ঈমানের বিষয়। উক্ত বিষয়টি মুখ্য হওয়ার জন্যে এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করছেঃ বিধান প্রদান, শরীয়াত ও মকদ্দমা করা আল্লাহর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মজবূত বন্ধন অনুসারে হচ্ছে কি? বা আল্লাহর ঐ শরীয়াত অনুযায়ী হচ্ছে কি যাকে আসমানী দ্বীনের অনুসারীগণ ক্রমান্বয়ে হেফাজত করে আসছেন এবং যা রসূলগণের (আঃ) এবং ঐ সকল ব্যক্তি যারা তাদের পরে এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন? অথবা ঐ সকল বিষয় পরিবর্তনশীল কল্পনা ও বিভিন্ন কল্যান অনুযায়ী হবে যার কোন অনুমোদন আল্লাহর শরীয়াতে নাই।

এ কথাটি অন্যভাবে বলা যায় প্রভুত্ব, অভিভাবকত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা, বিশ্বে ও মানব জীবনে আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হবে না এর প্রত্যেকটি বা কিছু কিছু বিষয় তার সৃষ্টির কোন ব্যক্তির অধিকারে থাকবে, যে মানুষের জন্য শরীয়াত প্রণয়ন করবে যার কোন অনুমোদন আল্লাহ দেননি?

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ اِنَّهُ هُوَاللّٰهُ لَاإِلٰهَ إِلَّاهُوَ

অর্থঃ (তিনি সেই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই)। তিনি লোকদের জন্য যে পন্থাসমূহ নির্ধারণ করেছেন, তা বান্দাদের তার প্রভুত্ব অনুযায়ী ও তাদের তার গোলামী মোতাবেক করেছেন। এবং তিনি তাদের নিকট এর উপর এবং এটা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন আর তা হচ্ছে এ বিশ্বে তাঁকেই বিচারক নির্ধারণ করা ওয়াজিব, তাঁর কাছেই লোকদের বিচার চাওয়া আবশ্যক এবং তদনুযায়ী নবীগণ ও পরবর্তী শাসক ও বিচারকদের ফয়সালা করা ওয়াজিব। এর প্রত্যেকটি বিষয়ের মাসআলা হচ্ছে- ঈমান অথবা কুফরির মাসআলা, ইসলাম বা জাহেলিয়াতের মাসআলা, শরীয়াত কিংবা খিয়াল-খুশির মাসআলা। এই বিষয়ে কোন মধ্যস্থতার অবকাশ নেই, সন্ধি বা আপোসের কোন সুযোগ নেই।

অতএব মু'মিন তারাই যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে। বিন্দুমাত্রও এদিক ওদিক করে না এবং কোন পরিবর্তন সাধন করে না। কাফির, যালিম ও ফাসিক তারাই যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করে না।

সুতরাং শাসক ও বিচারকগণ যদি পূর্ণভাবে আল্লাহর শরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন তখন তাঁরা ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। নয়তো তাঁরা অন্য কোন শরীয়াতে কায়েম থাকবেন যার কোন অনুমোদন আল্লাহ দেননি, তাহলে তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক হয়ে যাবেন। আর লোকেরা যদি তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে শাসকবর্গ ও বিচারকদের নিকট থেকে আল্লাহর বিধান ও ফয়সালা গ্রহণ করে, তবে তারা মু'মিন থাকবে। নচেৎ তারা মু'মিন নয়। এই পথ ও ওটার মধ্যে মধ্যস্থতার কোন অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহর শরীয়াতের নিকট আত্মসমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে সর্বপ্রথম তার প্রভুত্ব, অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধান ও ক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা।

তদ্রূপ এই শরীয়াতের নিকট আত্মসমর্পণ না করা এবং জীবনের কোন ক্ষেত্রে অন্য শরীয়াত গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে সর্বাগ্রে আল্লাহর প্রভুত্ব, অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধান ও ক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান হতে হাত গুটিয়ে নেয়া। এক্ষেত্রে ঘোষণা ব্যতীত ক্রিয়াকর্মে বা মৌখিকভাবে আত্মসমর্পণ কিংবা প্রত্যাখ্যান, সমান গুরুত্ব বহন করে।

সুতরাং কোন মানুষের জন্য এই অধিকার নাই যে সে দাবী করবে মানব রচিত আইন আল্লাহর শরীয়াতের চেয়ে উত্তম বা সমপরিমান গুরুত্ব রাখে। তা মানব সম্প্রদায়ের যে ক্ষেত্র বা স্তরেই হোক না কেন। অতঃপর দাবী করে সে

আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং সে একজন মুসলিম। এও দাবী করে যে আইন প্রণেতাগণ মানব অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত। তারা তাদের সার্বিক বিষয়ে আল্লাহর চেয়ে সুন্দর আইন রচনা করতে উপযোগী। আথবা তারা এটাও দাবী করে যে, মানুষের জীবনে এমন কিছু অবস্থা ও প্রয়োজন দেখা দেয় যে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত নয়। তার কাজ শুধু শরীয়াত রচনা করা। অথবা তিনি ঐ সকল বিষযে জানেন ঠিকই কিন্তু তিনি এর কোন বিধান দেননি।

উল্লেখিত দাবীর সাথে ইসলাম ও ঈমানের দাবী নিরর্থক। যদিও সে মাঝে মধ্যে ইসলামের বুলি আওড়ায়। অতঃপর ইসলামই একমাত্র পথ, যাতে মানুষ মানুষের গোলামী করা থেকে মুক্তি পায়। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল মতাদর্শে মানুষ মানুষকে দাসে পরিণত করে এবং এক মানুষ অন্য মানুষের গোলামী করে। শুধুমাত্র ইসলামী মতাদর্শে মানুষকে বান্দার ইবাদত করা হতে বের করে লা-শরীক একমাত্র আল্লাহর গোলামী করতে বলে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রভুত্বের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে, "শাসন ক্ষমতা"। অতএব যে ব্যক্তি লোকদের কোন সম্প্রদায়ের জন্য আইন রচনা করে, সে তাদের মাঝে প্রভুত্বের আসন করে নেয় এবং ঐ প্রভুত্বের বৈশিষ্টের সেবা গ্রহণ করে। সুতরাং তারা তার দাস, তারা আল্লাহর গোলাম নয়। তারা তার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী নয়। জাহেলিয়াত শুধু ঐতিহাসিকতার স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি এমন একটি অবস্থা যার উপাদানসমূহ কোন বিধান বা পদ্ধতিতে মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। আর এই জাহেলিয়াতের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আল্লাহর পথ ও জীবন চলার জন্য তার শরীয়াত পরিত্যাগ করে বিধান দেয়া ও শরীয়াত প্রণয়নের ক্ষমতা কোন মানুষের ইচ্ছার নিকট ন্যস্ত করা। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, শ্রেণী, দল বা শ্রেষ্ঠ প্রজন্মেও ইচ্ছা বা খেয়াল-খুশির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সুতরাং ঐ সকল কল্পনাপ্রসূত আইন যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর শরীয়াতের নিকট প্রত্যাবর্তন না করে কোন সম্প্রদায়ের জন্য কোন ব্যক্তিকে শরীয়াত প্রণেতা নির্ধারণ করা হবে, তখনই তা জাহেলিয়াতে পরিণত হবে। কেননা তার খেয়াল-খুশিই আইন বলে বিবেচিত হবে, অথবা তার মতামত বা সিদ্ধান্তই আইনে পরিণত হবে। এগুলো শব্দগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। এবং গুটি কয়েক ব্যক্তি গোটা জাতির জন্য আইন রচনা করে। আর এটিই হচ্ছে জাহেলিয়াত। কেননা গুটি কয়েক ব্যক্তির স্বার্থই আইনে পরিণত হয়। অর্থাৎ পার্লামেন্টের অধিকাংশের মতামতই আইন বলে বিবেচিত হয়। এতে বর্ণনাগত পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নেই।

গোটা জাতির প্রতিনিধিগণ এবং সকল দলের প্রতিনিধিগণ নিজস্ব স্বার্থে লোকদের জন্য আইন রচনা করে, আর এটিই হচ্ছে জাহেলিয়াত। কেননা লোকদের কল্পনা যারা কোন সময় খেয়াল-খুশি ও কল্পনা থেকে শূণ্য থাকে না এবং লোকদের অজ্ঞতা কোন সময়ের জন্যও অজ্ঞতাশূণ্য নয়, এটিই আইন হয়ে যায়। অথবা কোন জনগোষ্ঠীর মতামতই আইন। এতে ভাষাগত পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নেই। এবং জাতির একটি গ্রুপ লোকদের জন্য আইন রচনা করে, আর এটিই হচ্ছে জাহেলিয়াত। কেননা তাদের জাতীয় লক্ষ্যই আইন। অথবা জাতীয় সংসদের মতামতই আইন বলে গণ্য হয়। এগুলো শব্দগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ব্যক্তি, দল, জাতি ও গোত্রের স্রষ্টা সকলের জন্য আইন রচনা করেন। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর শরীয়াত বা আইন, যাতে কোন ব্যক্তি, দল, রাষ্ট্র ও কোন গোত্রের পক্ষপাতিত্ব থাকে না এবং কাউকে অবজ্ঞা করা হয় না। কেননা আল্লাহ সকলের রব, এবং তার নিকট সকলেই সমান। কেননা আল্লাহ তায়ালা সকলের বাস্তব অবস্থা ও সকলের কল্যাণ সম্পর্কে অবগত। তার নিকট তাদের কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে অবহেলা করা বা বাড়াবাড়ির করার কোন অবকাশ নেই।

আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি লোকদের জন্য আইন রচনা করে, তখন ঐ সব লোকেরা আইন প্রণেতার দাস হয়ে যায়। সে যে কেউ হোক না কেন। ব্যক্তি, দল, জাতি বা গোত্র হলেও তারা তার গোলাম হয়ে যাবে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য আইন রচনা করেন। তখন তারা সকলেই স্বাধীন ও সমান। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট ললাট নোয়ায় না। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামী করে না। এই জন্য মানব জীবনে ও প্রত্যেকটি ব্যাবস্থাপনায় এই বিষয়টির ভয়াবহতা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

আল্লাহ বলেনঃ "যদি হক্ব তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করত, তবে আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যেত।" সুতরাং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করার অর্থ হচ্ছে- ধ্বংস; ভ্রান্তি; আর অবশেষে ঈমানের বন্ধন ছিন্ন করে বের হয়ে যাওয়া। পবিত্র কুরআনের অকাট্য দলিল দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

(তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড, ৮৮৮-৮৯১পৃঃ)

শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকবর্গ ও বিচারকদের কাফির হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, সাইয়িদ কুত্বুব রচিত গ্রন্থ 'মায়ালিমু ফিত-তরীক ও নিম্নের গ্রন্থসমূহ দেখুন।'

* নাওয়াকিযুল ঈমান আল-ক্বওলিয়া ওয়াল-ফে'লিয়া।
লেখক, শায়খ আবদুল আজীজ আবদুল লতীফ।
* আল-ক্বওলুল ক্বা-তি ফীমান ইমতানায়া আনিশ-শারায়ি।
প্রকাশণায়, জামায়াতে ইসলামিয়া, মিসর।
* আল হাদী ইলা সাবিলির রশাদ।
লেখক, শায়খ আবদুল কাদির আবদুল আজীজ।
* মিল্লাতু ইবরাহীম। লেখক, শায়খ, আবূ মুহাম্মাদ আল মাকদিসী।
* আর রদ্দু আলাল আলবানী।
লেখক, শায়খ আবদুল মুন্য়িম আবূ হালীমা/আবূ বাছীর আশ-শামী।
* 'আত-তিবয়ান ফী আহাম্মি মাসায়িলিল কুফরি ওয়াল-ঈমান'
৩য় খণ্ড, লেখক, শায়খ আবূ আমর এবং হাস্সান আবদুল হাকীম।
*রুদূদ্ আলা-আবাতীল ওয়া শুবহাতি হাওলিল জিহাদ। আর-রদ্দু আলা কিতাবিত দুক্তূর আল বূত্বী।
লেখক, শায়খ আবদুল মালিক আল বার্রাক।
* ইমতাউন নযর ফির-রদ্দি আলা মুরজিয়াতিল আসর।
লেখক, শায়খ, আবূ মুহম্মাদ আল মাকদিসী।
* আল কাওয়াশিফুল জালিইয়া ফী কুফরিদ দাওলাতিস সঊদি।
লেখক, আবুল বারা' আন নায্দি।
* আত-তাজরিবাতুল জিহাদিইয়া ফী সূরিয়া।
লেখক, আবূ মুসআব আস সূরিও।
* ওয়াক্ফাত-মায়াশ শায়খ আল আলবানী হাওলা শরীত্ব (মিন-মিনহাজিল খাওয়ারিজ। লেখক, আবূ ইস্রা আল আসঊত্বী।
* ফাত্ওয়া খাত্বীরাহ আযীমাতুশ শান ফী-হুক্মিল খুতাবায়ি ওয়াল মাশায়িখ আল্লাযীনা দাখালূ ফী নুসরাতিন ওয়া তা'য়ীদিল মুবাদ্দিলীন লি-শারীয়াতির রহমান। রচনায়, শায়খ আবূ ক্বাতাদাহ্ আল ফিলিস্তিনী।
আরো জানতে হলে দেখুন!
* দাওরাতুল-ঈমান এবং কুফরুন-দূনা-কুফরিন।
লেখক, আবূ ক্বাতাদাহ্ আল ফিলিস্তিনী।
* আর রদ্দু আলা শরীত্বিন, আস সালাফিয়া বাইনাল ওয়ালাহ্ ওয়াল গালাহ্। লেখক, শায়খ, মুহাম্মদ সারুর।
এছাড়াও গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ এবং ফাত্ওয়া ও মন্তব্য অধ্যায়ে পার্শ্বটীকায় লিখিত গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ণ করুণ!

প্রথম অধ্যায়

শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকদের মুরতাদ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের প্রমাণসমূহ

প্রথম অনুচ্ছেদ

'বিচার ও মকদ্দমা সম্পর্কীয় কয়েকটি কুরআনের আয়াতের তাফসীর'।

আহলে সুন্নহ- এর প্রবীণ আলিম ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী বর্তমান যুগের আলিম ও দায়ীদের ফাত্ওয়া ও মতামতগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনার পূর্বে আমরা কুরআনের কিছু আয়াত উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি যার মধ্যে 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না' তাদের কাফির হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতগুলোই প্রবীণ ও নবীণ আলিমদের প্রধান অবলম্বন। এবং তারা তাদের ফাত্ওয়া ও মন্তব্য প্রদান করতে এগুলোর উপরই নির্ভর করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ

অর্থঃ তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তাদেরকে কিতাবের দিকে আহবান করা হচ্ছে- যেন এটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে; অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আল-ইমরান ২৩)

উসতাদ, সাইয়িদ কুতুব (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, এভাবে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবাক হয়ে যাচ্ছেন, যখন তাদের কেউ কেউ তাদের বিশ্বাসগত বিষয়ে এবং জীবনযাত্রার বিষয়ে আল্লাহর কিতাবের নিকট বিচার চাইতে অস্বীকার করেছিল। অতএব ঐ সকল লোকদের ক্ষেত্রে কি হবে যারা বলে আমরা মুসলিম। অতঃপর তারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে আল্লাহর শরীয়াতকে বিতাড়িত করে। এরপরেও তারা সর্বদা দাবী করে আমরা মুসলিম?

এটি একটি দৃষ্টান্ত, যা আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের জন্যও বর্ণনা করছেন, যেন তারা দ্বীনের প্রকৃত অবস্থা ও ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং তারা আল্লাহকে অবাক করা ও তার নিন্দার ক্ষেত্রে পতিত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। অতএব, যখন এটা আহলে কিতাবদের অবস্থানের নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। তারা ইসলামের দাবীদার না হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর

কিতাবের নিকট বিচার নিয়ে যেতে অস্বীকার করেছিল। তাহলে তারা (মুসলমান) যখন অনুরূপ অস্বীকার করবে তাদের প্রতি নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশের মাত্রা কিরূপ হতে পারে? এই বিস্ময় শেষ হওয়ার নয়, এই বিপদের মাত্রা নিরূপণ করা মুশকিল, অবশেষে এই ক্রোধ দুর্ভাগ্যের দিকে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহর রহমত হতে দূরে নিক্ষেপ করবে। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ১ম খণ্ড, ৩৮২পৃঃ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থঃ অতএব, তোমার রবের শপথ! তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক না করে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করে। (সূরা নিসাঃ ৬৫)

হাফেজ, ইবনে কাসীর (রঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ সত্তার শপথ করে বলেছেন, কোন ব্যক্তিই ঈমানদার হতে পারে না যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে রসূল (সাঃ)-কে বিচারক রূপে মেনে না নেবে। অতএব তিনি যা ফয়সালা করবেন তা সত্য ভেবে প্রকাশ্যে ও গোপনে তার নিকট আত্মসমর্পণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, যখন তারা আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে তখন তারা স্বীয় অন্তরেও আপনার আনুগত্য করবে। আপনি যা ফয়সালা করবেন সে ব্যাপারে তারা অন্তরে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ রাখবে না। প্রকাশ্যে ও গোপনে তারা এর আনুগত্য করে যাবে এবং ওটা পরিপূর্ণ শান্তভাবে গ্রহণ করবে। এতে কোন বিরোধিতা, অসমর্থন বা বিতর্ক থাকবে না।

যেমন হাদীসে এসেছেঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّي يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئتُ بِهِ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ঐ জিনিসের আনুগত্য করে যা আমি আনয়ন করেছি।

(তাফসীর কুরআনুল আযীম, ১ম খণ্ড, ৫৩২পৃঃ)

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, রসূল (সাঃ)-এর সাথে এই সকল মুরতাদ শাসক ও বিচারকদের বিতর্ক- এর থেকে অন্য কোন বড় বিবাদ রয়েছে কি? তারা তাঁর (সাঃ) এর সাথে রাজনীতি, লেনদেন, শাস্তি, হালাল করণ ও হারম করণ প্রত্যেকটি বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে। এমনকি তাদের ক্রিয়াকাণ্ড এতদূর গড়িয়েছে, তারা রসূল (সাঃ)-এর সহিত সালাতেও বিবাদে লিপ্ত রয়েছে। কেননা জুম্আর দু'টি খুতবা যা সালাতুয্ যুহ্র-এর দুই রাকআত-এর সমপরিমাণ ছওয়াব রাখে, রসূল (সাঃ) এটাকে মানুষকে কল্যাণের দিকে দিক-নির্দেশনার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

অথচ বর্তমান শাসকগণ এই দু'টি খুতবাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন। তাঁরা খুতবায় খত্বীবদেরকে তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ফরজ করে দিয়েছেন। যদি কোন খত্বীব এই নির্দেশ অমান্য করেন তবে তাকে আর খুতবা দিতে দেয়া হয় না। বরং সম্ভবত তাঁর স্থান জেলখানায় হবে। যেমন ইতিপূর্বে অনেক সম্মানীত আলিম জেলখানায় বন্দী হয়েছেন। আল্লাহ তাদের মুক্ত করুণ!

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেনঃ ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, فَلَا ফালা শব্দের দ্বারা পূর্বের আলোচনার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এখানে এই কথাটি ঊহ্য রাখা হয়েছে- "তারা যেমন দাবী করছে যে, তারা আপনার প্রতি এবং পূর্বে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বিষয়টি এরূপ নয়।"

অতঃপর ইমাম শাওকানী মন্তব্য করেনঃ "স্পষ্ট কথা হচ্ছে এই নির্দেশটি প্রত্যেক মকদ্দমা এবং প্রত্যেকটি বিচারের জন্য প্রযোজ্য।"

(ফাত্হুল কাদীর, ১ম খণ্ড, ৪৮৩পৃঃ)

শানে নুযুলঃ রসূল (সাঃ) যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)- এর পক্ষ্যে পানি সেচ বিষয়ে রায় প্রদান করলে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন আনসারী সাহাবী এই রায় মানতে অস্বীকার করে, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহ অনেক ইমাম উক্ত ঘটনা স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসারী সাহাবী সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করে ঘোষণা করলেন যে, তার ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর রসূলের ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয় এবং তার বিচার মেনে নেয়।

অতএব হে মুসলিম ভাই, ঐ সকল ধর্মনিরপেক্ষাতাবাদী শাসক ও বিচারকদের অবস্থা কিরূপ হবে, যারা আল্লাহর শরীয়াত ও আইনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, আল্লাহ যা কিছু হালাল করেছেন তা হারাম করেছে এবং তিনি যে সকল জিনিস হারাম করেছেন তা হালালা করে নিয়েছে। তারা এখানেই ক্ষান্ত নয়, বরং তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতের সাথে প্রকাশ্যে, দিবালোকে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এবং যে সকল ব্যক্তি إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ বিধান দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর- এই বাণীর দিকে আহবান করে, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ও কঠিন শাস্তি প্রদান করে। সাইয়িদ কুতুব ও অন্যান্য শহীদ বীরদেরকে অত্যাচারী জামাল আবদুল নাসির এর পক্ষ্য থেকে একটি মাত্র কারণেই ফাঁসি দেয়া হয়েছিল যে, তারা বলেছিলেন– إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর"।

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

অর্থঃ (৪৪) আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর অনুগত নবী, দরবেশ ও আলেমগণ এর মাধ্যমে ইয়াহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ কিতাবুল্লাহর দেখা শোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা তা স্বীকার করেছিল; অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফির। (৪৫) আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি ফরজ করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতএব যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে এটা তার জন্যে (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম। (৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি। এতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়ন করে। এটি আল্লাহ ভীরুদের জন্যে হিদায়াত ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইঞ্জীলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক। (৪৮) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ (কুরআন), যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং ঐ সব কিতাবের সংরক্ষক; অতএব,

আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি- যাতে তোমাদের যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়টি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। (৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-যে তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের দরুন শাস্তি প্রদান করবেন; আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে। (৫০) তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?

(সূরা মায়িদাহঃ ৪৪-৫০ নং আয়াত)

ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ বারা ইবনে আযিব, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান, ইবনে আব্বাস, ইবনে মিজলায, আবু রিজা আত্বারিদী, ইকরামা, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও হাসান বসরী সহ অনেকেই বলেন, এই আয়াতগুলো আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হাসান বসরী আরো বলেন, এটা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছেঃ হাসান বাসরী (রঃ) সে যুগের বিচারক ও শাসকদের সতর্ক করে এই মন্তব্য করেছিলেন। অথচ বর্তমান যুগের মুরতাদ শাসক ও বিচারকদের বিপরীতে তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ইয়াহুদীদের ন্যায় উক্ত কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন। যে জন্য তারা আল্লাহর এই শাস্তির উপযোগী হয়েছে। অতএব, আমাদের বর্তমান কালে যখন আল্লাহর আইনকে মানুষের আইন দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে, এমতাবস্থায় তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর মন্তব্য কিরূপ হতো?

অতঃপর ইবনু কাসীর (রঃ) বলেনঃ "আবদুর রায্যাক, সুফয়ান সাওরী থেকে তিনি মানসূর হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেন, এই আয়াতগুলো বাণী ইসরাঈলদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্যও এগুলো পছন্দ করেছেন।" তারপর তিনি বলেন, ইবনু জারীর বর্ণনা করেন,... আলকামা এবং মাসরুক হতে বর্ণিত আছে, তারা ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে ঘুষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, এটা হচ্ছে সুহ্ত (অবৈধ সম্পদ)। তারা পুনরায় বিচার ফয়সালার ব্যাপারে ঘুষ নেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি উত্তরে বলেন, "এটা হচ্ছে কুফর"।

অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন–

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা কাফির।"

ইবনু কাসীর (রঃ) বলেনঃ সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন,

আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি এই নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিবে অথবা জেনেশুনে বাড়াবাড়ি করবে সে কাফির হয়ে যাবে।"

অতঃপর তিনি ইবনে জারীর থেকে, ইবনে জারীর শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ {فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ -তারাই কাফির} এটা মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (তাফসীর আল কুরআনুল আযীম, ২য় খণ্ড, ৬৩, ৬৪পৃঃ)

তারপর তিনি বলেনঃ আবূ হাতিম বলেন, আমাদেরকে আবু উবাইদা আন নাজী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি হাকামকে বলতে শুনেছি– "যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ফয়সালা করল, সে জাহেলিয়াতের ফয়সালা করল।" অর্থাৎ, তার এই বিচার জাহেলিয়াতের বিচার হল। আর জাহেলিয়াতের বিচার করাই হচ্ছে কুফরী।

ইমাম শাওকানী অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ "তারা কাফির।" مَن 'মান' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। অতএব, এটি বুঝাচ্ছে যে, এই নির্দেশ কোন নির্দিষ্ট জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেক বিচারকের জন্য প্রযোজ্য।

এ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই আয়াতের নির্দেশ এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে হালকা মনে করবে, বা অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা করা হালাল মনে করবে অথবা অস্বীকার করে মানব রচিত বিধান দ্বারা ফয়সালা করবে। أُولَٰئِكَ শব্দ مَن শব্দের দিকে ইশারা করছে। এটা অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। অনুরূপভাবে هُمُ الْكَافِرُونَ - এর মধ্যে বহুবচন এর সর্বনাম রয়েছে। (ফাতহুল কাদির, ২য় খণ্ড, ৪২পৃঃ)

এর তাৎপর্য হচ্ছে, এই অপরাধ কোন ব্যক্তি বা কোন দলের পক্ষ্যে হতে সংঘটিত হলে তার বিধান একই। তদ্রূপ বিধানকে হালকা মনে করলে বা অন্য বিধান দ্বারা ফয়সালা করা হালাল মনে করলে, অথবা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলেও এই অপরাধের কোন পার্থক হবে না। সকল ক্ষেত্রে তারা কাফির। কেননা এ সকল শাসক ও বিচারকদের আল্লাহর আইনের সাথে ন্যুনতম আচরণ হচ্ছে তাকে হালকা মনে করা। আর এটিই তাদেরকে আল্লাহর আইনকে ধ্বংস করা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অতঃপর তারা কুফরুল ইসতিখ্ফাফ্ (হালকা করার কুফরী), কুফরুত তা'ত্বীল (ধ্বংস করার কুফরী), কুফরুল্ ইসতিব্দাল (পরিবর্তন করার কুফরী) ও কুফরুল ইস্তিহ্যা (বিদ্রূপ করার কুফরী)- এর দিকে পাথেয় জোগাড় করেছে।

অতঃপর ইমাম শাওকানী বলেনঃ আবদ্ ইবনে হুমাইদ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণন করেন, তাকে অবৈধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি উত্তরে বললেন, "তা হচ্ছে ঘুষ।" আবারো তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঘুষ নিয়ে ফয়সালা করা কি? তিনি উত্তরে বললেন, "এটা কুফরী"।

(ফাতহুল কাদির, ২য় খণ্ড, ৪৪পৃঃ)

তারপর তিনি বলেনঃ আবদুর রাযযাক ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম ও হাকিম সহীহ সনদে হুজাইফা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, উক্ত আয়াত তার নিকট উল্লেখ করা হলে এক ব্যক্তি বলেলঃ (যেমন এ যুগের মুরজিয়াদের প্রভাবশালী আলেমরা মনে করেন) এই বিধান বাণী ইসরাঈলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হুজাইফা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ (তার কথার প্রতিবাদ করে ও তার এই বুঝ ভুল প্রমাণ করে) "বাণী ইসরাঈল তোমাদের উত্তম ভাই। যদি তোমাদের জন্য প্রতিটি মিষ্টি দ্রব্য থাকে, তবে তাদের জন্য প্রত্যেক তিক্ত দ্রব্য রয়েছে। সাবধান! আল্লাহর কসম, অবশ্যই তোমরা তাদের পূর্ণ অনুসরণ করে চলবে।" ইবনে মুনজির ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ফাতহুল কাদীর ৪৫পৃঃ)

সাইয়িদ কুতুব (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ "তারা মুমিন নয়" প্রসঙ্গে বলেনঃ আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা না করা বা এই শরীয়তের আইন সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করা ও ঈমান একত্র হওয়া অসম্ভব। যারা নিজেদের ক্ষেত্রে ও অন্যের সম্পর্কে ঈমানের দাবী করে অতঃপর বাস্তব জীবনে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করে না, অথবা যখন তাদের উপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করা হয়, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে; তারা এটা মিথ্যা দাবী করে; তারা এই অকাট্য প্রমাণের সাথে সংঘাতে লিপ্ত।

অর্থাৎ, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ "তারা মুমিন নয়।"

অতএব, এই ক্ষেত্রে শুধু শাসকদের পক্ষ্য থেকে আল্লাহর শরীয়া অনুযায়ী ফয়সালা না করার বিষয় নয়। বরং এটা অনুরূপভাবে শাসকদের পক্ষ্যে আল্লাহর আইন- এর প্রতি অসন্তোষ জ্ঞাপন করাও বটে। আর এটিই তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দিচ্ছে– যদিও তারা মাঝে মাঝে ইসলামের দাবী করে। (তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড, ৮৯৫পৃঃ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই।"

(সূরা আন্আমঃ ৫৭, ইউসুফঃ ৪০, ৬৭)

ইবনে কাসীর উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন- নিশ্চয় বিধান প্রদান, আধিপত্য, ক্ষমতা ও রাজত্ব সব কিছু একমাত্র আল্লাহরই। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে তারই ইবাদত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য করো ইবাদত করা হতে বিরত থাকার অকাট্য হুকুম দিয়ে রেখেছেন। (তাফসীর কুরআনুল আযীম, ২য় খণ্ড, ৪৯৬পৃঃ)

ইমাম শাওকানী বলেনঃ প্রত্যেটি বিষয়ে বিধান দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। অনুরূপ বলা হয়েছে– "যে আযাব সম্পর্কে তোমরা তাড়াহুড়া করছ।" এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী ফয়সালা।" (ফাতহুল কাদির, ২য় খণ্ড, ১২২পৃঃ)

এর অর্থ, সত্য ফয়সালা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এবং মিথ্যা ফয়সালা হচ্ছে- শাসকদের প্রবৃত্তি ও মতামত অনুযায়ী ফয়সালা করা।

সাইয়িদ কুতুব (রঃ) বলেন আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেবার অধিকার নাই। তাঁর প্রভুত্বের অধিকার অনুযায়ী এ বিষয়টি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেননা, শাসন ক্ষমতা প্রভুত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে অধিকার দাবী করবে, সে তো আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো। কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায়, কিংবা কোন দল, কিংবা কোন গোত্র, কিংবা কোন জাতি, অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার আকারে সকল মানুষও উক্ত দাবী করলে তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু- এর প্রভুত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সাথে বিতর্ক করবে এবং এটা নিজের অধিকার দাবী করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে প্রকাশ্যে কুফরীতে লিপ্ত হল। শুধুমাত্র এই অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমেই দ্বীন সম্পর্কে তার কুফরী করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

(তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯০পৃঃ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থঃ তিনি স্বীয় বিধান প্রদানে কাউকে শরীক করেন না।

(সূরা কাহ্‌ফ ২৬)

ইমাম শাওকানী বলেন, আল্লাহ-এর হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- তিনি যা কিছু ফয়সালা করেন কিংবা, ইলমুল গায়েব। প্রথমটি অধিকতর উপযোগী। এতে ইলমুল গায়ব প্রথম স্থানে গণ্য থাকবে। কেননা তার (সুবহানাহু) ফয়সালা সমূহের মধ্যেই তার ইলমও রয়েছে। (ফাতহুল কাদীর, ৩য় খণ্ড, ২৮০পৃঃ)

ইমাম শানক্বীতী বলেনঃ ‘এটি’ আল্লাহ্ তায়ালার প্রত্যেকটি ফয়সালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এবং এই নির্দেশের আওতায় প্রথম স্থানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও গণ্য থাকবে। এই আয়াতের মূল বক্তব্য “লা-শরীক এক আল্লাহর জন্যই বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নির্দিষ্ট”। উভয় কিরাআতে বর্ণিত আছে এবং অন্যান্য আয়াতেও এই বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

(আয্ওয়াউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, ২৯২পৃঃ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴿٥٠﴾

অর্থঃ (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো যালিম। (সূরা আন-নূরঃ ৪৮-৫০)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের তিরস্কার করছেন এবং তাদেরকে যুলুম- এর সাথে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে যুলুম দ্বারা কুফর ও নিফাক- এর যুলুম বুঝানো হয়েছে।

যেমন সূরা মায়িদাতে উল্লেখ আছেঃ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ “তারাই যালিম।”

ইবনু কাসীর বলেনঃ অর্থাৎ যখন তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহবান করা হয় যা আল্লাহ তার রসূলের উপর নাযিল করেছেন তখন তারা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র উল্লেখ করেছেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴿٦١﴾

অর্থঃ (৬০) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ত্বাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে। পক্ষান্তরে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (আল্লাহর আইন থেকে) অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়। (৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদ্দিকে এবং রসূলের দিকে এসো, তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে।

(সূরা আন-নিসাঃ ৬০, ৬১) (তাফসীর কুরআনুল আযীম, ৩য় খণ্ড, ৩১০পৃঃ)

ইমাম শাওকানী বলেনঃ আল্লাহর বাণী, أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ “তাদের অন্তরে কি রোগ আছে?” এই ‘হামযাহ’ তাদের তিরস্কার ও নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য এসেছে। আর ‘রোগ’ হচ্ছে ‘নিফাক’। অর্থাৎ তাদের এই মুখ ফিরিয়ে নেয়া অন্তরের মুনাফিকীর জন্যে না তাদের সংশয় পোষণের জন্যে? এবং তারা রসূল (সাঃ)- এর নবুয়াত ও তাঁর ফয়সালার ক্ষেত্রে ইনসাফ না করা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছে।

أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ - “না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন?” আর “জুলুম” এটা “ফয়সালার ক্ষেত্রে হবে।” بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - “বরং তারাই যালিম।” অর্থাৎ উপরোল্লেখিত কারণে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। বরং তারা যুলুম ও অবাধ্যতার জন্যে এমনটি করেছে।

উক্ত আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, আলিম বিচারক এর উপর আল্লাহর ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করা ওয়াজিব। কেননা, আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস। (ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, ৪৫পৃঃ)

সাইয়িদ কুতুব (রঃ) বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া সত্য ঈমানের দলীল। কুয়াশাচ্ছন্ন, খারাপ চরিত্রের ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর আইনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। যে ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং যে ব্যক্তি ঈমানী আলোকে নিজের অন্তরকে আলোকিত করতে পারেনি তার পক্ষ্যেই এমন কাজ করা সম্ভম।

(তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ২৫২৬পৃঃ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

অর্থঃ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়। (সূরা ছোয়াদঃ ২৬)

যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী দাউদ (আঃ) কে বিচারের ক্ষেত্রে খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা হতে সতর্ক করেছেন; কেননা এটা আল্লাহর কঠোর আযাবের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে এমন কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তাহলে বর্তমান সময়ের ঐ সকল শায়খদের অবস্থা কিরূপ হবে যারা তাদের ঐ সব কাফির শাসকদের জন্য বিভিন্ন ওজর সৃষ্টি করে নেয়, যারা আল্লাহর শরীয়াতকে পরিবর্তন করেছে এবং

কুফর, ফিসক ও অন্যায় হতে মন যা চায় পরিস্থিতির আলোকে নির্দেশ সম্বলিত অসংখ্য আইন রচনা করেছে? হে বর্তমান যুগের মুর্জিয়াগণ সংজ্ঞা ফিরে পাও!

ইমাম শাওকানী বলেনঃ

আল্লাহ তায়ালার বাণী, فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ "তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর।" অর্থাৎ, "ঐ ন্যায় ও ইনসাফের সাথে যা আল্লাহ তার বান্দাদের মাঝে বিধান দিয়েছেন।" وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ "এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।" অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে ফয়সালার ক্ষেত্রে অন্তরের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না। (ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, ৪২৯পৃঃ)

হাফিজ, ইবনে কাসীর বলেনঃ এটি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এর পক্ষ্য থেকে বাদশাহ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী লোকদের প্রতি নির্দেশনামা, তারা যেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার পক্ষ্য হতে অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ন্যায় ও ইনসাফের সাথে লোকদের মধ্যে ফয়সালা করে। এবং এটা থেকে তারা যেন ফিরে না আসে। কেননা এটা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করবে এবং হিসাব-নিকাশের দিবস ভুলে যাবে তাকে তিনি (তাবারাকা ওয়া তায়ালা) কঠোর শাস্তি ও কঠিন আযাবের হুমকি প্রদান করেছেন।

(তাফসীর আল কুরআনুল আযীম, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, হাফেজ ইবনে কাসীর যখন সে যুগের শাসকদের লক্ষ্য করে এমন মন্তব্য করেছিলেন যে সময় আল্লাহর আইন দ্বারাই বিভিন্ন দেশে ফয়সালা করা হতো। যদি তিনি বর্তমান যুগের আল্লাহর শরীয়ত অস্বীকারকারী এবং সূচনাতেই তার বিধান পরিবর্তনকারী শাসকদের দেখতেন, তবে তাঁর অবস্থা কেমন হতো? এবং এসকল সীমালঙ্ঘণকারীদের ক্ষেত্রে তাঁর ফয়সালা কি হতো? তাদের কাফির ঘোষণার ক্ষেত্রে তিনি কি দ্বিধা করতেন? এমনটি করতেন বলে আমরা মনে করি না। কেননা তিনি তাদের ভাই 'তাতারদের' কাফির হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন। এসকল শাসকদের অবস্থা এবং তাতারদের অবস্থা একই, কোন পার্থক্য নেই। বরং যে ব্যক্তি তাদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত তাঁর নিকট তাদের অবস্থা গুরুতর ও ভয়াবহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুম্‌তাহিনাঃ ১০)

অতএব, আল্লাহর বিধানই হচ্ছে সর্বোত্তম বিধান। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাকে সালিস মানবে, সে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। কেননা তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দার শান্তি ও কল্যাণ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ এবং তার প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। সুতরাং এসকল শাসক কোথায় যারা আল্লাহ তায়ালার আইনকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাদের প্রবৃত্তি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে বিচারক নির্ধারণ করছে; যেটা তার নিজের কোন কল্যাণ করতে পারবে না এবং কোন অমঙ্গলকে প্রতিহতও করতে পারবে না? কেননা মঙ্গল ও অমঙ্গল শুধুমাত্র এক আল্লাহর হাতেই রয়েছে।

সাইয়িদ কুতুব (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ ধ্বংস, বক্রতা, ও প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে- আল্লাহর বিধান। এটাই হচ্ছে- সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়- এর আইন। আর এটাই হচ্ছে অন্তরের লুকানো বিষয় সম্পর্কে অবগত মহান সত্তার বিধান। এবং ইহাই একমাত্র মহাশক্তিধর, সর্বশক্তিমান- এর আইন। মুসলিম বিবেক এই বন্ধনের সন্ধান পাওয়াই যথেষ্ট। এবং সে বিধানের উৎস সম্পর্কে জেনে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক এবং এর সংরক্ষণ করুক! এবং সে বিশ্বাস রাখুক যে, সে আল্লাহর নিকটেই ফিরে যাবে। (তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ৬ষ্ট খণ্ড, ৭, ৩৫পৃঃ)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

“ত্বাগুত”কে অস্বীকার করা ওয়াজিব।

ত্বাগুত- এর আভিধানিক অর্থঃ

ওয়াহিদী বলেন, সকল অভিধান বিশারদ বলেছেনঃ طاغوت ‘ত্বাগুত’ প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলে যাকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদত করা হয়। এই শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একইরূপ থাকে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يُرِيْدُوْنَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

অর্থঃ “তারা ‘ত্বাগুত’ কে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে।” (সূরা নিসা, ৬০)

অত্র আয়াতে ‘ত্বাগুত’ শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

অর্থঃ আর যারা কাফির তাদের অভিভাবক হচ্ছে ত্বাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

(সূরা বাকারাহ, ২৫৭)

অত্র আয়াতে “ত্বাগুত” শব্দটি বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا

অর্থঃ যারা ‘ত্বাগুত’ কে বর্জন করে তার (ত্বাগুতের) ইবাদত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। (সূরা যুমারঃ ১৭)

অত্র আয়াতে ‘ত্বাগুত’ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(মাজমুআহ আত-তাওহীদ, ১৭১পৃঃ)

শারীয়াত-এর পরিভাষায় ত্বাগুতঃ

ইবনে জারীর (রঃ) ত্বাগুত এর সংজ্ঞা সংক্রান্ত সালাফদের মতভেদ উল্লেখের পর মন্তব্য করেন, আমার নিকট 'ত্বাগুত' বিষয়ে সঠিক মত হচ্ছে- এটা আল্লাহর প্রত্যেক অবাধ্য ব্যক্তি বা বস্তু, যাকে তাঁর (তায়ালা) পরিবর্তে ইবাদত করা হয়। এটা তার প্রতি বল প্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে কিংবা গোলামের তার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে হতে পারে। আর উক্ত পূজনীয় ব্যক্তি বা বস্তু মানুষ হোক বা শয়তান হোক কিংবা মূর্তি হোক অথবা যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু হোক না কেন। (তাফসীর ইবনে জারীর, ৩য় খণ্ড, ২১পৃঃ)

ইবনে কাইয়িম (রঃ) ত্বাগুত- এর সংজ্ঞায় বলেনঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে তার সীমা অতিক্রম করে, ইবাদত, অনুসরণ অথবা আনুগত্যের মাধ্যমে তাকে 'ত্বগুত' বলে। অতএব, "প্রত্যেক জাতির ত্বাগুত হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার নিকট লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত বিচার প্রার্থণা করে।" বা "তারা আল্লাহ ছাড়া তার ইবাদত করে" কিংবা "তারা আল্লাহর পক্ষ্য হতে পর্যবেক্ষণ ব্যতীত তার অনুসরণ করে।" অথবা "তারা তার এমন বিষয়ে আনুগত্য করে যে বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য করতে হয় অথচ এটা তারা জানে না।"

সুতরাং এগুলো হচ্ছে বিশ্বের "ত্বয়াগীত" (ত্বাগুত এর বহুবচন)। যখন তুমি এটা পর্যবেক্ষণ করলে এবং সাথে সাথে লোকদের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করলে, তখন তুমি তাদের অধিকাংশকে দেখতে পাবে যে, আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে ত্বাগুত এর গোলামী করছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট বিচার চাওয়া ছেড়ে দিয়ে ত্বাগুত- এর নিকট বিচার প্রার্থনা করছে। এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর অনুসরণ পরিহার করে ত্বাগুত- এর আনুগত্য ও পশ্চাদ্ধাবন করছে।

(ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ১ম খণ্ড, ৫০পৃঃ)

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রঃ) বলেনঃ 'ত্বাগুত' অনেক প্রকারের রয়েছে তন্মধ্যে শীর্ষে আছে পাঁচ প্রকার। প্রথমঃ শয়তান...। দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর বিধান পরিহারকারী অত্যাচারী শাসক....। তৃতীয়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না...। চতুর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত ইলমে গায়েব- এর দাবী করে...। পঞ্চমঃ আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় এবং সে উক্ত ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকে...।

(মাজমূআহ আত-তাওহীদ, ১৪, ১৫পৃঃ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

অর্থঃ যে ব্যক্তি 'ত্বাগুত' কে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে সুদৃঢ় হাতল ধারণ করে নিয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২৫৬)

হাফিজ ইবনে কাসীর বলেনঃ যে ব্যক্তি বাতিল উপাস্য, প্রতিমা ও শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় এমন সকল বাতিল মা'বূদদের পরিত্যাগ করতঃ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হলো এবং সাক্ষ্য দিলো যে তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই فَقَدِ اسْتَمْسَكَ "সে সুদৃঢ় হাতল ধারণ করে নিয়েছে।"

অর্থাৎ সে তার উক্ত বিষয়ে অটল থাকল এবং সে শ্রেষ্ঠ পন্থা ও সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকল...। এবং আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে চলবে, তাকে তিনি শান্তির পথ দেখাবেন এবং তিনি তার মু'মিন বান্দাদেরকে কুফ্র, সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকার থেকে বের করে, সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, সহজ, সরল, উজ্জল সত্যের আলোর দিকে নিয়ে যাবেন।

পক্ষান্তরে কাফিরদের অভিভাবক হচ্ছে শয়তান। সে তাদের অজ্ঞতা ও পথ ভ্রষ্ট্রতাকে তাদের নিকট সুন্দর করে দেখায়। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে দেয় এবং সত্য পথ বিচ্যুত করে কুফর ও মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা النُّورِ 'নূর' শব্দকে একবচন নিয়ে এসেছেন এবং الظُّلُمَاتِ 'যুলুমাত' শব্দকে বহুবচন এনেছেন। কেননা, সত্য একটিই হয়ে থাকে এবং কুফর- এর অনেক শ্রেণী রয়েছে, যার প্রত্যেকটি বাতিল বা মিথ্যা।

(তাফসীর আল কুরআনুল আযীম, ১ম খণ্ড, ৩১৯, ৩২০পৃঃ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا

অর্থঃ তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা প্রবৃত্তি ও ত্বাগুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদেরকে বলে যে, এরা মু'মিনদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।
(সূরা নিসা, ৫১)

হাফিজ ইবনে কাসীর বলেনঃ মুজাহিদ (রঃ) বলেছেন, ত্বাগুত হচ্ছে মানবরূপী শয়তান। যার নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাকে বিচারক মেনে নেয়।

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, তা (ত্বাগুত) হচ্ছে প্রত্যেক ঐ জিনিস আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যার ইবাদত করা হয়....। অর্থাৎ তাদের মূর্খতা ধর্মহীনতা এবং স্বীয় গ্রন্থের সাথে কুফরী এত চরমে পৌঁছে গেছে যে, তারা কাফিরদেরকে মুসলমানদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে।
(তাফসীর আল কুরআনুল আযীম, ১ম খণ্ড, ৫২৫পৃঃ)

ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেনঃ তারা (জিব্ত ও ত্বাগুত) হচ্ছে, আল্লাহর পরিবর্তে প্রত্যেক বাতিল মা'বূদ। অথবা আল্লাহর অবধ্যতায় প্রত্যেক অনুসরণীয় ব্যক্তি বা বস্তু। (ফতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, ৪৭৭পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, ঐ সকল লোক যারা মানব রচিত আইনের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে, সহায়তা করে, এবং আল্লাহ তায়ালা, তার রসূল (সাঃ) ও মু'মিনদের সাথে এজন্য যুদ্ধ করে, উক্ত আয়াতে কারীমাহ তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা তারা আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে কিংবা আল্লাহর সাথে তাদের শাসকদের ইবাদত করে এবং তারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূল (সাঃ)- এর অবাধ্য হয়ে তার (শাসক) আনুগত্য করে। অতএব তাদের ও তাদের শাসকদের কাফির হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত এই দ্বীন হতে জানা যাচ্ছে। কেননা, শাসকবর্গ আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে বা আল্লাহ তায়ালার সাথে তাদের ইবাদত করতে লোকদের বাধ্য করে। এবং এ অনুসারীগণ এই সকল শাসকদের আনুগত্য করে। এবং তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর নির্দেশের অবাধ্য হয়।

অবশ্যই কোন মন্তব্যকারী এমন কথা বলতে পারেনা যে, আমরা ছোট কুফরীর অপরাধে তাদেরকে কাফির বলছি। না, এখানে অপরাধ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও তার রসূল (সাঃ) এর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা এই সকল শাসকের আনুগত্য করেছে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দাসত্ব করেছে। এই সব শাসকের ইবাদত (দাসত্ব) করা কুফরী। তা (ইবাদত করা) "শব্দগত হোক"। অর্থাৎ, মানুষ মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিবে যে, সে এই শাসকদের ইবাদত বা দাসত্ব করে। এমনটি অর্জিত হয় না। অথবা "আনুগত্যে হোক"- এটাই এখানে ইবাদত থেকে উদ্দেশ্য। কেননা এই লোকেরা শাসকদের আনুগত্য করে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, পৃষ্টপোষকতা করে এবং তারা জান ও মান দিয়ে তাদের রক্ষা করে। তারা দ্বীনে ইসলামের বিরুদ্ধে এই সকল শাসকের দ্বীনের সহযোগিতার জন্যে আল্লাহ তায়ালা, তার রসূল (সাঃ) ও মুওয়াহহিদ (একত্ববাদী) মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সে শাসককে বলবেঃ আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার ইবাদত করি!

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

অর্থঃ "তারা 'ত্বাগুত' কে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে।" (সূরা নিসা, ৬০)

ইমাম শাওকানী বলেনঃ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمَ 'তাদের কৃতকর্মের দরুন'.... থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে-"ত্বাগুত'কে বিধান দানকারী বানানোর অপরাধ সমূহ।" (ফতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, ৪৮৩পৃঃ)

ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ অত্র আয়াতে আল্লা আয্যা ও জাল্লা ঐ লোকদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন- যারা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ তায়ালা তার রসূলের উপর এবং পূর্ববর্তী নবীদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান এনেছে কিন্তু যখন কোন বিবাদের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়

দেখা দেয়, তখন তারা আল্লাহর কিতাব ও তার রসূলের সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, বরং অন্য দিকে যায়। অতঃপর তিনি এই আয়াতের শানে নুযুল উল্লেখের পর বলেন, এ আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দে করছে, যে কিতাব ও সুন্নাহকে ছেড়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফয়সালা নিয়ে যায়। এখানে এটাই হচ্ছে 'ত্বাগুত'- এর ভাবার্থ।

(তাফসীর আল কুরআনুল আযীম, ১ম খণ্ড, ৫৩১পৃঃ)

সাইয়িদ কুতুব (রহঃ) বলেনঃ আপনি এই ভীষণ আশ্চর্যের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেছেন কি? লোকজন ঈমানের দাবী করছে..... অথচ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার কাছে তারা বিচার নিয়ে যায় না? তারা তো অন্য জিনিস, অন্য মতাদর্শ ও অন্য বিধানের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়। তারা ঐ ত্বাগুত- এর কাছে ফয়সালা নিয়ে যেতে চায়, যে আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের উপরে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা গ্রহণ করতে রাজী নয়।

'ত্বাগুত'- এর দ্বারা প্রভূত্বের বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি বৈশিষ্ট্যর দাবী করছে। ....তারা এই কর্ম অজ্ঞতার জন্য করছে না এবং ধারণাবশতও করছে না। তারা তো এটা নিশ্চিত বিশ্বাস রেখেই করছে এবং তারা এটা ভাল করেই জানে যে, ত্বাগুত এর নিকটে বিচার ফয়সালা নিয়ে যাওয়া হারাম { وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে} অতএব উক্ত বিষয়ে কোন অজ্ঞতা ও কোন ধারণার অবকাশ নেই। বরং এই বিষয় স্বেচ্ছায় ও ইচ্ছাকৃতভাবে হচ্ছে। এক্ষেত্রে মানুষের নিকট থেকে অজ্ঞতার কৈফিয়ত গ্রহণ করা হবে না। কেননা ত্বাগুতকে অস্বীকার করা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের একটি বড় বিষয়।

(তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড, ৬৯৪পৃঃ)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

অর্থঃ যারা কাফির তারা ত্বাগুত এর পথে যুদ্ধ করে। (সূরা নিসা, ৭৬)

সাইয়িদ কুতুব (রহঃ) বলেনঃ এরূপভাবে মুসলমানগণ একটি কঠিন ভূখণ্ডে অবস্থান করছে। তারা তাদের পৃষ্ঠদেশকে দৃঢ় ভিত্তির দিকে ঠেক দিয়ে রেখেছে। আবেগকে পরিতৃপ্ত করছে। কেননা তারা আল্লাহর জন্যে যুদ্ধে নিমগ্ন রয়েছে। এতে তাদের নিজেদের জন্য কোন অংশ নেই। তাদের ব্যক্তিত্বের জন্যও কোন ভাগ নেই। তাদের জাতি, গোত্র, আত্মীয়স্বজন ও আপনজনের জন্যেও তাতে কিছুই নেই। এটাতো শুধু এক আল্লাহর জন্যে এবং তার পন্থা ও শরীয়তের জন্যই সীমাবদ্ধ। তারা এমন এক বাতিল সম্প্রদায়ের মুখোমুখি অবস্থান করছে, যারা সত্যের উপর মিথ্যাকে বিজয়ী করার জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত।

কেননা তারা মানব রচিত জাহেলিয়াত পন্থাকে জয়যুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করে। আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা ও শরীয়াতের বিপরীতে মানব রচিত সকল পন্থা ও পদ্ধতি জাহেলিয়াত। মানব রচিত সকল আইন জাহেলিয়াত হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর উপরে মানব রচিত জাহেলী আইনকে বিজয়ী করার জন্যে লড়ে যাচ্ছে। আল্লাহর বিপরীতে মানুষের প্রত্যেকটি বিধান যুল্ম হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর ন্যায় বিচার ও ইনসাফের উপরে মানুষের যুল্মকে জয়যুক্ত করার জন্যে সংগ্রাম করছে। অথচ লোকদের মাঝে আল্লাহর ইনসাফ অনুযায়ী বিচার করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড, ৭০৯পৃঃ)

ত্বাগুতকে অস্বীকার করার অর্থঃ

আমাদের নিকট 'ত্বাগুত'- এর অর্থ প্রকাশ হওয়ার পর যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অস্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার বিভিন্ন অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার পর, আপনি যখন উক্ত বিষয়ে অবগত হলেন, তখন আপনি (আপনাকে আল্লাহ তায়ালা রহম করুন!) এই মজবুত স্তম্ভ সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং এই জাতির অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন! যা ব্যতীত কোন বান্দারই ঈমান সঠিক বলে প্রমাণিত হবে না। এবং এটা (ত্বাগুত) ঐ বিষয় হতে কোথায় অবস্থান করছে? অনেক 'ত্বাগুত' যাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিশ্বে শোরগোল হচ্ছে এবং তাদের আনুগত্য ও অনুসরণের নামে আল্লাহর বিধানকে হত্যা করে প্রত্যেক প্রকার ইবাদত তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এবং বিশেষকরে ঐ সকল লোকদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করুণ, যারা "ইসলামী জাগরণ"- এর দিকে নিজেদের সম্পৃক্ততার দাবি করে এবং উক্ত বিষয়ের (ত্বাগুত) গুরুত্ব হ্রাস করে মনে করে তারা খুব ভাল কাজ করছে।

গণতন্ত্র কি 'ত্বাগুত' নয়, আল্লাহর পরিবর্তে যার পূজা করা হয়? একে অস্বীকার করে না কেন, যা তার (ত্বাগুত) সাথে শত্রুতা ও সম্পর্কহীনতার মাধ্যমে এবং মৌখিকভাবে, বক্তৃতা ও অন্তর দ্বারা তার সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে? অতঃপর এই সকল বিচারক যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা কি 'ত্বাগুত' নয়? বরং তারা নিকৃষ্ট ত্বাগুত। এরা তো ঐ সকল ব্যক্তি যাদেরকে প্রত্যেকটি ত্বাগুত- এর জন্যে প্রস্তুত করা হয়। এ যুগে ধরাপৃষ্ঠে যার পূজা করা হয়। আর ঐ ত্বাগুত মৃত্যু বা জীবিত ব্যক্তি হতে পারে অথবা নিঃপ্রাণ হতে পারে, এতে কোন পার্থক্য নেই। তাদের অস্বীকার করার অর্থ কি এই যে, তাদের সাথে সংসদে অংশগ্রহণ করব, তাদের আসনে বসব, আইন রচনায় তাদের সাথে শরীক হব, এবং তাদের পরিত্যাজ্য ত্বাগুত- এর সাথে মিশে যাব, তারা যার নাম দিয়েছে গণতন্ত্র?

তারা কি এ যুগের ত্বাগুত জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের কাছে মাথা নত করেনি? ঐ সকল ব্যক্তিদের ত্বাগুতকে অস্বীকার করার বিষয়টি কোথায় যারা মনে করেন, শাসকদের সমালোচনা করা, তাদের বাতিলকে নগ্ন করে দেয়া তাদেরকে অস্বীকার করা ও তাদের সাথে বিরোধ জড়িয়ে পড়ার ফলে অন্তর শক্ত হয়ে যাবে, বিভিন্ন দলের উৎপত্তি হবে এবং ব্যাপক রক্তপাত

ঘটবে, অতএব আমাদের তাদের থেকে দূরে থাকা উচিত এবং তাওহীদ- এর প্রতি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। অথচ উক্ত মিসকীন জানেন না যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তাদের কাফির না বলে এবং তাদের নিন্দা জ্ঞাপন না করে তিনি প্রকৃত তাওহীদ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন।

নিশ্চয় 'এই দ্বীন' তার সর্বদিক গ্রহণ না করা পর্যন্ত কায়েম হবে না। সুতরাং রসূলগণের সর্বপ্রথম দাওয়াত- এর বিষয় অর্থাৎ 'ত্বাগুত'কে অস্বীকার করা পরিত্যাগ করে কিভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন? এ জাতির কি হল যে, তারা ত্বাগুত- এর অর্থ মাজার, পাথর ও বৃক্ষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করছেন? এ জাতির কি হল যে, তারা জীবিত ত্বাগুত থেকে লোকদেরকে এই প্রমাণ দ্বারা দুরে সরে রাখছে যে, রাজনীতি বিষয়ে কথা বলা যায় না। এ জাতির কি হল যে, তারা প্রকৃত মুয়াহ্হিদেরকে (একত্ববাদি) দোষারোপ করছে, যারা জীবিত, মৃত্যু, পাথর ও বৃক্ষ সকল ত্বাগুতকে অস্বীকার করছেন।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যার অবস্থা এই, তবে কিরূপে দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে? বরং আল্লাহর দ্বীন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার ইমারত কেমনে নির্মিত হবে, কেমন করে এর খুঁটি মজবূত হবে, আর সে ত্বাগুত এর সাথে মিশে গেছে, এর সহায়তা করছে এবং তাদের সাথে একত্রে অবস্থান হচ্ছে? অথচ সে ভীতি প্রদর্শন করার মাধ্যম 'জিহাদ' প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং জিহাদই হচ্ছে ত্বাগুতকে অস্বীকার করার একটি অংশ। সে এটা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের কর্মপদ্ধতিকে বৈধ সম্পদ বলে। অথবা বৈধ পথ বলে। যেন সে ঐ রাস্তা থেকে ছিটকে ত্বাগুত- এর উপর পড়ে যায়। এটি ভিন্ন কথা যে, কেউ কেউ এ কাজকে অন্যায় মনে করবে। অথবা কেউ এটা অপছন্দ করবে।

হে আমার জাতি, নিশ্চয় আপনারা- একটি ভয়ানক বিষয়ের দিকে গড়িয়ে পড়ছেন এবং একটি গভীর উপত্যকার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এটি শুধুমাত্র পথ পরিবর্তন করার বিষয় নয়। এটি হচ্ছে আল্লাহর উপর ঈমান ও সকল ত্বাগুতকে অস্বীকার ও অমান্য করার বিষয়। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির সর্তক হওয়া উচিত এবং সে যা বলছে ও করছে তা জেনে নেওয়া কর্তব্য। এবং কিয়ামতের দিন সকল রহস্য প্রকাশ করা হবে।

(দেখুন, 'আল ফজর' ম্যাগাজিন! ১৭তম সংখ্যা, মারকায্ আল ই'লামুল ইসলামী হতে প্রকাশিত)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুরতাদ শাসকদের ক্ষেত্রে আহ্লে সুন্নাত এর দায়ী ও শায়খদের ফাত্ওয়া ও মন্তব্য সমূহ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ- এর আলেমদের এই বিষয়টির উপরে 'ইজমা' হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শরীয়াত যেটাকে হালাল করেছে তা হারাম করল, বা শরীয়ত যা কিছু হারাম করেছে যেটা হালাল করে নিল, কিংবা দ্বীন সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞাত কোন কিছুকে অস্বীকার করল, সেটা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল কিংবা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, অথবা কোন আইন রচনা করল, আর আইন করাই কুফরী, তবে সে কাফিরে পরিণত হলো। একদল আলিম এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

যেমন, ইবনে হযম, 'মুহাল্লা' গ্রন্থে, শাত্বিবী, 'ই'তেসাম' গ্রন্থে, ইবনে তাইমিয়া ফাতাওয়াতে। এছাড়া অনেকেই উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আবু ইয়ালা বলেনঃ যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করল যে, আল্লাহ তায়ালা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা হারাম করেছেন, তা হালাল। বা উক্ত বিষয়ে রসূল (সাঃ) থেকে প্রমাণ রয়েছে, কিংবা মুসলমানগণ উক্ত বিষয়টি হারাম হওয়া সম্পর্কে 'ইজমা' করেছেন, তবে সে কাফির। যেমন, কোন ব্যক্তি মদ পান করা বৈধ করল, সলাত, সিয়াম ও যাকাতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল।

তদ্রূপ, যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত কোন বিষয়কে হারাম ঘোষণা দিল, যে সম্পর্কে তিনি অকাট্য 'নছ' দ্বারা বৈধতার বিবরণ দিয়েছেন, বা যেটা রসূল (সাঃ) বৈধ করেছেন, অথবা মুসলমানগণ 'ইলম'- এর মাধ্যমে উক্ত জিনিসটি বৈধ বলেছেন, তবে সে ব্যক্তি কাফির। যেমন কোন ব্যক্তি বিবাহ ও আল্লাহর বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এরূপ অন্য কিছু হারাম করে দিল, তবে সে ব্যক্তি মুসলমানদের 'ইজমা' অনুসারে কাফির। (আল-মু'তামাদ ফী উসূলিদ দ্বীন, ২৭১, ২৭২পৃঃ)

প্রথম অনুচ্ছেদ

প্রবীন আলিমদের মন্তব্য ও ফাত্ওয়া সমূহ

ইমাম, মুজাহিদ (রহঃ)ঃ

ইমাম মুজাহিদ, আম ও খাছ এর মাঝে ত্বাগুত- এর সংজ্ঞা একত্র করার পর বলেনঃ 'ত্বাগুত' হচ্ছে মানবরূপী শয়তান। যার নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাকে বিচারক মেনে নেয়।

(তাফসীর মুজাহিদ, তাহক্বীক, আবদুর রহমান সূরাতী, ১ম খণ্ড, ১৬১পৃঃ)

উক্ত সংজ্ঞাটি প্রমাণ করছে যে, বর্তমান যুগের শাসকবর্গ 'ত্বাগুত'। কেননা তারা, তাদের নিকট এবং তাদের আল্লাহর শরীয়াত বিধ্বংসী আইনের নিকটে লোকদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হওয়া পর্যন্তই থেমে নেই, বরং তারা এ কাজের দিকে ডাকে এবং যারা তাদের গোলামী করা হতে পিছনে থাকে, তাদের প্রত্যেককে শাস্তি প্রদান করে।

ইমাম, হাসান বাছরী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না সে কাফির।" এই আয়াতটি আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এটা আমাদের জন্য ওয়াজিব। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, ১২পৃঃ)

সুতরাং এটা প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, সে কাফির। এই বিষয়টি বর্তমান শাসকদের থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। বরং একধাপ এগিয়ে তারা বিরোধী আইন রচনা করেছে। এবং যারা তাদের আইন অনুসারে বিচার করতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের তারা শাস্তি দিচ্ছে।

ইমাম, বাক্বায়ী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, সে 'যালিম'।"

"যে ব্যক্তি ফয়সালা করে না"- অর্থাৎ, অবিরামভাবে। "আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে"- অর্থাৎ, যার সমকক্ষ কেউ নাই। অতএব, তার তুলনায় কোন ব্যক্তির বিষয়টি এমন পর্যায়ের নয় যে, তাকে ভয় করে, অথবা কোন কিছুর আশা করে, কিংবা ধার করে এমন কাজ করতে হবে। সে ব্যক্তি অন্য আইন দ্বারা বিচার করুক আর না করুক, কোন পার্থক্য নেই। "অতএব তারা" অর্থাৎ, সঠিক পথ হতে দূরে অবস্থাকারী ব্যক্তিবর্গ, সম্মানী পথের শত্রুগণ, "তারাই যালিম"- অর্থাৎ, যারা ন্যায় ও ইনসাফ করা পরিত্যাগ করেছে এবং বিভ্রান্ত হয়েছে।

অতএব তাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে ব্যক্তি অন্ধকারে পথ চলে। যদি সে এই বিধান ছেড়ে অন্য আইন গ্রহণ করে, সে চরম যুলুম করল। আর এটাই কুফরী করা।

(নাযমুদ্ দারার ফী তারতীবিল আয়াত ওয়াস সুরার, লেখক, ইমাম বাক্বায়ী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫পৃঃ)

ইমাম, ইবনে জারীর (রহঃ)ঃ

আল্লাহ ব্যতীত নিজের ইবাদত বা গোলামীর দিকে আহবান কারীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করে অন্য কিছুর দিকে লোকদের নির্দেশ দেয়।" তিনি আরোও বলেনঃ ইয়াহুদীদের কিছু কিছু লোক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে লোকদের পূজা করত।

(তাফসীর ইবনে আবী হাইয়ান, ২য় খণ্ড, ৬৪পৃঃ)

ইমাম, সুদ্দী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না।" যে ব্যক্তি এই নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিবে অথবা জেনেশুনে বাড়াবাড়ি করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।

(কালিমাতু হাক্ব, ৪৮পৃঃ)

ইমাম, ইবনে যায়েদ (রহঃ)ঃ

তিনি অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না।" যে ব্যক্তি স্বহস্তে গ্রন্থ রচনা করে তদনুযায়ী ফয়সালা করে, আর আল্লাহর কিতাব প্রত্যাখ্যান করে এবং মনে করে যে, তার উক্ত কিতাবটি আল্লাহর পক্ষ্য হতে অবতীর্ণ, সে কাফির হয়ে গেল।

(ইবনে জারীর (রঃ) সূরা মায়িদার তাফসীরে এটা উল্লেখ করেছেন)

তিনি (রঃ) যেন বর্তমান শাসকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। কেননা মুসলিম জাতি আবিদ ও তাতারদের রাজত্বকাল ব্যতীত অন্য কোন সময় এমন দুর্যোগের সম্মুখীন হয়নি। তা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামী খিলাফত এর অস্তিত্বও ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রতিটি রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন পরিহার করে বিচার করা হচ্ছে।

ইমাম, ইবনে জারীর ত্বাব্‌রী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ্ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির।"

যে ব্যক্তি আল্লাহর ঐ বিধান যা তিনি স্বীয় কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেটাকে স্বীয় বান্দাদের মাঝে আইন নির্ধারণ করেছেন, তা গোপন করে অন্য কোন আইন দ্বারা ফয়সালা করবে فَأُولَٰئِكَ 'তারাই'- যারা আল্লাহ স্বীয় কিতাবে যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী বিচার করে না, কিন্তু তারা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে এবং তিনি স্বীয় কিতাবে যে হক্ব অবতীর্ণ করেছেন, তা গোপন করেছে فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ তারা কাফির। তারা ঐ সকল ব্যক্তি, যে সত্যকে প্রকাশ করা ও স্পষ্ট করা তাদের দায়িত্ব ছিল, তা তারা গোপন করেছে, লোকদের থেকে আড়াল করে রেখেছে এবং অন্যটি তাদের নিকট প্রকাশ করেছে ও ঘুষ গ্রহণ করে রায় প্রদান করেছে।

(ইবনে জারীর, স্বীয় তফসীরে সূরা মায়িদার তাফসীরে উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন)

ইমাম ইবনে রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ)ঃ

মুসলমানদের এ বিষয়ে 'ইজমা' হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেবে, অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে গালি দেবে, কিংবা আল্লাহর নাযিলকৃত কোন বিধানকে দূরে ঠেলে দেবে, কিংবা কোন নবীকে হত্যা করবে, সে উক্ত কারণে কাফির হয়ে যাবে। যদিও সে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা স্বীকার করে।

(আস সারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রসূল, ইবনে তাইমিয়া প্রণীত, ৫১২ পৃঃ)

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামী নীতির বিপরীতে ইজতেহাদ করল এবং আইন রচনা করল, তখন সে মুজতাহিদ হবে না এবং মুসলিমও থাকবে না, যখন সে কোন বিধান রচনা করতে চাইবে। উক্ত আইনটি ইসলাম অনুযায়ী হোক কিংবা বিপরীত হোক। বরং যখন তারা বিপরীত করবে, এর দ্বারা তাদের নিজেদের কুফরী কম হবে না। (কালিমাতু হাক্ব, ৯৬পৃঃ)

ইমাম, ইবনে হয্ম (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াত এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

অর্থঃ "এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে।"

(সূরা তাওবাহ, ৩৭)

যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, তার বিধান অনুসারে কোন বিষয়ে বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যই উক্ত বিষয় থেকেই হয়, অন্য কিছু থেকে নয়। সুতরাং বিশুদ্ধরূপে প্রমাণ হলো যে, 'পিছিয়ে দেয়া কুফরী।' এটি একটি আমল। অর্থাৎ আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন, তা হালাল করে নেয়া।

(আল ফাস্ল, ৩য় খণ্ড, ২৪৫ পৃঃ)

শায়খ ডঃ আবদুল আযীয আবদুল লতীফ, ইবনে হযম (রহঃ) এর বক্তব্যের টীকায় বলেনঃ এই সকল আইন প্রণয়নকারী আল্লাহ যার কোন অনুমোদন দেননি, তারা তো এই সব ত্বাগুতী আইন প্রণয়ন করেছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এগুলো সৃষ্টির জন্যে বেশী উপযোগী ও অধিক কল্যাণ কর। এই বিষয়টি তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছে। বরং ঐ আইনের

কোন একটির প্রতি সামান্য সম্মান প্রদর্শন করলেও তখন সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর আইন এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্যে কাফির হয়ে গেলো এবং মিল্লাত পরিবর্তন করে ফেললো। আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ শরীয়াত হতে বের হয়ে এই আইন রচনার অনুমোদন ও বৈধ্যতার দিকে সম্পর্ক যুক্ত হলো। আর যে ব্যক্তি এই শরীয়াত বা আইন-কানুন হতে বের হওয়ার অনুমোদন দেয়, সে ব্যক্তি মুসলমানদের 'ইজমা' অনুসারে কাফির।

(নাওয়াকিযুল ঈমান আল-কওলিয়া ওয়াল আমালিয়া, ৩১৩ পৃঃ)

ইবনে হাযম (রহঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, কারো জন্যে এই অনুমোদন রয়েছে যে, যে বিষয় রসূল (সাঃ)- এর মৃত্যু পর্যন্ত হালাল ছিল, তা হারাম করবে, অথবা কোন বিষয় তাঁর (সাঃ)- এর মৃত্যু পর্যন্ত হারাম ছিল, তা হালাল করবে, কিংবা তাঁর (সাঃ)- এর মৃত্যু পর্যন্ত কোন 'হাদ্দ' (শাস্তি) ওয়াজিব ছিল না, তা ওয়াজিব করবে, অথবা এমন আইন প্রণয়ন করবে, যা তাঁর (সাঃ) জীবিতাস্থায় ছিল না, তবে সে কাফির, মুশরিক। তার রক্ত ও মাল হালাল। তার বিধান মুরতাদ এর বিধান অনুযায়ী হবে, এতে কোন পার্থক্য নেই। (আল ইহকাম, ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃঃ)

তিনি আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি মনে করে, রসূল (সাঃ)- এর মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি নবীর হাদীসকে মানসূখ করতে পারে এবং তাঁর (সাঃ) এর জীবনকালে ছিল না এমন আইন রচনা করতে পারে, তবে সে কুফরী করল, শিরক করল, তার রক্ত ও মাল হালাল এবং সে মূর্তিপূজারীদের সাথে মিশে গেল। কেননা সে আল্লাহ তায়ালার এই বাণীকে মিথ্যা বলছে।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থঃ (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।"

(সূরা আল ইমরান, ৮৫)

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দাবী করবে, কিছু কিছু জিনিস রসূল (সাঃ)- এর যুগে বিধান অনুসারেই ছিল, অতঃপর তাঁর (সাঃ)- এর মৃত্যু পর ঐ বিষয়ে পরিবর্তন হয়ে গেছে, তবে সে ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করল। কেননা ঐ সকল ইবাদত, আইন, হারাম, মুবাহ ও ওয়াজিব বিষয়, যা তাঁর (সাঃ)- এর সময় ছিল ওটাই হচ্ছে ইসলাম, যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতএব, যে ব্যক্তি এ সকল বিষয় হতে কোন একটি পরিত্যাগ করল, তবে সে ইসলাম পরিহার করল।

যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কিছু আবিস্কার করল, সে তো ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু আবিস্কার করল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ তায়ালা আমাদের কোন কিছুর সংবাদ প্রদান করেছেন, অথচ তা পূর্ণ করেননি। অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর যতগুলো আয়াত অবতীর্ণ ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেকটিতে পূর্বে অবতীর্ণ বিধানের তাফসীর, ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। (ওয়া বিল্লাহি তায়ালা আত-তাওফীক্ব)।

(আল ইহ্‌কাম, ২য় খণ্ড, ১৪৪, ১৪৫, পৃঃ)

তিনি বলেন, রায় বা মতামত দ্বারা ওয়াজিব, অথবা হারাম, কিংবা মুবাহ সংক্রান্ত আইন রচনার বৈধতা, যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ) স্পষ্ট বর্ণনা দেননি এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের (সাঃ) যবানীতে যে আইন প্রণয়ন করেছেন, রায় দ্বারা তা বাতিল করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এতদুভয়ের মাঝে তফাৎ যে মানবরচিত বাতিল আইন দ্বারা স্বৈরশাসন চালানো হয়। এই দুটোই কুফরী, এতে কোন অস্পষ্টতা নেই।

(আল ইহ্‌কাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, নতুন আইন রচনা করা চার প্রকার।

(এক) অবশ্য পালনীয় ফরযকে বিলুপ্ত করা। যেমন, সালাত- এর কিছু অংশ, বা সিয়াম- এর কিছু অংশ, কিংবা যাকাত- এর কিছু অংশ, অথবা হাজ্ব- এর কিছু অংশ, কিংবা যিনার কিছু হাদ্দ (শাস্তি), অথবা অপবাদের হাদ্দ (শাস্তি) এর কিছু অংশ বিলুপ্ত করা। অথবা ঐ সকল কিছু বিলুপ্ত করা।

(দুই) ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটানো, কিংবা নতুন ফরজ আবিস্কার করা।

(তিন) কোন হারাম বিষয়কে হালাল মনে করা। যেমন, শুকরের গোস্ত, মদ ও মৃত্যুকে হালাল করা।

(চার) অথবা কোন হালাল জিনিসকে হারাম করা। যেমন, ভেড়ার মাংস এবং এরকম অন্য কিছু হারাম ঘোষণা করা। অতএব, এর কোন একটি পদ্ধতির উক্তিকারী কাফির, মুশরিক, সে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে যুক্ত। যে ব্যক্তি এর কোন একটির অনুমোদন দেবে, তাকে তাওবার সুযোগ না দিয়ে এবং যদি সে তাওবাহ করে, তবে তার তাওবা কবুল না করে, প্রত্যেক মুসলমানের ফরয দায়িত্ব হচ্ছে তাকে হত্যা করা। তার মাল-সম্পদ মুসলমাদের বাইতুল মালে জমা হবে। কেননা, সে তার দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে।

আর রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলে, তাকে হত্যা কর। এমন ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আল ইহ্‌কাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১০ পৃঃ)

উসতাদ, আবু মানসুর আল বাগদাদী (রহঃ)ঃ

তিনি মিল্লাতে ইসলামিয়া হতে কিছু কিছু বহির্ভূত দলের স্পষ্ট হুক্‌ম সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি কোরআনে স্পষ্ট বর্ণিত হারাম বস্তুকে বৈধ করে নিল, অথবা কুরআন যাকে স্পষ্টভাবে বৈধ বলেছে, যাতে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই, তা হারাম করে দিল, সে ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহ্‌ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (আল ফারকু বাইনাল ফিরাক, ১১ পৃঃ)

ইমাম, আবু হাইয়ান, আন্দালুসীঃ

যে ব্যক্তি (فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ তারাই কাফির) অত্র আয়াতে বর্ণিত 'কুফ্‌র' দ্বারা 'ছোট কুফর' প্রমাণ করেন, তা অস্বীকার করে তিনি বলেনঃ বলা হয়েছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিয়ামতের কুফরী করা। এই মতটি দুর্বল। কেননা, 'কুফ্‌র' যখন সাধারণভাবে বলা হবে, তখন দ্বীন সম্পর্কে কুফরী করা বুঝাবে। ইবনুল আমবারী অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। সে এমন কাজ করল, যা কাফিরদের কর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই মতটিও দুর্বল। এর দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করা হচ্ছে।

(তাফসীর আল বাহরুল মুহীত, ৩য় খণ্ড, ৪৯৩ পৃঃ)

ইমাম, রাযী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা নূর, ৬৩)

নিশ্চয় এই আয়াত সমূহে দলীল রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর নির্দেশ সমূহের কোন একটি প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে প্রত্যাখ্যান করুক, অথবা অবাধ্য হয়ে করুক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। উক্ত বিষয়টি সাহাবীদের যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের মুরতাদ হওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণ করছে।

(তাফসীরে কাবীর, ৩য় খণ্ড, কালিমাতু হক্ক সহ, লেখক, শায়খ, ডঃ উমর আবদুর রহমান, ৬৮ পৃঃ)

* ইসমাঈল আল ক্বাযী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, সূরা মায়িদাহ- এর আয়াত প্রকাশ্যভাবে এই বিষয়টি প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি ইয়াহুদীদের মত আচরণ করবে এবং আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন উদ্ভাবন করে তদনুযায়ী আমল করে সেটা দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে, তবে ঐ সকল লোক যে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল, তারাও অনুরূপ হুমকির মুখোমুখি হবে। এর দ্বারা নির্দেশ প্রদান করুক অথবা না করুক। (আহ্‌কামুল কুরআন, সূরা মায়িদাহ এর তাফসীর দ্রঃ)

ইমাম, জাস্‌সাস্‌ (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার উক্ত বাণী এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থঃ অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে! অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবূল করে নেবে। (সূরা নিসা, ৬৫)

অত্র আয়াত প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ সমূহের কোন বিষয়, অথবা তাঁর রসূল (সাঃ)- এর আদেশ সমূহের যে কোন একটি প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সে ব্যক্তি সন্দেহবশত অথবা গ্রহণ না করে, কিংবা হৃষ্টচিত্তে কবূল না করে প্রত্যাখ্যাণ করলেও কোন তফাৎ হবে না। সাহাবীগণ যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের ক্ষেত্রে যে বিধান দিয়েছিলেন সেটা তাদের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত ও সঠিকরূপে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সাহাবাগণ যাকাত প্রদাণে অস্বীকারকরীদের মুরতাদ ঘোষণা করে তাদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দী করেছিলেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বিধান দিয়েছেন, যে কেউ নবী (সাঃ)-এর ফয়সালা ও আইনকে অমান্য করবে, সে মু'মিন নয়।

(আহ্কামুল কুরআন, ইমাম জাস্সাস্; ৩য় খণ্ড, ১৮১ পৃঃ)

ইমাম, আবু ইয়ালা (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করলো যে, আল্লাহ তায়ালা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা যা কিছু হারাম করেছেন, তা হালাল। কিংবা উক্ত বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে প্রমাণ রয়েছে, অথবা মুসলমানগণ উক্ত বিষয়টি হারাম হওয়া সম্পর্কে 'ইজমা' করেছেন, তবে সে কাফির।

যেমন কোন ব্যক্তি মদ পান করা বৈধ করল, সলাত, সিয়াম ও যাকাতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত কোন বিষয়কে হারাম ঘোষণা দিল, যে সম্পর্কে তিনি অকাট্য 'নছ' দ্বারা বৈধতার বিবরণ দিয়েছেন, বা যেটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বৈধ করেছেন, অথবা মুসলমানগণ 'ইলম' দ্বারা উক্ত জিনিসটি বৈধ বলেছেন, তবে সে ব্যক্তি কাফির। যেমন কোন ব্যক্তি বিবাহ, ও আল্লাহর বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এরূপ অন্য কিছু হারাম করে দিল, তবে সে ব্যক্তি মুসলমানদের ইজমা অনুসারে কাফির।

(আল-মু'তামাদ ফী উসূলিদ দ্বীন, ২৭১, ২৭২ পৃঃ)

ইমাম, দাউদী (রহঃ)ঃ

"আবীদগণ ও তাদের অনুসারীরা, যারা বর্তমান শাসকদের ন্যায় শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করত না। তারা তাদের ফাসিদ আকিদা গোপন করার জন্যে নাস্তিক হয়েছে। এজন্য তাদেরকে উক্ত নামে ডাকা হয়।" এদের সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তাদের ঐ খত্বীব যে তাদের খুত্ববা প্রদান করে ও সে জুমআর দিনে তাদের জন্য দু'আ করে, সে কাফির, তাকে হত্যা করতে হবে, তাকে তাওবাহ্ করতে বলা হবে না, তার স্ত্রী তার জন্য হারাম, সে কারো ওয়ারিস হবে না এবং অন্য কেউ তার ওয়ারিস হবে না। তার মাল মুসলমানদের জন্যে মালে ফাঈ' হিসেবে গণ্য হবে। তার দাসীদের আযাদ করে দেয়া হবে। তার মুদারবারগণ (মুনিবের মৃত্যুর সাথে আযাদ হবে, এমন শর্তযুক্ত গোলাম) মুসলমানদের অধিকারে এসে যাবে। তার মৃতুর সাথে সাথে তাদের এক তৃতীয়াংশ আযাদ করা হবে। কেননা সে আর তার মাল নয়।

তার মুকাতাবগণকে (নির্দিষ্ট অংক পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তিলাভের চুক্তিতে আবদ্ধ দাস) মুসলমানদের অধিকারে ফিরে দেয়া হবে। এবং অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে তাদের আযাদ করে দেয়া হবে। অপারগ হওয়ার জন্যে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো হবে। তার প্রত্যেক হুকুম, কাফির এর হুকুম-এর ন্যায়। সে যদি অনুশোচনা প্রকাশের জন্যে অপসারণের পূর্বেই তাওবাহ করে, জাতীর চাপের মুখে নয়, তবে তার তাওবাহ কবূল করা হবে আর যদি অপসারণের পর কিংবা চাপের মূখে তাওবাহ করে, তবে তার তাওবাহ গ্রহণ করা হবে না। যে ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার পিছনে জুমআর সালাত আদায় করবে, সে যুহ্রের চার রাকআত সালাত আদায় করে নিবে। অতঃপর ঐ স্থান পরিত্যাগ করা সম্ভব হলে, সে আর তার পেছনে সলাত আদায় করবে না। তার পরিবার-পরিজন বেশী হওয়া বা অন্য কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

("তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাক্বরীবুল মাসালিক" ৭ম খণ্ড, ২৭৪পৃঃ গ্রন্থকার, ক্বাযী ইয়ায; "ফাতওয়া খাত্বীরাহ", ৯, ১০পৃঃ, সহ; গ্রন্থকার, শায়খ, আবু ক্বাতাদাহ্ ফিলিস্তীনী)

ইমাম, আবদুল্লাহ আর রুয়াইনী (রহঃ)ঃ

তিনি 'ইজমাউ উলামায়িল ক্বাইরাওয়ান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে তাতে উল্লেখ করেছেন, বাণী আবীদ- এর অবস্থা, মুরতাদ ও নাস্তিকদের অবস্থার অনুরূপ। মুরতাদদের অনুরূপ এজন্যে যে, তারা শরীয়াতের বিরুদ্ধে ওটা প্রকাশ করেছে, অতএব 'ইজমা' অনুসারে কাউকে তাদের উত্তরাধিকারী করা হবে না। এবং নাস্তিকদের অনুরূপ একারণে যে, তারা তা'ত্বীল গোপন করেছে। অতঃপর তাদের নাস্তিক হওয়ার জন্যে হত্যা করা হবে। তারপর তিনি মন্তব্য করেন, কাউকে তাদের মাজহাবে জোরপূর্বক প্রবেশ করানোর ওজর গ্রহণ করা হবে না।

এছাড়া অন্যান্য সকল কুফরীর বিধান অন্য রকম। কেননা সে তাদের কুফরী জানার পরেও এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একাজ তার জন্যে বৈধ নয়। কুফরীতে প্রবেশের পরিবর্তে শাহাদত লাভ করাই উত্তম। আহলে সুহনূনগণ এই মত অনুসারে মুসলমানদের ফাতওয়া দিতেন।

(উপরের গ্রন্থ দ্রঃ শাইখ, আবু ক্বাতাদাহ ফিলিস্তীনী এর রিসালাহ সহ, ১১ পৃঃ)

ইমাম, আবু মুহাম্মাদ আল কুবরানী (রহঃ)ঃ

"বাণী আবীদ কাউকে তাদের দাওয়াতে প্রবেশ করতে বাধ্য করলে অথবা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিলে" এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, সে শাহাদাতকে বেছে নিবে। এটা কারো ওজর হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। এবং এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের পর কোন কিছুর আশঙ্কাকে ওজর বলে বিবেচিত হবে না। কেননা এটা এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে তার নিকট হতে শরীয়াত শূণ্য করা হচ্ছে। আর একাজ বৈধ নয়।

(উপরের গ্রন্থ দ্রঃ শাইখ, আবু ক্বাতাদাহ্, ফিলিস্তীনী এর রিসালাহ্ সহ, ১০ পৃঃ)

ইমাম, জুয়াইনী (রহঃ)ঃ

তিনি যে সকল লোক গুনাহ করা হালাল মনে করে, তাদের অবস্থা আলোচনার পর বলেন, এই মাসলাকটি যারা পারস্য সম্রাটদের পন্থা ও উত্তম দ্বীন বিলুপ্তকারী বাদশাহদের নিয়ম-নীতি গ্রহণ করেছে তাদের কি চমৎকার নিকটবর্তী। যারা এদের সাথে লেগে থাকবে তারা ময়দার তাল থেকে যেমন কেশ বের হয়, তদ্রূপ দ্বীনের বন্ধন থেকে বের হয়ে যাবে।

(গিয়াছুল উমাম, ২২২ পৃঃ; আল খুত্বুতুল আরীযাহ ফী মানহাজিল জামায়াতিল মুকাতালাহ্, ১১২পৃঃ)

শাইখ, আবূ বকর, তুরতূশীঃ

তিনি বলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ্য হতে এবং রসূল (সাঃ)- এর তরফ থেকে যে বিধান এসেছে, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তার ক্ষেত্রে এই তিনটি বিশেষণ প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সে কাফির, যালিম ও ফাসিক, যেগুলো সূরা মায়িদাহ- এর আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

(নাছীহাতু আহলিল ইসলাম, ১৯৪ পৃঃ)

ইমাম, কুরতুবী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

অর্থঃ তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে।

(সূরা নিসা, ১৪০)

অত্র আয়াত গুনাহগারদের সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করা ওয়াজিব করছে- যখন তাদের থেকে জঘন্য কর্ম প্রকাশ পাবে। কেননা যে ব্যক্তি তাদের হতে দুরে থাকবে না, সে তো তাদের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হল। অতএব, কুফরীতে সন্তোষ প্রকাশ করাও কুফরী।

(তাফসীরে কুরতুবী, ৫ম খণ্ড, ৪১৮পৃঃ)

তদ্রূপ তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

অর্থঃ অতএব, তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতে লেখার জন্যে এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।

(সূরা বাকারা, ৭৯)

অত্র আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে শরীয়াতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষেত্রে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে এ দ্বীনে পরিবর্তন করবে, অথবা এই দ্বীনে যা ছিল এবং যা বৈধ নয় তা উদ্ভাবন করল, সে ব্যক্তি এই কঠিন ধমকী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আওতায় পড়বে।

রসূল (সাঃ) যখন শেষ যামানার অবস্থা জানতে পেরেছেন, তখন তিনি তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন।

তিনি বলেনঃ

اَلاَ اِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِفْتَرَقُوْا عَلٰى اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَاِنَّ هٰذِهِ الاُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلٰى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلاَّ وَاحِدَةً...

সাবধান! তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর নিশ্চয় এই উম্মাত সত্বর তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একদল ব্যতীত প্রত্যেকটি দল জাহান্নামে যাবে।

(আহমাদ, আহমাদ শাকির এটাকে সহীহ বলেছেন; ইবনে মাজাহ, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন)

অতএব, তিনি তাদেরকে এই বলে সতর্ক করেছেন- তারা যেন দ্বীনের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অথবা তার রসূলের সুন্নাত, কিংবা সাহাবাদের সুন্নাতের বিপরীতে নিজেদের পক্ষ হতে কোন কিছু আবিস্কার না করে। অথচ তিনি যা থেকে সাবধান করেছেন, সেটাই সংঘটিত ঘটেছে, বিস্তার করেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

(তাফসীর কুরতুবী, ২য় খণ্ড, ৯পৃঃ)

ইমাম, বায়যাবী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার উক্ত বাণীর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থঃ বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। (সূরা নিসা, ৬৪)

তিনি অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট নয়, ইসলাম প্রকাশ করলেও সে কাফির, হত্যার যোগ্য। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে তার আনুগত্য করা। অতএব, যে ব্যক্তি তার আনুগত্য করল না এবং তার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, সে তার রিসালাতকে কবূল করেনি। আর যে ব্যক্তি অনুরূপ হবে সে কাফির ও হত্যার যোগ্য হবে।

(আনওয়ারুত তানজীল ওয়া আসরারুত তা'বীল, শাইখ, নাছিরুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে উমার বায়যাবী প্রণীত, ১ম খণ্ড, ২২২পৃঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

ইমাম, বাগবী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, জুমহুর উলামাগণ বলেনঃ বিধানের ক্ষেত্রে কুফরী হচ্ছে- তাতে অজ্ঞতাবশত নয় এবং ব্যাখ্যায় ভুল করে নয়। বরং ইচ্ছা করে অকাট্য প্রমাণের বিরোধিতা করা। (উপরের গ্রন্থ দ্রঃ ৫০পৃঃ)

শাইখুল ইসলাম, ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)ঃ

তিনি (রহঃ) বলেন, কোন মানুষ যখন ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন হারাম বিষয়কে হালাল করবে, ও ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন হালাল বিষয়কে হারাম করবে এবং ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন কোন আইনকে পরিবর্তন করবে, তখন সে ফুকাহাদের ঐক্যমতে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। (মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩য় খণ্ড, ২৬৭পৃঃ)

'অনুরূপভাবে তিনি বলে, এতে কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর রসূল (সাঃ)- এর উপর যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করা ওয়াজিব মনে করে না, সে কাফির। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের অনুসরণ না করে নিজের মত বা সিদ্ধান্তকে ন্যায় ও ইনসাফ মনে করে লোকদের মাঝে ফয়সালা করা হালাল মনে করবে, সে কাফির। কেননা প্রত্যেক জাতি ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারেই ফয়সালা করে। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামতই তাদের ধর্মে ইনসাফ বলে গণ্য হয়। বরং এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেদের ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততার দাবি করে, অথচ স্বীয় রীতি ও প্রথা অনুযায়ী বিচার করে, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন বিধান নাযিল করেননি।

যেমন, যাযাবরদের পুরাতন কাহিনী ও নীতি এবং তাদের নেতাদের বিধি-নিষেধ সমূহ। এবং তারা মনে করে কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত এই বিধান অনুসারে ফয়সালা করা উচিত। এটাই তো কুফ্রী। নিশ্চয় অনেক লোক এমন রয়েছে, যে বলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা নেতাদের নির্দেশক্রমে তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ীই বিচার করে। এই লোকেরা যখন জানতে পারে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত ফয়সালা করা জায়েয নয়, তখন তারা ওটা বাধ্যতামুলক গ্রহণ করে না। বরং তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফয়সালা করা হালাল মনে করে। অতএব তারা কাফির।

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাদনুযায়ী ফয়সালা করা নবীর (সাঃ) উপর ওয়াজিব এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে তাঁর আনুগত্য করে তার উপরে ওয়াজিব। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ফয়সালাকে বাধ্যতামূলক গ্রহণ করবে না, সে কাফির। (মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া, ৩য় খণ্ড, ২২ পৃঃ)

তাঁকে তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে, "অথচ তারাও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের সাক্ষী দেয় এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়ের অনুসরণের দাবী করে" উত্তরে তিনি বলেন, প্রত্যেক জাতি যারা ইসলামের প্রকাশ্য আইন-কানুনকে বাধ্যতামুলক গ্রহণ করতে নিষেধ করে, এই লোকেরাই হোক বা অন্য কেউ, তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যতক্ষণ তারা ইসলামের আইন বাধ্যতামুলক মেনে না নেয়। যদিও তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের সাক্ষী দেয় এবং ইসলামের কিছু বিধান বাধ্যতামূলক গ্রহণ করে। যেমন, ছালাত।

যেরূপভাবে আবূ বকর (রাঃ) ও সাহাবীগণ যাকাত আদায়ে বাধাদানকারী লোকদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। এবং এই নীতির উপরেই পরবর্তী ফক্বীহগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অতএব যে সম্প্রদায় ফরয ছালাত, অথবা সিয়াম, কিংবা হজ্ব, কিংবা কাফেরদের সাথে বাধ্যতামূলক জিহাদ করাকে বাধাদান করবে, উক্ত বাধাদানকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই জন্যে যুদ্ধ করা হবে। যদিও তারা উক্ত বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ বিষয়ে আলেমদের কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। মুহাক্কিকদের নিকট এই লোকেরা বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে না, বরং তারা ইসলাম হতে বহির্ভূত।

(আল-ফাতাওয়া আল কুবরা, বাবুল জিহাদ)

তিনি আরো বলেন, যে সম্প্রদায় ফরয সালাতের কিছু অংশে বাধা প্রদান করল, অথবা সিয়াম, কিংবা হাজ্ব পালনে বাধা দিল, কিংবা রক্ত, মাল, মদ, যিনা ও জুয়া হারাম করা সংক্রান্ত বিষয়ে বাধ্যতামূলক বাধা দিল, অথবা মাহরাম ব্যক্তিকে বিবাহ করা হারাম হওয়া বিষয়কে বাধ্যতামূলক হালাল করল, কিংবা কাফিরদের সাথে বাধ্যতামূলক জিহাদ করাকে নিষিদ্ধ করল, অথবা আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া নির্ধারণে নিষেধ করল। এছাড়া দ্বীনের অন্যান্য ওয়াজিব ও হারাম বিষয়ে বাধা দিল, যা কোন অস্বীকারকারী ও পরিত্যাগকারী তার ওয়াজিব প্রত্যাখ্যান করার ওযর হিসেবে দাঁড় করাতে পারবে না।

এই বাধাদানকারী সম্প্রদায়ের সাথে উক্ত কারণে যুদ্ধ করা হবে, যদিও তারা ঐ গুলোর স্বীকৃতি প্রদান করে। এ বিষয়ে আলেমদের কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। ফকীহ্‌গণ শুধু এমন বাধাদানকারী সম্প্রদায়ের বিষয়ে মতভেদ করেছেন, যারা কিছু কিছু সুন্নাত পরিত্যাগ করতে জিদ করে। যেমন, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত, আযান, ও ইক্বামত, যারা এগুলোকে ওয়াজিব বলেন না। এরূপ অন্যান্য বিধান।

উক্ত কারণে এমন বাধাপ্রদানকারী সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না? কিন্তু উপরোল্লেখিত ওয়াজিব ও হারাম বিষয় এবং অনুরূপ কোন বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কোন মতবিরোধ নেই। মুহাক্কিক আলেমদের নিকট এই সকল লোক বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে না। তারা ইসলাম থেকে খারিজ ও বহির্ভূত। (মাজমূউল ফাত্‌ওয়া, ২৮তম খণ্ড, ৫০৩পৃঃ)

তিনি তার পুস্তিকা 'তাসয়ীনিয়া' তে বলেন, কোন কিছু ওয়াজিব করা এবং হারাম করা শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজ করল, অথবা কোন কিছু ছেড়ে দিল, এবং ওটাকে দ্বীন হিসেবে আইন করে দিল, সে তো আল্লাহর জন্যে এক শরীক নির্ধারণ করে নিল এবং তাঁর (সাঃ)-এর জন্য একজন প্রতিপক্ষ তৈরী করে নিল। যেমন মুশরিকরা আল্লাহর জন্য অনেক শরীক নির্ধারণ করে নিয়েছিল। এবং যেমন মুরতাদগণ যারা মুসাইলামাতুল কাযযাব এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল।

এই বিষয়টি এমন, যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ "তাদের কি এমন কিছু উপাস্য রয়েছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার কোন অনুমোদন আল্লাহ দেননি।"

(সূরা শূরা, ২১) (মাজমূয়া ফাত্‌ওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ৫ম খণ্ড, ১৪পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ আইন হচ্ছে- কিতাব ও সুন্নাহ। যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। অতএব, এই শরীয়াত তথা আইন-কানুন থেকে সৃষ্টির কারো পক্ষে বের হয়ে যাওয়া অসম্ভব। কাফিররাই শুধু তা হতে বের হয়ে যায়।

(মাজমূয়া ফাত্‌ওয়া, ১১শ খণ্ড, ২৬২পৃঃ)

ইমাম, ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়াহ্ (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করার কুফরী বিচারকের অবস্থা অনুসারে দুই প্রকার। (১) ছোট (২) বড়। সে যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে একটি বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব বিশ্বাস রাখে, তবে এটা ছোট কুফর। আর যদি সে এটা ওয়াজিব মনে না করে এবং উক্ত বিষয়ে তার স্বাধীনতা দাবী করে, অথচ এটিকে আল্লাহর বিধান হিসেবে বিশ্বাস করে তবে এটা বড় কুফর। (মাদারিজুস সালিকীন, ১ম খণ্ড, ৩৩৬পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, তিনি (রহঃ) যদি আমাদের এই সময়ে জীবিত থাকতেন এবং ত্বাগুত শাসকদের স্পষ্ট শরীয়াতকে পরিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে বিরোধীতা করার পরিধি অবলোকন করতেন এবং কিরূপে তারা আল্লাহর পথ ও পদ্ধতির বিপরীতে পূর্ণ পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে এবং তারা আল্লাহর আইন-কানুনকে নিজেদের মনগড়া আইন দ্বারা পরিবর্তন করেছে, তবে তিনি তার ক্ষেত্রে ঐরূপ ফয়সালা দিতেন, যেভাবে তিনি বিধানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবীদার ব্যক্তির উপর দিয়েছেন। সাবধান! এটাই হচ্ছে স্পষ্ট কুফরী, যা তাকে মিল্লাত হতে বের করে দেয়।

*** তিনি অন্যত্র বলেন, যে ব্যক্তি রসূল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন এছাড়া অন্য কারো নিকট বিচার নিয়ে যায় অথবা বিচার চায়, তবে সে ত্বাগূতকে বিচারক নির্ধারণ করল এবং তার নিকটেই মকদ্দমা নিয়ে গেল। “প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে তার সীমা অতিক্রম করে, ইবাদত, অনুসরণ অথবা আনুগত্যের মাধ্যমে তাকে ত্বাগুত বলে।”

“অতএব প্রত্যেক জাতির ত্বাগুত হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার নিকট লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) ব্যতীত বিচার প্রার্থনা করে।” বা “তারা আল্লাহ ব্যতীত তার ইবাদত করে।”

ইমাম, হাফিজ, ইবনে কাসীর (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থঃ তবে কি তারা জাহেলী যুগের মীমাংসা কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম হবে?

(সূরা মায়িদা, ৫০)

মহান আল্লাহ ঐ লোকগুলোর কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেনঃ যারা আল্লাহর এমন হুকুম থেকে দুরে সরে থাকে যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরে আছে, এরূপ পবিত্র হুকুম থেকে সরে গিয়ে কিয়াসের দিকে, কুপ্রবৃত্তির দিকে এবং ঐসব হুকুমের দিকে ঝুকে পড়ে যা লোকেরা কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকেই বানিয়ে নিয়েছে।

যেমন আহলে জাহেলীয়াত ও আহলে যালালাত (গোমরাহ সম্প্রদায়) নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক হুকুম আহকাম জারি করতো এবং যেমন তাতারিগণ রাষ্ট্রীয় কাজ কারবারে চেঙ্গিস খানি হুকুমের অনুসরণ করতো, যা আল-ইয়াসিক তৈরী করে দিয়েছিল। ওটা ছিল বহু সম্বলিত আহকামের দফতর, যা বিভিন্ন শরীয়াত ও মাজহাব হতে ছেঁটে নেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল ইয়াহুদিয়াত, নাসরানিয়াত, ইসলামিয়াত ইত্যাদি সমস্ত আহকামের সমষ্টি, আবার তাতে এমনও কতক আহকাম ছিল যা শুধুমাত্র জ্ঞান, মত ও সূক্ষ্ম চিন্তা দ্বারা আবিস্কার করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে প্রবৃত্তিরও সংযোগ ছিল।

সুতরাং ঐ সমষ্টিই তাদের সন্তানদের নিকট আমলের যোগ্য বিবেচিত হতো এবং ওকেই তারা কিতাব ও সুন্নাতের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কার্য সম্পাদনকারীরা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। যে পর্যন্ত তারা ঐসব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে এবং যে কোন ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোন হুকুম গ্রহণ না করে।

(তাফসীর আল কুরআনুল আযীম, ২য় খণ্ড, ৭০পৃঃ; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩তম খণ্ড, ১১৯পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি স্পষ্ট শরীয়াত যা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, খাতামুন নাবিইয়ীন- এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা পরিত্যাগ করতঃ পূর্বের মানসুখ শরীয়াত সমূহের নিকট বিচার নিয়ে যায়, সে কাফির। অতএব, যে ব্যক্তি ইয়াসিক-এর আইন-কানুনকে প্রাধান্য দিয়ে তার কাছে বিচার নিয়ে যায় তার অবস্থা কিরূপ হবে, যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুসলমানদের ইজমা অনুযায়ী কাফির হয়ে যাবে।

(আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪তম খণ্ড, ১২৯পৃঃ)

ইমাম, ইবনে আবিল আয্ হানাফী (রহঃ)ঃ

শাসক যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব নয়। অথবা সে এক্ষেত্রে স্বাধীন কিংবা এটা আল্লাহর বিধান তাতে সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তবুও এটাকে সে হালকা মনে করল, তবে তা সবচেয়ে বড় কুফ্র। (সরহুল আকীদাতিত ত্বাহাবিয়া, ২য় খণ্ড, ৪৪৬পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, বর্তমান শাসকরা এর প্রত্যেকটি অপরাধে লিপ্ত। বরং তারা দাবী করে, বর্তমান যুগে আল্লাহর ফয়সালার চেয়ে তাদের আইন-কানুন উত্তম ও অধিক উপযোগী। যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব এই কথার দিকে আহবান করে, এদের প্রত্যেককে তারা পশ্চাদগামী, অনুন্নত ও বোকা বলে আখ্যায়িত করে।

ইমাম, আবুস সুউদ (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণীর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ -যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না) শুধুমাত্র খাতাবীন (সম্বোধিব ব্যক্তি) নয়, যে কেউ হোক না কেন, তারা উক্ত হুকুমের প্রথমভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নিশ্চয় যে ব্যক্তি ওটা হালকা মনে করে তদনুযায়ী ফয়সালা করবে না (فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - তারাই কাফির) তারা ওটা হালকা মনে করার জন্যে। যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহ নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা পরিহার করার জন্যেই কুফর-এর হুকুম প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব কিরূপ হবে, যেক্ষেত্রে এর বিপরীত আইন যুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে তাদেরকে যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে তা দ্বারাই যদি সূচনা হয়?

(কালিমাতু হাক্ব, শাইখ, ডঃ উমার আবদুর রহমান প্রণীত, ৪৯পৃঃ)

ইমাম, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)ঃ

তিনি ত্বাগুত- এর অর্থ জানিয়ে দেয়া এবং তাকে অস্বীকার করা ওয়াজিব- এর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ত্বাগুত ব্যাপক আকারে হতে পারে। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় এবং সে উক্ত ইবাদতে রাজী, সে হচ্ছে ত্বাগুত। ঐ ব্যক্তি উপাস্য, অথবা নেতা, কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর আনুগত্যের পরিবর্তে অনুসরণীয় ব্যক্তি হতে পারে। আর এরাই হচ্ছে ত্বাগুত। ত্বাগুত অনেক প্রকারের হতে পারে। তম্মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পাঁচ প্রকার।

(১) ঐ শয়তান যে গাইরুল্লাহ এর ইবাদতের দিকে আহ্বান করে।

(২) আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক।

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না।

(৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত ইলমে গাইব- এর দাবী করে।

(৫) আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় এবং সে উক্ত ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকে। (মাজমূআ আত-তাওহীদ, ১৪, ১৫ পৃঃ)

তিনি অন্যত্র বলেন, তুমি জেনে রাখো, ত্বাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন লোক আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হতে পারবে না।

(মাজমূআ আত-তাওহীদ, ২৯পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, ত্বাগুত অস্বীকার করার স্বরূপ হচ্ছে, গাইরুল্লাহ-এর ইবাদতকে বাতিল বিশ্বাস করবে, তাকে পরিহার করবে, তার মান্যকারীদের কাফির আখ্যায়িত করবে এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।

(মাজমূআ আত-তাওহীদ, ৩০পৃঃ)

বর্তমান সময়ের শাসকরা এই সকল গুনে গুণান্বিত। তারা লোকদেরকে তাদের গোলামী করতে বাধ্য করে। এবং যে ব্যক্তি খালিস নির্দোষপূর্ণ তাওহীদ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করে।

ইমাম, শাওকানী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ
(وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির) مَنْ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এটি বুঝাচ্ছে যে, এই নির্দেশ কোন নির্দিষ্ট জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেক বিচারকের জন্য প্রযোজ্য। এ মতামতও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই আয়াতের নির্দেশ এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে হালাল মনে করবে, বা অন্য বিধান দ্বারা ফয়সালা করা হালাল মনে করবে। অথবা অস্বীকার করে মানব রচিত বিধান দ্বারা ফয়সালা করবে। أُولَئِكَ শব্দ مَنْ শব্দের দিকে ইশারা করছে। এটা অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। অনুরূপভাবে هُمُ الْكَافِرُونَ এর মধ্যে বহুবচনের সর্বনাম রয়েছে।

(ফাতহুল কাদির, ২য় খণ্ড, ৪২পৃঃ)

এর তাৎপর্য এই, যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনের বিপরীতে ফয়সালা করবে, হালকা মনে করে, কিংবা অন্য আইন দ্বারা বিচার করা বৈধ মনে করে, অথবা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, তার হুকুম একই। অর্থাৎ সে কাফির, মুরতাদ।

তিনি তার পুস্তিকা “আদ্-দাওয়াউল আজিল ফী দাফ্ইল্ আদুউবি আস-সায়িল”-এর মধ্যে আরো বলেন, এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার..... তারা ফয়সালা করে এবং এমন ব্যক্তির নিকট বিচার নিয়ে যায়, যে ত্বাগুতী আইন ব্যতীত অন্য কিছুর জ্ঞান রাখেনা। কেউ কেউ এমন রয়েছে যারা তাদের প্রতিটি বিষয় বার বার তাদের কাছে নিয়ে যায় এবং উপস্থাপন করে....। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে কুফরী করা, এই শরীয়াত যা তিনি তার নবীর যবানীতে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তার কিতাব ও রসূল (সাঃ)- এর ভাষায় তার বান্দাদের জন্যে নির্বাচন করেছেন তা অস্বীকার করা হচ্ছে।

বরং তারা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে এখন পর্যন্ত সকল শরীয়াতকেই অস্বীকার করেছে। এদের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব এবং তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালাতে হবে, যতক্ষণ না তারা ইসলামের বিধান মেনে নেয়, এটার নিকট আত্মসমর্পণ করে, এবং তাদের মধ্যে পূত-পবিত্র

শরীয়াতের আইন অনুযায়ী বিচার করে, এবং শয়তানী ত্বাগুত-এর সকল ক্রিয়াকলাপ হতে বের হয়ে আসে।

ইসলামী রীতি-নীতির সিদ্ধান্ত এই যে, নিশ্চয় অকাট্য বিধান অস্বীকারকারী, অমান্যকারী এবং এর বিপরীত আমলকারী, অবাধ্য হয়ে, কিংবা হালাল মনে করে, অথবা হালকা ভাবে, তবে সে কাফির, আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং ঐ পবিত্র শরীয়াত অস্বীকারকারী, যা আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। (আদ-দাওয়াউল আজিল, ৬৮পৃঃ)

শাইখ, সিদ্দীক হাসান খান (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ (وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ)

-যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না) مَنْ - ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। নিশ্চয় এই হুকুম কোন বিশেষ সম্প্রায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং যে কেউ ফয়সালা প্রদানের অধিকারী হবে তার জন্য প্রযোজ্য। সুদ্দী এমনটি বলেছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ, হাসান এবং নাখয়ী বলেছেনঃ অত্র তিনটি আয়াত ইয়াহুদী ও এই উম্মাতের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং যে কেউ ঘুষ গ্রহণ করে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফয়সালা করল, সে কাফির, যালিম ও ফাসিক। এটাই অধিকতর উপযোগী। কেননা শব্দের ব্যাপক অর্থের গুরুত্ব দেয়া হয়, বিশেষ কারণের প্রতি নয়।

مَنْ কালিমাটি শর্ত- এর স্থলে এসেছে, অতএব ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করবে। সুতরাং অত্র আয়াতে কারিমা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে ফয়সালা করবে না।

(ফাতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ২৯, ৩০পৃঃ; আত-তাজরিবাহ আল-জিহাদিয়া ফী সূরিয়া, উসতাদ, মুসআব সিরিয়াবী প্রণীত; ২য় খণ্ড, ৮২পৃঃ সহ)

শাইখ, আবদুর রহমান ইবনে হাসান আলে শাইখ (রহঃ)ঃ

তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীতে ফয়সালা করে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করল, অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ওটা তালাশ করল, সে তার গর্দান হতে ঈমান ও ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করল। যদিও সে ঈমানের দাবি করে। কেননা যে ব্যক্তি এমন ইচ্ছা পোষণ করে, আল্লাহ তায়ালা তার বিরোধিতা করেছেন এবং তার ঈমানের দাবিকে মিথ্যা বলেছেন।

কেননা তিনি বলেছেনঃ (يَزْعُمُونَ –তারা দাবী করে)- এর দ্বারা তাদের ঈমানকে বাতিল করেছেন। কেননা (يَزْعُمُونَ তারা দাবী করে) এই কথা অধিকাংশ সময় ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, যে এমন বিষয়ের দাবী করে– যাতে সে মিথ্যাবাদী, তদনুসারে যে সকল আমল করা প্রয়োজন তার বিরোধীতার মাধ্যমে এবং উক্ত দাবীর বিরোধী আমল করার দ্বারা। তাদের এই আচরণ আল্লাহর বাণীকে প্রমাণ করছে- (وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ -অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে তারা যেন তাতে অমান্য করে)। কেননা ত্বাগুতকে অস্বীকার করা তাওহীদ- এর স্তম্ভ। যেমন সূরা বাকারা-এর আয়াতে রয়েছে।

অতএব, যখন এই খুটি পাওয়া যাবে না, তখন সে মুওয়াহ্হিদ (একত্ববাদী) হবে না। একমাত্র তওহীদই হচ্ছে ঈমানের বুনিয়দ, যা দ্বারা সমস্ত আমল সঠিক হবে এবং যদি তা না থাকে তবে সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

যেমন উক্ত বিষয় আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে সুদৃঢ় হাতল ধারণ করে নিয়েছে।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৬)

অতএব, ত্বাগুত এর নিকট ফয়সালা নিয়ে যাওয়া, তার প্রতি ঈমান আনাকে বলে।

(ফাত্হুল মাজীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, ৩৮১পৃঃ দারুল হাদীস প্রথম মুদ্রণ)

ইমাম, জামালুদ্দীন ক্বাসিমী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র বাণীর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ -যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না)। নিশ্চই উক্ত বাক্যে জোরালো ভাষায় পূর্ববর্তী বিষয়ের পৃথক সিদ্ধান্ত রয়েছে এবং তা লঙ্ঘন করলে কঠোর ধমকী দেয়া হয়েছে। যে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা পরিত্যাগ করাতেই কুফরীর হুকুম লাগানো হয়েছে, অতএব যে ব্যক্তি এর সাথে সাথে তার বিপরীত ফয়সালা করে, বিশেষ করে তাদেরকে যে বিষয় নিষেধ করা হয়েছে তা দ্বারাই যদি সূচনা হয় তার হুকুম কি হবে!

(মাহাসিন আত তা'বীল, ১৯৯৮পৃঃ)

শাইখ, আহমাদ ইবনে নাসির ইবনে গানীমঃ

তিনি বলেন, নিশ্চয় যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর পরিবর্তে মানব রচিত আইনকে বিচারের ভার দেয়াতে সন্তুষ্ট হবে এবং এটা ছাড়া অন্য কিছু ইচ্ছা পোষণ করবে, এদের বিধান হচ্ছে তারা কাফির, যেমন তাদের শাসকগণ কাফির।

(আল-বুরহান ওয়াদ দালীল আলা কুফরিন মান হাকামা বি গাইরিত তানযীল, ২৭পৃঃ)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বর্তমান যুগের আলিম ও দায়ীদের ফাত্ওয়া ও মন্তব্য সমূহ

আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে আল্লাহর আইন পরিহার করে অন্যের নিকট বিচার নিয়ে যাওয়া এবং এর বিপরীত ফয়সালা করা বিষয়ে প্রবীণ আলিমদের মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত কিছু অংশ তুলে ধরেছি। আমাদেরকে যেন দোষারোপ করা না হয় যে, আমরা আমাদের মতের সমর্থনে তাঁদের কথা পরিবর্তন করে উপস্থাপন করেছি, অথবা তাঁরা যা কিছু বলেছেন সেটা আমাদের অবস্থা অনুযায়ী নয়। বরং সেটা তো অন্য কোন অবস্থা অনুসারে ছিল।

অতএব, বাধ্য হয়ে আমরা বর্তমান যুগের আলিম ও দায়ীগণের ফাত্ওয়া ও মন্তব্য সমূহ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে ফয়সালা করার অবস্থা এবং রব্বানী শরীয়াতকে মানব রচিত আইন-কানুন ও বিধান দ্বারা পরিবর্তন করার বাস্তব অবস্থার সমসাময়িক কালে অবস্থান করছেন এবং বেঁচে আছেন।

শাইখ, আবদুল লতীফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)ঃ

যাযাবর ও অন্যান্য উপজাতী যারা বাপ-দাদার প্রথানুসারে ফয়সালা করে তাদের সম্পর্কে শাইখকে জিজ্ঞেস করা হলো, অবগত করানোর পর তাদের উপর উক্ত কুফরীর হুকুম প্রয়োগ করা হবে কি না? তিনি উত্তরে বলেন, অবগত করানোর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও তার রসূল (সাঃ)- এর সুন্নাতের নিকট বিচার নিয়ে যায় না সে কাফির।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির। (আদ দারারুস সুন্নিয়া, ৮ম খণ্ড, ২৪১পৃঃ)

শাইখ, সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শাইখ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, খারিজীগণ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে বলে, এটা স্পষ্ট দলীল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে আল্লহর নাযিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করে ফয়সালা করে, সে কাফির। এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে পাপ করল, সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীতে ফয়সালা করল, অতএব সে নিশ্চয় কাফির হয়ে যাবে। অথচ এদের বিপরীতে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ইজমা হয়েছে। আমরা কাউকে কাফির বলি না, কিন্তু যে তাওহীদ অনুযায়ী আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, বরং এর বিপরীতে বিচার করে, শিরকে লিপ্ত হয়, মুশরিকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুয়াহ্‌হিদীনদের (একত্ববাদী) বিরূদ্ধে তাদের সাহায্য করে, তাদের আমরা কাফির আখ্যায়িত করি।

(আত-তাওযীহ্ আন তাওহীদিল খালাক ফী জাওয়াবি আহলিল ইরাক, ১৪১পৃঃ ; ইমতাউন নযর ফী কাশফি শুবহাতি মুরজিয়াতিল আসর, ৪৯পৃ সহ, শাইখ, আবূ মুহাম্মদ)

তিনি আরো বলেন, অবতরণের দিক দিয়ে খাস্ (নির্দিষ্ট) হলেও যেহেতু এটা মানসূক নয়, অতএব শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হবে।

কেননা আল্লাহর বাণী- وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ " যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না"- এটা এমন বাক্য যাতে وَمَنْ শব্দ শর্তের স্থলে এসেছে, সুতরাং ওটা ব্যাপক অর্থ বুঝাবে।

(তাওহীদুল খাল্লাক, ১৪১পৃঃ)

শাইখ, হাম্‌দ ইবনে আতীক নাজদী (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ্ তায়ালা এর আইন ব্যতীত অন্য করো নিকট বিচার নিয়ে যওয়ার হুকুম সম্পর্কে ইবনে কাসীর (রহঃ)- এর মন্তব্য এবং তিনি তাতারীদের কাফির আখ্যায়িত করার ফাত্‌ওয়া উল্লেখের সময় বলেন, আমার বক্তব্য হচ্ছে, এদের মতো সাধারণ যাযাবর ও তদ্রূপ অন্য সম্প্রদায় যারা বাপ দাদার প্রথাকে সালিস মানে এবং তাদের পূর্বপুরুষগণ যে সকল অভিশপ্ত বিষয় উদ্ভাবন করেছে তাকে বিচারক নির্ধারণ করেছে। তারা এর নাম দিয়েছে

“শারউর রুফাকা”। তারা এটাকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতের উপর প্রাধান্য দেয়, যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে, সে কাফির, তার সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যতক্ষণ তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর আইনের দিকে ফিরে না আসে।

(সাবীলুন নাজাত ওয়াল ফিকাক মিন মুওয়ালাতিল মুরতাদ্দীনা ওয়া আহলিল ইশরাক, ৮৪ পৃঃ ১৪০৮ তম মুদ্রণ)

শাইখুল ইসলাম ফিদ্-দাওলাতিল উছমানিয়া মুসতাফা ছুব্‌রী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেনঃ নিশ্চই এই পৃথক করণ (অর্থাৎ রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথক করা) দ্বীন ধ্বংসের একটি ঘৃণ ষড়যন্ত্র। এর প্রত্যেকটিতে নতুন আবিস্কার রয়েছে, দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত স্বরূপ ইউরোপীয়গণ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এগুলো জন্ম দিয়েছে, যেন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। বরং এর দ্বারা প্রথমত তাদেরকে শাসন ক্ষমতা হতে দূরে রাখা যাবে এবং দ্বিতীয়ত মুসলিম জাতি হতে দূরে রাখা যাবে। গুটি কয়েক ব্যক্তির পশ্চাদপসরণের মাধ্যমে যদি শাসন ক্ষমতায় প্রবেশ করা সম্ভব না হয়, তবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সম্ভব হবে। ব্যক্তির পশ্চাদপসরণের মাধ্যমে সে কুফুরীর অতি নিকটে পৌঁছে যায়। বরং এর দ্বারা সে মুরতাদ প্রশাসন- এর আনুগত্য স্বীকার করে। যা নিজেকে সয়ং সম্পূর্ণ দাবী করে এবং ইসলামী আইনকে তার অধীন করে নেয়।

যে ব্যক্তি তার উপর ইসলামের বীধি-নিষেধের কর্তৃত্ব স্বীকার না করে এবং তার সকল কর্মে দ্বীনের ক্ষমতা গ্রহণ না করে যখন ইসলাম হতে বের হতে পারে, অথচ সে মুসলমাদের একজন মাত্র ব্যক্তি; তবে যে ব্যক্তি প্রশাসনের কেন্দ্রে অবস্থান করে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করে সে কিরূপে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না?

(মাওকিফ্ আল আক্‌ল ওয়াল ইল্‌ম ওয়াল আলিম মির রব্বিল আলামিন, ৪থ খণ্ড, ২৮০পৃঃ)

আবু উসাইদ সিরিয়া (রহঃ) বলেনঃ নিশ্চয় রাষ্ট্র হতে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা- এর চিত্র এই, মানুষ তার রবের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহ এর নিকট বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া। যেমন, সলাত, সিয়াম, হজ্জ, এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান। অতঃপর এগুলো ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্যের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া।

অতএব যে ব্যক্তি সলাত, সিয়াম ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কিছু হতে গ্রহণ করবে সে নিঃসন্দেহে কাফির। তদ্রূপ যে ব্যক্তি তার জীবন চলার পথ কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্য উৎস হতে গ্রহণ করবে সেও কাফির। কেননা সে কিতাবুল্লাহ ও তাঁর নবীকে পরিত্যাগ করে অন্য কিছুর কাছে বিচার প্রার্থনা করেছে।

(আত-তাজরিবা আল জিহাদিয়া ফী সুরিয়া, ২য় খণ্ড, ৭৫পৃঃ উসতাদ আবু মুসআব আস সিরিয়া, প্রণীত)

ইমাম, মাহমূদ আলুসী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি কাফির হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই, যে মানব রচিত আইন ভাল মনে করে এবং ওটাকে শরীয়াতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং বলে, এটা জ্ঞানের দিক দিয়ে বেশী শ্রেয় ও জাতির জন্য বেশী কল্যাণকর। যখন তাকে কোন বিষয়ে বলা হয়, এক্ষেত্রে শরীয়াতের নির্দেশ এইরূপ, তখন সে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং রাগে চিল্লাতে থাকে। যেমন আমরা অনেকের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি। যাদেরকে আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন, অন্ধ ও বধির করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি শরীয়াতের বিরোধিতায় মানব রচিত আইনকে ভাল মনে করে এবং শরীয়াতের আইন-এর উপর ওটা প্রাধান্য দেয় তাকে কাফির আখ্যায়িত করতে ইতস্তত করা ঠিক নয়।

(তাফসীর রুহুল মায়ানী, ২৮তম খণ্ড, ২০, ২১পৃঃ)

শাইখ, মুহাম্মাদ কাত্তানী (রহঃ)ঃ

তিনি পাশ্চাত্যের একজন আলিম। তিনি বলেন, যাদের কাফির বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে- দাম্ভিক কাফিরদের অনুসরণ করা, তাদের মাজহাব গ্রহণ করা এবং তাদের রচিত আইন বাস্তবায়ন করা।

তিনি এতটুকুও বলেছেন, মোটকথা, অর্থাৎ, মানুষের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের মিমাংসা আল মালিকুল হাক্ব (আল্লাহ) যা ফয়সালা করেছেন তার পরিবর্তে তাদের আইন-কানুন দ্বারা বিচার করা। বরং বিবেকপ্রসূত আইন, কুফরী রাজনীতি এবং কল্পনাপ্রসূত রায় দ্বারা বিচার করা। যা কোন শরীয়াত আনয়ন করেনি, কোন দ্বীন নিয়ে আসেনি এবং রব্বুল আলামীনের কোন ফেরেশতাও এটা নিয়ে অবতরণ করেনি। বরং এটা বিভিন্ন আইন সম্বলিত

বিধান যাতে তারা একমত হয়েছে। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। এর মাধ্যমে তারা অনুসরণীয় শরীয়াতকে পরিবর্ততের উদ্যোগ নিয়েছে। এবং তাদের কুফ্র, শিরক ও তাদের বাণীকে প্রচলন ঘটানোর চেষ্টা চালিয়েছে। এমন কর্ম হতে সর্তক হওয়া, এটা ঘৃণা করা, শাস্তি প্রদান, এবং যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে অথবা তার অন্তর এর দিকে ঝুঁকে পড়বে তার নিন্দা প্রকাশ ইত্যাদি দ্বারা কিতাব ও সুন্নাহ ভরপুর রয়েছে।

(নাসীহাতু আহলিল ইসলাম, ১৯১পৃঃ)

শাইখ, আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাধারণ আইন রচনা করে লোকদের মানতে বাধ্য করল, যা আল্লাহর আইনের সাংঘর্ষিক, তবে সে এর দ্বারা মিল্লাত (ইসলাম) হতে বের হয়ে গেল এবং কাফিরে পরিণত হল। কাফির আখ্যায়িত করার কারণ- সে আল্লাহর পরিবর্তে আইন প্রণয়ন করেছে।

(আহিম্মিয়াতুল জিহাদ, ১৯৬পৃঃ আলী উল্য়ানী প্রণীত)

শাইখ, মুহাম্মাদ আঃ রশীদ রিয়া (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

অর্থঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদ্দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছে থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে। (সূরা নিসা, ৬১)

নিশ্চয় এই আয়াত স্পষ্টভাবে বলছে- যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর থেকে মুখ ফিরে নিবে এবং দূরে সরে যাবে, বিশেষ করে এর দিকে তাকে আহ্বান করার পর এবং এটা তাকে জানিয়ে দেয়ার পর, তবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। তার ঈমানের দাবী গণনা করা হবে না এবং তার ইসলামের দাবীও মূল্যহীন।

(তাফসীরে মানার, ৫ম খণ্ড, ২২৭পৃঃ নাওয়াকিযুল ঈমান, ২৯৫পৃঃ সহ; আবদুল আযীয আবদুল লতীফ প্রণীত)

তিনি অনুরূপ আল্লাহ তায়ালার অত্র বাণীর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ - নিশ্চয় যে সকল দলীল-প্রমাণ আমরা অবতীর্ণ করেছি, যারা তা গোপন করে.....)

অত্র আয়াত ঐ সকল নেতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা আল্লাহ যা হারাম করেননি তা তারা লোকদের জন্য হারাম করে। এবং তিনি যা বিধান দেননি, তা তারা লোকদের জন্য আইন প্রণয়ন করে। এভাবে যে, তারা শরীয়াতের বিধানকে তা'বিল করে অথবা পরিত্যাগের মাধ্যমে গোপন করে।

অতএব, এই হুকুমের আওতায় ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ অন্তর্ভূক্ত হবে, এবং যারা তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে, যার কোন অনুমোদন আল্লাহ দেননি। এবং তারা এর বিপরীত প্রকাশ করে। এতে কোন পার্থক্য হবে না- উক্ত বিষয় আক্বীদা সংক্রান্ত হোক, যেমন, ইয়াহুদীদের নবী (সাঃ)- এর গুণাবলী গোপন করা। অথবা ভক্ষণ করা এবং **সন্নাসি** জীবন যাপন করা সহ অন্যান্য আহকাম যা তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে **তৈরী** করত।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا

অর্থঃ যা তোমরা বিক্ষিপ্ত পত্রে রেখে লোকদের জন্য প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। (সূরা আনআম, ৯১)

তাদের উক্ত হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যারা কিছু ইলম প্রকাশ করবে এবং নিজেদের কোন স্বার্থে কিছু অংশ গোপন করবে, সত্য প্রকাশ তার সমর্থনে নয়।

শাইখ, ইসমাঈল আযহারী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে, এই পূর্ণ শরীয়াত, অথচ এটা ব্যতীত অন্য কোন পরিপূর্ণ শরীয়াত এ বিশ্বে অতিক্রান্ত হয়নি, তা অসম্পূর্ণ এবং বাহিরের কোন রাজনীতির মুখাপেক্ষী যা এটাকে পূর্ণ করবে- সে ঐ ব্যক্তির মত হবে, যে মনে করে তাদের যে রসূল, তাদের জন্য উত্তম বস্তু

হালাল করেন এবং নিকৃষ্ট বস্তু সমূহ হারাম করেন, তিনি ব্যতীত অন্য একজন রসূলের প্রয়োজন। তদ্রূপ যে মনে করে, কিতাব- এর কিছু কিছু ফয়সালা এবং সুন্নাতে নববী হতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত অনেক বিধান রাজনীতির বিপরীত এবং বিশ্ব ব্যবস্থার স্বার্থ বিরোধী, তবে সে নিশ্চিত কাফির।

(তাহযীরু আহলিল ঈমান আনিল হুক্ম বিগাইরি মা আনযালার রহমান, ৮০, ৮১পৃঃ)

শাইখ, আহমাদ্ শাকির (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী- প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর (রহঃ)- এর তাফসীর- এর ব্যাখ্যা করে বলেন,

(اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ - তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে?)

আমার মন্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর শরীয়াতের কোন অনুমোদন রয়েছে কি, যে মুসলমানগণ তাদের দেশে মূর্তিপূজারী, নাস্তিক ইউরোপীয়দের আইন-কানুন হতে সংগৃহীত আইন দ্বারা ফয়সালা করবে? বরং এমন আইন দ্বারা যাতে প্রবৃত্তি ও বাতিল অভিমতের পূর্ণ প্রভাব রয়েছে, তারা যা ইচ্ছা তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করছে, আর আইন প্রণেতা কোন পরোয়া করে না যে, তা ইসলামের আইন অনুযায়ী হচ্ছে, না এর বিপরীত?

আমাদের জানা মতে মুসলমানগণ তাদের ইতিহাসে তাতারি যুগ ব্যতীত অন্য কোন সময় এমন বিপদের সম্মুখীন হয়নি। আর ওটা ছিল যুলুম ও অত্যাচারের নিকৃষ্ট যুগ। এতদসত্ত্বেও তারা (মুসলমানগণ) এর নিকট মাথা নত করেনি। বরং ইসলাম তাতারদের উপর বিজয় লাভ করে। অতঃপর ইসলাম তাদের উৎসাহ দিয়েছে এবং তাদেরকে স্বীয় আইনে প্রবেশ করিয়েছে এবং মুসলমানগণ তাদের দ্বীন ও শরীয়াতে দৃঢ় থাকার জন্য তাদের কৃতকর্মের চিহ্ন টুকুও মুছে যায়। এটা এ জন্যও যে, নিশ্চয় ঐ জালিম, নিকৃষ্ট ফয়সালা শুধুমাত্র শাসকদের থেকেই প্রকাশ পায়। শাসিত মুসলিম উম্মাহর কোন ব্যক্তি এর সাথে যুক্ত হয়নি, তারা এটা নিজেরাও শিখেনি এবং সন্তাদেরও শিক্ষা দেয়নি। সুতরাং অতিদ্রুত তার প্রভাব নিঃচিহ্ন হয়ে যায়।

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, হিজরী অষ্টমশতকে উক্ত মানব রচিত আইনের জন্য হাফিজ ইবনে কাসীরের শক্ত বিশেষণের প্রতি, যা আল্লাহর

দুশমন 'চেঙ্গীস খান' রচনা করেছিল। তিনি যদি হিজরী চতুর্দশ শতকের মুসলমানদের অবস্থা দেখতেন, তবে কি বিশেষণ লাগাতেন। ওটা এক বিশেষ সম্প্রদায়ের শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা গতিশীল যুগে ছিল। অতঃপর মুসলিম উম্মাহর সাথে যুক্ত হয়। তারপর তাদের কৃতকর্মের চিহ্ন মুছে যায়।

অতঃপর বর্তমানে মুসলমানগণ নিকৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের পক্ষ হতে বড় যুল্ম ও নির্যাতনের শিকার। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ ব্যক্তিই এই শরীয়াত বিরোধী আইনের সাথে প্রায় যুক্ত হয়েছে। এটাই হচ্ছে ঐ 'আল ইয়াসিক'- এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, যা একজন কাফির ব্যক্তি রচনা করেছিল, যার কুফরী স্পষ্ট।

এ সকল আইন যা এমন লোকেরা তৈরী করে, যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে, অতঃপর ওটা মুসলিম সন্তানেরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পিতা-পুত্র এর দ্বারা গর্ববোধ করে। তারপর তাদের বিভিন্ন বিষয় ও বিবাদ "বর্তমানের আল-ইয়াসিক"- এর নিকট উত্থাপন করে। এবং যারা তাদের এ কাজে বিরোধীতা করে তাদের তুচ্ছ মনে করে। যারা তাদেরকে তাদের দ্বীন ও শরীয়াতের আইনকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার জন্য আহবান করে, তারা তাদেরকে "স্থুল-বুদ্ধি", "পশ্চাদমুখী" ইত্যাদি অশ্লীল শব্দে আখ্যায়িত করে। এখানেই তারা ক্ষান্ত নয়, বরং তারা ইসলামের যে সকল আইন-কানুন এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে, সেখানেও তারা হস্তক্ষেপ করছে, যেন ওটাকে তাদের "নতুন ইয়াসিক"- এর দিকে পরিবর্তন করতে পারে। কখনো নরম কথা বলে, কখনো চক্রান্ত ও ধোঁকা দিয়ে, এবং কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে। তারা ব্যাখ্যা দেয় এবং তারা ধর্ম হতে রাষ্ট্রকে আলাদা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এতে তারা লজ্জাবোধ করে না।

এতদসত্ত্বেও কোন মুসলমানের জন্য এই নতুন দ্বীন আলিঙ্গন করে নেয়া, অর্থাৎ নতুন আইন রচনা করা বৈধ হবে কি? অথবা কোন মুসলমান ব্যক্তি "আধুনিক আল-ইয়াসিক"- এর ছত্র ছায়ায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করা, তদনুসারে আমল করা এবং স্বীয় দলীল ভিত্তিক শরীয়াত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বৈধ হবে কি?

নিশ্চয় যে মুসলিম তার দ্বীন সম্পর্কে অবগত, পুরাপুরিভাবে ও সবিস্তারে এর উপর ঈমান রাখে এবং সে এটাও বিশ্বাস করে- নিশ্চয় এই কুরআনকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (সাঃ)- এর উপর মুহ্কাম কিতাব রূপে নাযিল

করেছেন, যাতে অগ্র ও পশ্চাৎ কোন বাতিল আসতে পারে না। সে আরো বিশ্বাস রাখে- নিশ্চয় তার আনুগত্য করা ও রসূল (সাঃ) যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন সর্বাবস্থায় তার অনুসরণ করা ওয়াজিব, চুড়ান্ত ওয়াজিব, সে ঐরূপ কাজ করতে পারে বলে আমি মনে করি না। আমি এটাও মনে না করি যে, দ্বিধাহীন চিত্তে এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া তার ওটা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

এমতাবস্থায় বিচারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা একেবারে বাতিল। ওটা সংশোধন করা এবং অনুমোদন দেয়ার কোন অবকাশ নেই। নিশ্চয় এই মানব রচিত আইনের ক্ষেত্রে ফয়সালা সূর্য্যের ন্যায় পরিস্কার। তা হচ্ছে স্পষ্ট কুফরী। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং কোন প্রতারণার সুযোগ নেই। কোন মুসলমানের পক্ষে তদনুযায়ী আমল করা, অথবা তার কাছে নত হওয়া, কিংবা ওটা স্বীকার করে নেওয়ার কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে সর্তক করা উচিত। এবং প্রত্যেকে নিজের হিসাব গ্রহণ করা আবশ্যক।

(উমদাতুত্- তাফসীর, ৪থ খণ্ড, ১৭১, ১৭২পৃঃ)

শাইখ, মাহমুদ শাকির (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, হে আল্লাহ, পথভ্রষ্ট্রতা হতে আমি তোমার নিকট সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিচ্ছি। হামদ ও সলাতের পরঃ নিশ্চয় সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি ও ফিতনাবাজ লোকেরা বর্তমান সময়ে যারা বড় বড় কথা বলেন, তারা ঐ সকল শাসক যারা সম্পদ, বিভিন্ন বিষয় এবং রক্তের ফয়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াত, যা তিনি তার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, তা পরিহার করে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা পরিত্যাগ করে এবং মুসলিম দেশসমূহে কাফিরদের আইনকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করে তাদের জন্য বিভিন্ন ওযর পেশ করেন।

অতএব, এমন কর্ম আল্লাহর ফয়সালা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তার দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া এবং কাফিরদের আইনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ফয়সালার উপর প্রাধান্য দেয়ারই নামান্তর। এটা স্পষ্ট কুফ্র। আহলে কিবলার কেউ এ বিষয়ে সন্দেহ করে না। তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এমন উক্তিকারী এবং এর দিকে আহবানকারীর কাফির আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই। আমরা বর্তমানে যে বিষয়টি

লক্ষ্য করছি তা হলো– কোন কিছু বাদ না দিয়ে ব্যাপক ভাবে আল্লাহর আইনকে পরিহার করা হচ্ছে। তাঁর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতে বর্ণিত ফয়সালার উপরে অন্য আইনকে অগ্রাধিকর দেয়া হচ্ছে এবং আল্লাহর শরীয়াতে যা কিছু রয়েছে সবগুলো নষ্ট করা হচ্ছে। বরং আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ আইনের উপর মানব রচিত আইনকে চুড়ান্ত যুক্তির মাধ্যমে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

অতএব, যে ব্যাক্তি এই দুইটি আসার (ইবনে আব্বাস ও ইবনে আবী মিজলায এর উক্তি) ও অন্যান্য আসারকে অপপ্রয়োগ করে ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণ করে এর দ্বারা সে শাসককে সাহায্য করতে চায়, অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্যকিছু দ্বারা ফয়সালা করার অনুমোদনের বাহানা তালাস করে এবং আইন পরিবর্তনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাকে এমন কাফির বলা হবে যে তার কুফরীর উপর দৃঢ় সংকল্প। এটা এই দ্বীনের অনুসারীদের সকলের জানা। (উমদাতুত্ তাফসীর, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৭পৃঃ)

শাইখ, আবদুর রহমান আস সা'দী (রহঃ)-এর ফাত্ওয়াঃ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ.......

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে.....।

(সূরা নিসা, ৬০)

নিশ্চয় কিতাব ও সুন্নাহ– এর নিকটে ফিরিয়ে দেয়া ঈমানের পূর্বশর্ত। অতএব, অত্র আয়াত প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয় কিতাব ও সুন্নাহ- এর নিকট উত্থাপন করে না, সে প্রকৃত মুমিন নয়। বরং সে ত্বাগুত এর প্রতি বিশ্বাসী..।

কেননা 'ঈমান' প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর আইনের নিকট আত্মসমর্পন করতে বলে এবং তাকে সালিস মানতে বলে।

অতএব, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি করে অথচ আল্লাহর আইনের উপর ত্বাগুত- এর আইনকে প্রাধান্য দেয়, সে উক্ত দাবীতে মিথ্যাবাদী।

(তাফসীর আস সা'দী, ১৪৮পৃঃ)

জামিউল আজ্হার- এর উসতাদ, শাইখ, মুহাম্মাদ হাযির হুসাইন (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, নিশ্চয় রাষ্ট্র হতে দ্বীনকে পৃথক করা, দ্বীনের মহান বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সামিল। কোন মুসলমানই এমন দুঃসাহস দেখাতে পারে না। (তাহকীমুশ-শারীয়াহ আছ-ছাবী প্রণীত, ৩৩পৃঃ)

শাইখ, সালিহ্ ইবনে ইবরাহীম আল-বুলাইহীঃ

তিনি বলেন, ইসলামী আইনের বিপরীতে মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা হচ্ছে, ধর্মহীনতা, কুফ্র, বিভ্রান্তি এবং বান্দাদের জন্য যুলম। উক্ত বিষয় নেতৃত্ব দিতে পারেনা এবং ততক্ষণ পর্যন্ত শারয়ী স্বার্থ রক্ষা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের পূর্ণ বিধানের আমল করা না হয়। আক্বীদা, ইবাদত, আইন-কানুন, আখলাক, চালচলন এবং ব্যবস্থাপনা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হতে হবে।

অতএব, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত ফয়সালা করা হচ্ছে- এক মাখলূক এর কর্ম দ্বারা তদ্রূপ অন্য মাখলূকের জন্য ফয়সালা করা, এটা ত্বাগুতী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা.....। সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তি, সাধারণ লোক এবং বিশেষ গোত্রের অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে কেউ বিধানের ক্ষেত্রে ঐগুলোর মধ্যে পার্থক্য করবে, সে ধর্মত্যাগী, নাস্তিক এবং মহান আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

(আসসাবীল যাদুল্ মুসতাক্নি- এর টিকা, ২য় খণ্ড, ৩৮৪পৃঃ)

ইমাম, আল্লামা, সঊদী-এর সাবেক মুফ্তী, আল-মাহাকিমুশ শারয়িয়া- এর প্রধান শাইখ, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম, আলি শাইখ (রহঃ)ঃ

তিনি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে ফয়সালা করাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে কাফির বলেছেন।

প্রথমঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে ফয়সালাকারী শাসক, আল্লাহ তায়ালার আইন ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর আইনের প্রাধান্যকে অস্বীকার করবে।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীতে ফয়সালাকারী শাসক, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর আইন সত্য হওয়া অস্বীকার করে না, কিন্তু

সে রসূল (সাঃ)-এর বিরোধী আইনকে তার আইন হতে অধিক সুন্দর, অধিক পরিপূর্ণ এবং বেশী ব্যাপক বলে বিশ্বাস করে।

তৃতীয়ঃ সে ওটা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর আইন হতে উত্তম বলে বিশ্বাস করে না, তবে সে ওটাকে সমপর্যায়ের বিশ্বাস রাখে।

চতুর্থঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীতে ফয়সালাকারী শাসক, তার ফয়সালাকে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ফয়সালার সমতুল্য বিশ্বাস করে না, কিন্তু সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ফয়সালার বিপরীত ফয়সালা করা বৈধ মনে করে।

পঞ্চমঃ এটা, এগুলো হতে অনেক বড়, বেশী ব্যাপক ও অধিকতর স্পষ্ট। তা হচ্ছে- শরীয়াত-এর সাথে বিরোধিতা করা, এর আইন-এর সাথে বড়ত্বে প্রতিযোগিতা করা, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর সাথে মোকাবালা করা এবং শরীয়াতের আইন-কানুনের সাথে সাদৃশ্য দাঁড় করানো। পরিকল্পনা করে, সাহায্য সহযোগিতা করে, বরাদ্দের মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠিত করে, শাখা-প্রশাখা তৈরী করে, বিভিন্ন রূপ দিয়ে, শ্রেণীবিন্যাস করে, নির্দেশ দিয়ে ও বাধ্য করে, এছাড়া বিভিন্ন উপায়ে ইসলামী আইনের সাথে সাদৃশ্য করা।

অতএব, অনেক ইসলামী রাষ্ট্রে এরূপ বহু আদালত পূর্ণরূপে প্রস্তুত রাখা হয়েছে, এর দরজা সমূহ খুলে রাখা হয়েছে। আর লোকেরা দলে দলে সেখানে যায়। তাদের শাসক ও বিচারকগণ কিতাব ও সুন্নাহ- এর বিপরীত ঐসব আইন দ্বারা লোকদের মধ্যে ফয়সালা করে, তারা লোকদের ওটা মানতে বাধ্য করে, তারা এটার জন্য মানুষের স্বীকারোক্তি আদায় করে এবং লোকদের উপর ওটা জোর করে চাপিয়ে দেয়। সুতরাং এর চেয়ে বড় কুফ্র আর কি হতে পারে, এবং "মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল" এই সাক্ষ্য প্রদান- এর সাথে এরপর আর কোন্ বিরোধ বড় হতে পারে?

অতএব, জ্ঞানীদের এ বিষয়ে চিন্তা করা ওয়াজিব। কেননা এতে তাদের দাসত্ব করা হচ্ছে এবং তারা প্রবৃত্তি, বিভিন্ন স্বার্থ এবং ভুল-ত্রুটির মাধ্যমে স্বৈরশাসন চালাচ্ছে। এছাড়া আল্লাহ তায়ালার অকাট্য বাণীর মাধ্যমে তাদের কুফ্রীর বিষয় তো রয়েছেই- وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ- যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা কাফির।

ষষ্টঃ মরুবাসী ও যাযাবর ও এদের মতো অন্যান্য গোত্র ও উপজাতিদের অনেক প্রধানগণ যা দ্বারা বিচার করে। অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদার পুরাণ কাহীনি ও তাদের প্রথা "সালাও মুহিম্ম" যা তারা তাদের নিকট হতে

উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, এর দ্বারা তারা বিচার করে এবং বিবাদের সময় ওটার নিকট বিচার নিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। এতে করে তারা জাহেলিয়াতের আইন- এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ)- এর আইন হাতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

(তাহ্‌কীমুল কওয়ানীন, ১৪-২০ পৃঃ দারুল মুসলিম হতে প্রথম মূদ্রণ)

শাইখ, ইমাম, মুহাম্মদ আমীন আশ-শানকীত্বী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি উক্ত আসমানী নস্ দ্বারা চুড়ান্ত ভাবে স্পষ্ট হচ্ছে- নিশ্চয় যারা মানব রচিত আইন, যা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা রসূলদের যবানীতে বিধান দিয়েছিলেন তার বিরোধিতা করার জন্য শয়তান তার বন্ধুদের মুখদিয়ে রচনা করিয়ে নিয়েছে- এর অনুসরণ করবে, তাদের কাফির ও মুশরিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। তবে আল্লাহ যার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং ওয়াহী- এর নূর হতে যাকে অন্ধ করে রেখেছেন তার কথা ভিন্ন।

অতএব, স্বয়ং সমাজে, তাদের মাল-সম্পদ, ইজ্জত ও তাদের বংশ, জ্ঞান এবং তাদের ধর্মে এই বিধানকে সালিস মানা, আসমান ও যমীনের স্রষ্টাকে অস্বীকার করা এবং সকল সৃষ্ট বস্তুকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি যা রচনা করেছেন ঐ আসমানী বিধান- এর প্রতি বিদ্রোহ করা একই কথা। তিনি তাদের সকল কল্যাণ ও স্বার্থ সম্বন্ধে অধিক অবগত। অতএব তার সাথে অন্য কোন আইন প্রণেতা মান্য করা মারাত্মক অপরাধ।

(আয্ওয়াউল বায়ান, ৪র্থ খণ্ড, ৮৩, ৮৪ পৃঃ)

শাইখ, আবদুল্লাহ ইবনে ক্বায়ূদ হাফেযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে দ্বীন ইসলাম হতে যার হুকুম জানা যায় এরূপ ইসলামের আহকাম হতে কিছু বিধান অপসারণ করা এবং এর পরিবর্তে মানব রচিত আইন হালাল করে নেয়া, লোকদের মধ্যে তদনুসারে ফয়সালা করা এবং লোকদেরকে এর নিকট বিচার নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা, এমন ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহর সাথে শিরক্ করল।

(আশ-শারীয়াতুল ইসলামিয়া লাল-কওয়ানীনুল-ওয়াজ্ইয়া, ১৭৯ পৃঃ আল-হাকিমিয়া রিসালা সহ, ১৬পৃঃ)

শাইখ, ইমাম, আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)ঃ

তিনি তাঁর গ্রন্থ "আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া"- এর মধ্যে সূরা আল-মায়িদার ৪৪, ৪৫, ৪৭ নং আয়াত এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ এখানে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে তিনটি ফয়সালা করেছেন।

প্রথম, তারা কাফির, দ্বিতীয়, তারা যালিম, তৃতীয়, তারা ফাসিক, এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালা ও তার আইন পরিত্যাগ করবে এবং অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করবে। সে নিজেই ঐ আইন রচনা করুক, অথবা অন্য কেউ তা তৈরী করুক, তবে সে তিনটি অপরাধ করবে।

প্রথমঃ তার এরূপ হস্তক্ষেপ করা। অর্থাৎ আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখান করা, এটা কুফ্র।

দ্বিতীয়ঃ নিশ্চয় তার উক্ত কর্ম আদল ও ইনসাফ বিরোধী এবং এর সাথে নিষ্ঠুর আচরণের সামিল। যে আইন পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ হবে, তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা প্রকাশ করেছেন। কেউ যদি এর বিরোধিতা করে, অতঃপর এর বিপরীত ফয়সালা করে, তবে সে নিঃসন্দেহে যুলুম করল।

তৃতীয়ঃ সে গোলাম হওয়া সত্ত্বেও তার মুনিব ও মালিকের আইনের বিরোধিতা করল (তিনি আল্লাহ তায়ালা) এবং সে তার নিজস্ব আইন অথবা অন্য কোন মানুষের আইন প্রয়োগ করল। অতএব, সে উক্ত আচরণের দ্বারা দাসত্বের গণ্ডি হতে বের হয়ে গেল এবং আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল, এটাই হচ্ছে ফিস্ক।

কুফ্র, যুলুম ও ফিস্ক এর সাথে সাথে তার নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্র হুকুম হতে বিভ্রান্ত হওয়ার আওতায় প্রবেশ করছে। অতএব, উক্ত তিনটি অপরাধ না পাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান হতে দূরে অবস্থান করা সম্ভব হবে না। (আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া, ১০৫, ১০৬ পৃঃ)

শাইখ, মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রহঃ)ঃ

তিনি, 'ত্বাগুত'- এর অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সালাফ্দের পছন্দনীয় মত হচ্ছে- নিশ্চয় 'ত্বাগুত' প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলে, যে বান্দাকে আল্লাহর ইবাদত হতে নির্ভেজাল দ্বীন মান্য করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সাঃ) আনুগত্য করতে বাধা দেয় এবং ফিরে রাখে।

এই ত্বাগুত- এর আওতায় পড়বে ইসলাম বহির্ভূত ব্যক্তিদের আইন-কানুন, তাদের রীতি-নীতি সহ অন্যান্য বিষয়, যা মানুষ রচনা করেছে, এর মাধ্যমে তারা রক্ত সংক্রান্ত বিষয়, গুপ্তাঙ্গ সংক্রান্ত বিষয় ও ধন-সম্পদ সম্পর্কীয় বিষয়ে ফয়সালা করতে পারে। এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর আইন-কানুনকে ধ্বংস করতে পারে। যেমন হদ্দ কায়েম করা, সুদ, যিনা, মদ এবং অন্যান্য বস্তু হারাম করা। আর এসকল আইন দ্বারা ওগুলোকে হালাল করা হচ্ছে, এবং এগুলোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারীদের মাধ্যমে রক্ষণা-বেক্ষণ করা হচ্ছে। এই আইন-কানূন স্বয়ং ত্বাগুত এবং এর প্রণয়নকারী ও প্রচলনকারীগণ ত্বাগুত...। (ফাত্হুল মাজীদ, পার্শ্বটীকা, ২৬৯, ২৭০ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, যেমন ইবনে কাসীর (রহঃ) তাতারদের সম্পর্কে বলেছিলেন।

অনরূপ বরং তার চেয়ে জঘণ্য, ঐ ব্যক্তি যে ইউরোপীয় আইন-কানূন গ্রহণ করে এবং রক্ত, গুপ্তাঙ্গ ও ধন-সম্পদ সম্পর্কীয় বিষয় এটার নিকট-ফয়সালার জন্য নিয়ে যায়, এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূল (সাঃ) এর উপর তাকে প্রাধান্য দেয়। অথবা সে ওটা জানে এবং তার কাছে উক্ত বিষয় স্পষ্ট। সে নিঃসন্দেহে কাফির, মুরতাদ, যখন সে এতে জেদ করবে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত ফয়সালা- এর নিকট ফিরে না আসে। তাকে যে নামেই ডাকা হোকনা কেন, কোন উপকারে আসবেনা এবং সলাত, সিয়াম এর মতো প্রকাশ্য কোন আমলই তার কোন কাজে লাগবে না।

(ফাতহুল মাজীদ, পার্শ্ব টীকা, ৩৮৪ দারুল হাদীস, কাহেরাহ্ হতে প্রথম মুদ্রণ)

উসতাদ, শহীদ, (আমরা এমনটি মনে করি) আবদুল্ কাদির আওদাহ্ (রহঃ)ঃ

তিনি **"এটাই ইসলামের আইন"** এই শিরোনামে উল্লেখ করে বলেনঃ এরূপ ভাবে ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে শাসক ও তাদের শাসনের ঐ বিষয়- এর অবাধ্য হতে ওয়াজিব ঘোষণা করেছে যাতে স্রষ্টার অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। শাসক এবং গুটিকয়েক ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করছে। আর প্রশাসন মুসলমানদের জন্য এমন আইন প্রবর্তন করছে, যা তাদেরকে কুফ্রী করতে বাধ্য করে এবং ইসলাম হতে দূরে রাখে।

অতএব, এমন কঠিন সময়ে প্রত্যেক মুসলমানের তার ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে- সে কর্মচারী হোক বা সাধারণ জনতা, বিচারক হোক বা না হোক মানবরচিত আইনের উপর হামলা করা এবং ইসলাম বিরোধী স্থাপনায় আক্রমন করা। বিশ্বের সকল প্রান্তের মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে– মানব রচিত আইন পরিবর্তন করতে এবং ইসলাম বিরোধী স্থাপনা ধ্বংস করতে এবং এগুলো স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগীতা করা।

যদি কোন ব্যক্তি অথবা কিছু লো্ক স্বহস্তে ঐগুলো ধ্বংস করার কাজে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ হয়, তবে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে- সে তাদের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধ করবে এবং কলম দ্বারা তাদের উপর হামলা চালাবে, এতে সে ঐ সকল ভাইদের সাহায্য করবে, যারা তাদেরকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে সামর্থ্য হচ্ছে। যদি কোন ব্যক্তি বা কিছু লোক এমন কাজ করতে অথবা এমন কথা বলতে অসামর্থ্য হয় যার দ্বারা মানব রচিত আইন অথবা ইসলাম বিরোধী কেন্দ্র ধ্বংস করা যায়, তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, সে যেন অন্তরে অন্তরে তাদের ধ্বংস কামনা করে, ওটাকে লা'নত করে এবং এটার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মনে মনে লা'নত করে। মুসলমানদের স্বীয় ওয়াজিব দায়িত্ব পালনে এবং এতে সাফলতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে- তাদের দূরের ও কাছের, শক্তিশালী ও দূর্বলদের জন্য ঈমানের দাবি হচ্ছে মুনকার (নিকৃষ্ট কাজ)- কে পরিবর্তন করা এবং এ সকল মূর্তি ও ত্বাগুতদের ধ্বংস করা।

("আল ইসলাম ওয়া আযাউনা আল-ক্বানূনি'য়া", "আত তাজরিবাতুল জিহাদি'য়া ফী সূরিয়া", উসতাদ আবু মুসআব্ আস-সূরী প্রণীত গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, যে সকল বিষয় হারাম হওয়াতে ইজমা হয়েছে, তা বৈধ মনে করা। যেমন, যিনা করা, নেশা করা, এবং হাদ্দ (শাস্তি)- কে বাতিল করা, শারীয়াতের আহকামকে শূণ্য করণ বৈধ মনে করা এবং আল্লাহ তা'আলা যার অনুমোদন দেননি, এমন আইন রচনা করা বৈধ মনে করা, ঐগুলো তো কুফরী এবং ধর্মত্যাগ করা। (পূর্বের প্রমাণের গ্রন্থ দ্রঃ)

তিনি আরো বলেন, বর্তমান যুগে স্পষ্ট কুফরীর উদাহরণ হচ্ছে- শরীয়াতে ইসলামিয়ার ফয়সালা করা হতে বিরত থাকা এবং এর পরিবর্তে মানব রচিত আইন বস্তবায়ন করা। অথচ ইসলামের মুল কথা হচ্ছে- আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত ফয়সালা করা হারাম উক্ত মাসআলা বিষয়ে কুরআনের 'নাস' স্পষ্ট ও অকাট্য.....।

এ বিষয়টি সর্বস্বীকৃত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ সমূহের কোন নির্দেশ অথবা তাঁর রসূল (সাঃ)- এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে। সন্দেহবশত, বা গ্রহণ না করে অথবা স্বীকৃতি দানে বিরত থেকে প্রত্যাখ্যান করলেও তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

(তার মূল্যবান গ্রন্থ "আত-তাশ্রীউল মান্নানী" ২য় খণ্ড, ৮০৭পৃঃ দেখুন!)

উসতাদ, শহীদ, (আমরা এমটি মনে করি) সাইয়্যিদ্ কুতুব (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, এর প্রত্যেকটি বিষয়ে মাসআলা হচ্ছে- ঈমান অথবা কুফরির মাসআলা, ইসলাম বা জাহেলিয়াতের মাসআলা, শরীয়াত কিংবা খেয়াল-খুশির মাসআলা। এই বিষয়ে মধ্যস্থতার কোন অবকাশ নেই, কোন সন্ধি বা আপোষের সুযোগ নেই। অতএব মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে (এর বিন্দুমাত্র ভঙ্গ করে না এবং কোন্ কিছু পরিবর্তন করেনা)।

আর কাফির, যালিম, ফাসিক তারাই, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না। সুতরাং শাসক ও বিচারকগণ যদি পূর্ণরূপে আল্লাহর শরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তখন তারা ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। নয়তো তারা অন্য কোন শরীয়াতে কায়েম থাকবেন, যার কোন অনুমোদন আল্লাহ দেননি, তবে তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক হয়ে যাবেন। আর লোকেরা যদি প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে শাসক ও বিচারকদের নিকট হতে আল্লাহর বিধান ও ফয়সালা গ্রহণ করে তবে তারা মু'মিন থাকবে, নচেৎ

তারা মু'মিন নয়। এই পথ ও ওটার মধ্যে মধ্যস্থতা করার কোন সুযোগ নেই। মাস্লাহাত (কল্যাণ, স্বার্থ)- এর পক্ষে কোন হুজ্জাত, বা কোন ওযর কিংবা কোন যুক্তির অবকাশ নেই।

অতএব, একমাত্র আল্লাহই মানুষের প্রভু, তিনি মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন রচনা করেন। তাঁর বিধান ও শরীয়াত হতে উত্তম কোন বিধান বা শরীয়াত নেই। তার কোন বান্দার এ অধিকার নেই যে বলবে, আমি আল্লাহর আইন প্রত্যাখ্যান করি, অথবা বলবে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ হতে সৃষ্ট জীবের কল্যাণ সম্পর্কে অধিক প্রত্যক্ষকারী। যদি সে মুখের বা কর্মের দ্বারা এমন কথা বলে, তবে সে ঈমানের বন্ধন হতে বের হয়ে যাবে।

(দেখুন, তাঁর মূল্যবান তাফসীর 'যিলালুল কুরআন' ২য় খণ্ড, ৮৮৮পৃঃ; অধিক জানতে হলে তাঁর সূরা মায়িদার আয়াত সমূহের তাফসীর দেখুন, কেননা ওটা অত্যান্ত মূল্যবান)

শাইখ, উসতাদ, মুহাম্মদ কুতুব (হাঃ) তায়ালাঃ

তিনি বলেন, আমরা কিরূপে নিজেদের জন্য মনে করতে পারি যে, লা–ইলাহা ইল্লাহ এর উপর ঈমান এনেছি। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নাই, এবং আল্লাহ ছাড়া কোন বিধানদাতা নেই, যখন আমরা অবস্থা অনুযায়ী যা মুখে যেন বলছি হে প্রতি পালক, নিশ্চয় তুমি বলেছ, 'সুদ হারাম' আর আমরা বলছি এটা সমসাময়িক অর্থনীতি জীবনের মূল বিষয়, এটা ব্যতীত প্রতিষ্ঠ লাভ করাই অসম্ভব।

অতএব, আমরা এর অনুমোদন দিয়েছি, এবং তা চালু করেছি এবং এটাকে সম্পদ বিনিময় করার মূল হিসেবে নির্ধারণ করেছি! হে রব, তুমি বলেছ, যিনা হারাম। তোমার প্রেরীত কিতাব ও তোমার রসূলের সুন্নাতে এটার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করেছ, অথচ আমরা দেখছি এটা এমন কোন অপরাধনয় যার জন্য বিশেষকরে নির্দিষ্ট শাস্তি দিতে হবে, যখন উভয়ের সম্মতিক্রমে হবে এবং মহিলাটি ছোট নয়! যখন কাজটি এভাবে সংঘটিত হবে, তখন আমরা অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করে তোমার নির্ধারিত শাস্তির পরিবর্তে অন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছি! হে প্রতিপালক, তুমি তো বলেছ, চুরি করার শাস্তি হাত কেটে দেয়া, আর আমরা লক্ষ্য করছি, এই শাস্তি নিষ্ঠুর ও বর্বর, আমাদের নিকট চুরি করার শাস্তি জেল দেয়া, এটা বিংশ শতাব্দীর একটি মার্জিত শাস্তি! (তাত্বীকুশ শারীয়া, ২০, ২১ পৃঃ)

শাইখ, মুজাহিদ, ডঃ উমার আবদুর রহমান, (আল্লাহ তায়ালা তাকে হিফাযত করুন এবং আমেরিকায় ত্বাগুতদের জেলখানা হতে মুক্ত করুন!)

তিনি সূরা মায়িদার আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, (الْكَافِرُونَ তারা কাফির) নিশ্চয় আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করা হয়েছে। যদিও ফয়সালা করা অন্তর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ- এর আমলকে সামিল করে, কিন্তু এখানে এ থেকে অন্তরের আমল বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ 'তাসদীক' (বিশ্বাস করা)। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে বিশ্বাস করবে না, 'সে যে কাফির' তাতে কোন বিতর্ক নেই। এছাড়া জিনস এর উপর مَا - মা হাম্ল হওয়ার জন্য আম নফী অর্থাৎ ব্যাপক না বোধক উদ্দেশ্য হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের কোন একটি অনুযায়ী ফয়সালা করবে না, সে অবিশ্বাস করেই এমন কাজ করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ ব্যক্তি কাফির হওয়ায় কোন বিবাদ নেই।

এই আয়াতে যে সত্য সম্পর্কে কারো কোন বিতর্ক নেই, আর এটাই সমর্থনপুষ্ট এবং প্রাপ্ত অভিমত, তা হচ্ছে- নিশ্চয় আয়াতটি আহলে কিতাব ও অন্যান্যদের জন্য আম। ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সকলকেই গণ্য করবে যে শাসক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফয়সালা করবে, সে কাফির, এক্ষেত্রে তার উক্ত কুফরী তাকে মিল্লাত হতে বহিস্কার করবে।

(কালিমাতু হাক্ব, ৪৭পৃঃ)

অতঃপর তিনি বলেন, যখন তুমি উক্ত সংজ্ঞা সম্পর্কে চিন্তা করলে তখন তুমি জানতে পারলে যে, শরীয়াত বিরোধী আইন দ্বারা ফয়সালা করা হচ্ছে ত্বাগুত, এবং নিশ্চয় আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফয়সালাকারী শাসক ত্বাগুত। কেননা সে মানব রচিত বিধান দ্বারা ফয়সালা করেছে, কিতাব ও সুন্নাহ হতে যার কোন সূত্র নেই। যে ব্যক্তি কোন মানুষকে প্রভুত্বের বৈশিষ্ট দান করে তার কোন ইসলাম এবং কোন্ ঈমান বাকী থাকতে পারে? যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ফয়সালার অবাধ্য হয়, তার ইসলাম কিরূপে বিশুদ্ধ হবে? (মূল গ্রন্থ, ৬৬পৃঃ)

শাইখ, মুজাহিদ, যিনি এই উম্মাতের মাঝে জিহাদের রূহ নবায়ন করেছেন, ডঃ শহীদ, (আমরা এমনটি ধারণা করি) আবদুল্লাহ আয্যাম (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত আইন প্রণয়ন করে তারা কাফির যদিও তারা ছালাত আদায় করে, রোযা রাখে এবং দ্বীনের অন্যান্য বিধান বাস্তবায়ন করে। যে আইন দ্বারা বিভিন্ন বিষয়, রক্ত সম্পর্কীয় ও মাল-সম্পদ সম্পর্কে বিচার করা হয় সেটা কুফর ও ঈমান অনুসারে শাসকের অভিলাস নির্ধারণ করেছে।

(মাফহুম আল হাকিমি'য়া ফী ফিকরিশ শহীদ আয্যাম, ৩পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, অন্তরের সন্তুষ্টির সাথে মানব রচিত আইনের আনুগত্য করা শির্ক, যা তাকে মিল্লাত হতে বের করে দেয়।

(পূর্বের গ্রন্থ, ৪পৃঃ)

তিনি বলেন, ইবাদত হচ্ছে- আইন-কানুন, বিধান, হালাল করা ও হারাম করা। অতএব, যদি উক্ত আইন-কানুন ও বিধান আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর ইবাদত করা হল। আর যদি এ সকল আইন–কানূন মানুষের পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে মানুষের দাসত্ব করা হলো, যদিও লোকেরা ছালাত আদায় করে, রোযা রাখে এবং ইসলামের অন্যান্য বিধান বাস্তবায়ন করে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এমন সুদৃঢ় বিষয়, যাতে কোন সন্দেহ, অস্পষ্টতা ও দ্বিধা-দ্বন্দের কোন অবকাশ নেই। সকল ফক্বীহ, এই বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন যে- "যে ব্যক্তি কোন হারামকে হালাল করল, সে কাফির হয়ে গেল এবং যে ব্যক্তি কোন হালালকে হারাম করল, সে কাফির হয়ে গেল।" "আর মানব রচিত আইন হালাল করণ, হারাম করণ, বৈধ করণ ও নিষেধ করণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।" (পূর্বের গ্রন্থ, ১০ পৃঃ)

তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি মানব রচিত আইনের কোন একটি এজন্যই প্রণয়ন করে এবং ওটা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে এজন্যই দাঁড় করায় যে, তার মাথায় এই আইন সম্পর্কে এ চিন্তা হয়, বর্তমান সময়ে এই আইন আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম। এটা স্পষ্ট কুফ্রী, এই উম্মতের কোন ব্যক্তিই এবিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

এখানে কোন পার্থক্য নেই ঐ ব্যক্তির মধ্যে যে বলে, নিশ্চয় ফজরের ছালাত তিন রাকআত এবং ঐ ব্যক্তির মাঝে যে বলে, হত্যাকারীর ফয়সালা এক বছরের জেল। এবং ঐ ব্যক্তির মাঝেও যে বলে, যিনাকারীর শাস্তি ছয় মাস জেল এবং ঐ বক্তির মাঝে যে বলে, রমযান মাসের রোযা লোকদের উপর হারাম। (পূর্বের গ্রন্থ, ১৪, ১৫ পৃঃ)

শাইখ, আবদুল হামীদ, কিশ্ক্ (রহঃ)ঃ

শরীয়তের আইন বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব, এটা স্পষ্ট করে বলার জন্য শাসক অথবা আমীর এর সাথে সাক্ষাৎ করা ওয়াজিব, এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, শরীয়তের আইন বাস্তবয়ন করার বিষয়টি কারো নিকট গোপন রয়েছে কি, যে তার সাথে সাক্ষাত করতে হবে?

(আল–ফাতওয়া, ৫ম খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

তিনি তার কোন কোন খুতবায় আরব রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের মাসজিদে হারামে প্রবেশ করতে দোষারোপ করেছেন।

তিনি অত্র আয়াত দ্বারা এর প্রমাণ দিয়েছেনঃ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

অর্থঃ মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকট না আসে। (সূরা তাওবাহ্ ২৮)

শাইখ, ছলাহ্ আবু ইসমাইল (রহঃ)ঃ

তিনি মিসর-এর মানব রচিত আইন এর আদালতের সামনে স্পষ্ট ভাষায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব প্রসঙ্গে বলেনঃ পূর্বের ও পরের ফক্বীহগণ এ বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন যে– ইমামত অর্থাৎ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কোন কাফির- এর জন্যে অনুষ্ঠিত হবে না। এবং তদ্রূপ তারা এ বিষয়েও ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে- যদি রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ হতে কুফ্র প্রকাশ পায়, তবে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব এবং লোকেরা তার বায়আত ভেঙ্গে ফেলবে।

("কালিমাতু হাক্ব" শাইখ, ডঃ উমার আবদুর রহমান প্রণীত, ৩৮ পৃঃ হতে সংগৃহীত)

শাইখ, হামূদ আত-তুওয়াইজিরী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় পাপ এবং সবচেয়ে খারাপ পরিণাম যাতে অধিকাংশ লোক লিপ্ত। অর্থাৎ শরীয়তের আইনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং এর বিনিময়ে ত্বাগুত এর আইন গ্রহণ করা। অর্থাৎ আইন–কানুন, ইউরোপীয় বিধানের অনুরূপ সংবিধান যার প্রত্যেকটি শারীয়াতে মুহাম্মাদীর বিরোধী।

অতঃপর তিনি কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করে বলেন, মানুষের মধ্যে কিছু আগাছা জাতীয় লোক, উক্ত সাদৃশ্য- এর দরূণ পূর্ণরূপে বা তার চেয়েও বেশী দ্বীন হতে দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা দ্বীন হতে পূর্ণরূপে মুরতাদ হওয়ার পর্যায়ে এবং বের হওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে- লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আযীম!

শারীয়াতে মুহাম্মাদী ব্যতীত অন্যের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া দূরবর্তী পথভ্রষ্ট্রতা এবং সবচেয়ে বড় মুনাফিকী। বর্তমান যুগে শরীয়তে মুহাম্মাদী- এর আইন-কানুন পরিহারকারী অধিকাংশ ত্বাগুত নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ততার দাবি করলেও তারা ইসলাম হতে দূরে অবস্থান করছে।

(আল-ঈযাহ্ ওয়াত তাবয়ীন লিমা ওয়াকায়া ফীহিল আকসারুল মিন মুশাব্বাহাতিল মুশরিকীন, ২৮, ২৯ পৃঃ)

শাইখ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আল জাবরীণ (হাঃ)

(তিনি এমন একজন মহান ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা সঊদী বড় আলিমদের সংগঠন-এর সদস্যপদ হতে ইদানীং পৃথক হওয়ার সম্মান দান করেছেন। কেননা তিনি আলে সঊদ-এর কাফির শাসকদের সামনে সুদৃঢ় পাহাড়ের মত অটল ছিলেন এবং তিনি তার দ্বীন অনুযায়ী তাদের সাথে নরম নরম কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে দৃঢ় রাখুন।)

তিনি বলেন, নিশ্চয় আইন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনিই বিভিন্ন আইন প্রনয়ন করেন। তিনিই বিভিন্ন বিধান চালু করেন এবং একমাত্র তিনিই এসকল আইন আমল করার জন্য স্বীয় বান্দাদের প্রতি বাধ্য করেছেন। এটা জানা কথা যে. নিশ্চয় আল্লাহর শরীয়ত পরিপূর্ণ। আবারো পূর্ণ করা এবং পরিবর্তন করার অবকাশ নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

অর্থঃ আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদাহ্ ৩)

অনত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

অর্থঃ আমি এই কিতাবে কোন কিছু বর্ণনা করতে ছেড়ে দেইনি। (সূরা আনআম, ৩৮)

উল্লেখ্য যে, এটা জানা কথা যে, মানব রচিত আইন, যাতে শারীয়তের বিরোধিতা রয়েছে, যে ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করবে, তদনুযায়ী আমল করবে, সে মিল্লাত হতে বের হয়ে যাবে, শরীয়াত ছুঁড়ে মারবে এবং জাহেলিয়াতের বিধান দ্বারা ফয়সালা করবে।

অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থঃ তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? (সূরা মায়িদাহ ৫০)

সুতরাং আল্লাহর আইন, সর্বোত্তম আইন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান। এটা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। যখন ইসলাম কোন ইবাদত ওয়াজিব করে দেবে, তখন ওটা পরিবর্তনের অধিকার কারো নেই, সে যে কেউ হোক না কেন, প্রেসিডেন্ট হোক, মন্ত্রী হোক, বাদশা হোক অথবা নেতা হোক কারো কোন অধিকার নেই।

অতএব, যখন আল্লাহ কোন বিষয়ে ফয়সালা দেবেন, তখন আল্লাহর ফয়সালা অতিক্রম করার কারো অধিকার নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা কাফির। (সূরা মায়িদাহ, ৪৪) (হুকমুদ্ দুখুল ফী মাজালিস আন-নিয়াবিয়া)

শাইখ, সাঈদ হাবী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, আমরা বর্তমানে ইসলামী ভূখণ্ডে যে সকল আইন-কানুন এর মুখোমুখী হচ্ছি, অনুরূপ কিছু কিছু অবস্থা ইসলামী ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন তাতারগণ তারা চেঙ্গীস খান এর আইন- এর রক্ষণাবেক্ষণ করত, এর নাম "আল ইয়াসিক" বা "আল ইয়াসা" ছিল। তাদের ইসলামে প্রবেশ এবং উক্ত আইন অনুসারে বিচার করার জন্য আলিমগণ তাদেরকে কাফির ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন এবং সাধ্যানুযায়ী তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলে ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন। উক্ত ফাত্ওয়া অনুযায়ী যে সংবিধান ইসলামের বিপরীত তৈরী করা হয়েছে, অথবা ইসলামের বিপরীত আইন বা পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করছে, কিংবা পূর্ণ ইসলাম বা তার কিছু অংশ নষ্ট করেছে তাদের কাফির ফাতওয়া প্রদান করতে আমরা দ্বিধা করব না।

(দুরূস ফিল আমালিল ইসলামী, ৮৬, ৮৭ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে ইসলামের অধিকাংশ স্থানে (বরং প্রত্যেক স্থানে) কাফির, মুরতাদ, নাস্তিক, ধর্মহীন, মুনাফিক, ফাসিদ, গোলযোগ সৃষ্টিকারীগণ, ব্যক্তির আকৃতিতে আথবা সংগঠনের আকারে, কিংবা সংস্থার আকারে কিংবা দলীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। অতঃপর ইসলামী ভূখণ্ডে পথভ্রষ্ট, কাফির দলের বিস্তার ঘটেছে। এবং (প্রকাশ্য) ও গোপন অনেক সংগঠন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। বাতিন (গুপ্ত দল), নাস্তিক ও ধর্মহীনদের অস্তিত্ব মজবূত হয়েছে এবং খ্রীষ্টানগণ তাদের প্রতিশ্রুত ওয়াদা ভেঙ্গে ফেলেছে। আর মুসলিম বিশ্বের ভূখণ্ড সমূহে কাফির মিশ্রিত প্রশাসন গঠিত হয়েছে। এসকল প্রশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ যোগান দিয়ে এমন কিছু ব্যক্তি সাহায্য করছে, যারা গোলযোগ সৃষ্টিতে লিপ্ত, লোকদের মধ্যে প্রকাশ্যে যারা পাপ ও কবিরা গুনাহ করছে, এতে তারা জেদ করছে এবং ওটা বৈধ মনে করছে। আর খিলাফত ও নেতৃত্ব হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে।

এসকল কারণে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব-হচ্ছে প্রত্যেক স্থানে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা যা দ্বারা কাফিরদের উপর কঠোরতা আরোপ করে তাদের মূলোৎপাটন করা যায়।

("জুন্দুল্লাহ ছাক্বাফাহ্ ওয়া আখলাকা" বাবুশ- শিদ্দাতি আলাল–কাফিরীন)

শাইখ, মান্না'খালীল আল ক্বাত্তান (রহঃ)ঃ

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থঃ আমি মানব ও দানব কে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত, ৫৬)

ইসলামী শরীয়াতের উদ্দেশ্য- আল্লাহ আয্যা ও জাল্লা- এর আইন বিশ্বাস করে এবং তদনুযায়ী চলার মাধ্যমে তাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আনুগত্যের মাধ্যমে এই অবাধ্য কুফরী হতে লোকদেরকে এক আল্লাহ- এর দিকে ফিরিয়ে দেয়া। এভাবেই তাওহীদ- এর অর্থ বাস্তবায়িত হবে। যে ব্যক্তি ইসলামের দাবি করে, অথচ তাদের স্বাধীন ক্রিয়াকর্মে এবং জীবনের ইচ্ছাধীন বিষয়াদিতে মানব রচিত আইন- এর কাছে নতি স্বীকার করে, আল্লাহ্- এর পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য করে, তবে সে মানুষের ফিত্বরাত হতে বিপরীত দিকে চলে গেল, যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং এর দিকে হেদায়াত এর জন্য আমাদের রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না সৃষ্টি জগৎ খালিস আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

শরীয়াতকে বিচারক মান্য করে, মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়াদিতে আল্লাহর নিকট নতি স্বীকার করা আবশ্যক। যেমন সকল সৃষ্টি জগৎ অধীন হয়ে আল্লাহর নিকট নতি স্বীকার করেছে, এমনিভাবে সৃষ্টি জগৎ- এর প্রত্যেকটিতে পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়। কুরআনে কারীমে উক্ত কথার দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

অর্থঃ তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হয়েছে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (সূরা আল-ইমরান, ৮৩)

অতএব, আক্বীদাহ, ইবাদত, আমল ও বিধান- এর ক্ষেত্রে কিরূপে এই বিভক্তি হলো? অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা।
(সূরা ইউসুফ, ৪০)

শরীয়াতে ইসলামের ফয়সালা অনুযায়ী আমল করা ঈমানের একটি রুক্ন এবং আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লাহ- এর তাওহীদের অন্যতম দাবী। রসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় কোন মু'মিনের এ অধিকার ছিল না যে, সে ঈমানের দাবী করবে অথচ তারা তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বিচারের জন্য যাবে না, ইবাদত সম্পর্কীয় হোক বা পারস্পারিক লেনদেন সম্পর্কীয় হোক। কেননা প্রতিটি বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সালিস মান্যকরা এবং তাঁর ফয়সালা মেনে নেয়া এবং সন্তুষ্ট থাকাই হচ্ছে ঈমানের অন্তস্থল। এবং তাঁর (সাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর শরীয়াতকে সালিস মানার মাধ্যমেই এটা অর্জিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থঃ তোমার রবের শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না- যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক না করে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করে। (সূরা নিসা, ৬৫)

নাফী দ্বারা তাকীদকৃত কসম- এর হাকীকত এইঃ যখন জওয়াবের কসম নাফী হবে, এমতাবস্থায় لا 'লা' নাফীয়াহ কসম এর উপর প্রবেশ করলে জওয়াব এর নাফীকে তা'কীদ করবে। এখানে জওয়াব হচ্ছে- ঈমান- এর নাফী (لَا يُؤْمِنُونَ) যেমন সামনের বর্ণনায় রয়েছে- প্রত্যেক বিবাদকে সামিল করছে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার বাণী (فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) এর মধ্যে مَا 'মা' আম অর্থ বুঝাচ্ছে। অতএব যে কোন বিষয় হোক না কেন, তার প্রত্যেক বিবাদ ও বিরোধকে শামিল করবে। حَرَج হারায (দ্বিধা না পাওয়ার শর্ত- এর দ্বারা নিশ্চিত সন্তুষ্ট এর তাকীদ করা হয়েছে, যেমন অন্তরের কেন্দ্রস্থল হতে বিচার নিয়ে যাওয়া হয়- {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ}

-তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে) এবং শরীয়াতের ফয়সালার নিকট প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় আত্মসমর্পণ করা ওয়াজিব। تَسْلِيم -'তাসলীম' দ্বারা মাসদারী অর্থের তাকীদ করা হয়েছে- যেমন তাঁর বাণী {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ওটা শান্তভাবে গ্রহণ না করে} অতএব, কোন বান্দার ঈমান সঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট হতে ওটা প্রকাশ না পাবে।

এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করার জন্যই ইসলামী আইনকে সালিস মানতে হবে। এ স্থলে অবস্থান করাই মু'মিনদের পথ। কেননা ওটা তাদের দ্বীন। রসূল (সাঃ)- এর রিসালাত এর উপর অকাট্য প্রমান প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁর (সাঃ)- এর আনীত বিধানের বিরোধীতা করা, মু'মিনদের পথ ও তারা দ্বীনে ইসলামের আহকাম এর মধ্য হতে যা আমল করছে এর বিপরীত রাস্তায় চলা, এটা তো পথভ্রষ্টতার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং দ্বীন হতে বের হয়ে যাওয়ার সামিল। যার আমলকারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এক্ষেত্রে বিরোধিতা, অবাধ্যতাবশত হোক, অহংকারবশত বা অমান্য অথবা অস্বীকারবশত হোক কোন পার্থক্য নেই,- যতক্ষণ পর্যন্ত ওটা এমন বিষয় হবে যাতে গবেষণা করার কোন অবকাশ নেই। কেননা, বিরুদ্ধাচারণ এর মূল অর্থ- তোমার বন্ধু যেদিকে রয়েছে, তুমি এর বিপরীত দিকে রয়েছ।

আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতের অর্থঃ

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থঃ যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মু'মিনের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল। (সূরা নিসা, ১১৫)

ওটা এ জন্য যে, আইন রচনা করা প্রভুত্বের বৈশিষ্ট সমূহের একটি বড় বৈশিষ্ট। অতএব কোন ব্যক্তি বা কোন দলের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার স্বীকার করা হচ্ছে- আল্লাহর সাথে শিরক করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। (সূরা নিসা, ১১৬)

(ওয়াজূবু তাহ্কীম্ আশ-শারীয়াতিল ইসলামি'য়া, ৬০-৬৩পৃঃ)

শাইখ, ডঃ আবদুল কারীম যায়দানঃ

তিনি বলেন, যখন এই জাতি রাষ্ট্রের গোলযোগ সৃষ্টিকারী শাসকদের আনুগত্য করেছে, তাদের বাতিল নির্দেশনার প্রতি নতি স্বীকার করেছে এবং ইসলামী আইন এর বিপরীত তার রীতি-নীতির অনুসরণ করেছে, অতএব তারা শাস্তির যোগ্য। তাদের কোন ওযর গ্রহণ হবে না এবং তাদের হতে দায়মুক্তিও কোন কাজে আসবে না। আনুগত্যের সীমারেখার প্রতি লক্ষ রেখে, ইসলামী আইনের বিরোধী, বিপদগামী কোন যালিম এর ফয়সালার কাছে নতি স্বীকার করা এবং আনুগত্য করা মুসলিম উম্মাহর- এর জন্য সম্ভব নয়। কেননা সে আল্লাহর সামনে উক্ত হারাম আনুগত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

(আল-ফারদ্ ওয়াদ্ দাওলাহ্, ৯৬, ৯৭পৃঃ)

শাইখ, আবদুল্লাহ আল-ক্বারনীঃ

তিনি বলেন, আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে- যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফয়সালা করা বৈধ মনে করে, অথচ সে এ বিষয়ে অবগত (অর্থাৎ অকাট্য প্রমাণ এর ভিত্তিতে এবং অভিজ্ঞ আলিমদের বর্ণনার দ্বারা সে এটা জেনেছে-) কিন্তু সে এটা বাধ্যতামূলক গ্রহণ করেনি, সে ব্যক্তি এটা হালাল মনে করে এবং ইসলাম হতে বের হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। যদিও সে এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে।

(যাওয়াবিত-আত-তাকফীর, ১২৮পৃঃ)

শাইখ, উমার আশকার হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেন, আবূ উবাইদ কাসিম ইবনে সালাম এর উক্তি- "আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীত ফয়সালা করা, এমন কুফ্র নয় যা তাকে মিল্লাত হতে বের করে দয়া। সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য- বিচারক বা মুসলিম শাসকের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি দ্বারা ফয়সালা করা, অথবা তিনি অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী বিচার করেন।

পক্ষান্তরে এ সকল লোক, যারা আমাদের নিকট কুফ্রী আইন আনয়ন করেছে এবং অস্ত্রের জোরে ইসলামী ভুখণ্ডে প্রয়োগ করেছে, আর যারা ইসলাম প্রয়োগের জন্য আহ্বান করে তাদের প্রত্যেককে শাস্তি দেয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে- এ সকল লোকদের ইসলামে কোন অংশ নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থঃ তোমার রবের শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না- যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক না করে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করে।

(সূরা নিসা, ৬৫) (আল-আক্বীদাহ ফিল্লাহ,২৮-২৯পৃঃ)

শাইখ, আবদুল কাদির ইবনে আবদুল আযীয (হাঃ)

যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তাকে কাফির আখ্যায়িত করার বিষয়ে আলিমদের ফাত্ওয়া ধারাবাহিকভাবে আনয়নের পর বলেনঃ .... উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ এই, মানব রচিত আইনে ফয়সালাকারী শাসকবর্গ 'কাফির' এ কথায় আলিমগণ একমত। অনেক 'নাস' এর সমর্থন যোগাচ্ছে। এ ছাড়া তাদের কাফির হওয়া প্রসঙ্গে ইজমা হওয়ার বিষয় তো রয়েছেই। এ বিষয়ে দুই শ্রেণীর লোকই শুধু বিরোধীতা করে (ক) জাহিল (খ) প্রবৃত্তির অনুসারী । যদিও সে আলিম বলে পরিচিত হয়। (আল-জামি'ফী ত্বালাবিল ইলমিশ শরীফ, ৮৯৮পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, মোটকথা, মানব রচিত আইন অনুসারে ফয়সালা করা, 'যা বর্তমানে করা হচ্ছে' তিনটি কুফরি কারণে হয়ে থাকে।

১. আল্লাহর নাযিলকৃত ফয়সালা প্রত্যাখান করা। কেননা, কোন বিষয়ে মানব রচিত আইন অনুসারে ফয়সালা করা, উক্ত বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত ফয়সালা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে।

২. আল্লাহর আইন- এর বিপরীত আইন প্রনয়ন করা। এটাই মূলত মানব রচিত আইন।

৩. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা। অর্থাৎ, আল্লাহর আইন বিরোধী এই আইন দ্বারা বিচার করা।

উক্ত 'কুফ্রী কারণ' সমূহের কোন একটিও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর যুগে ছিলনা। (মৃত্যু ৬৮ হিজরী) এবং তারপর কয়েক যুগেও ছিলনা অবশেষে কিছু কিছু বিষয়ে কৌশল বা তা'বীল দ্বারা শাসক ও বিচারকের ফয়সালা করতে গিয়ে যুলুম প্রকাশ পায়। এতদসত্ত্বেও ফয়সালার ক্ষেত্রে পাপের কাজ করা কষ্টকর ছিল। যদিও সে ধর্মমতে পাপী হবে।

(আল-জামি'ফী ত্বালাবিল ইলমিশ শরীফ, ২য় খণ্ড, ৮৭৮, ৮৭৯ পৃঃ)

শাইখ, ডঃ আব্দুল আযীয আব্দুল লতীফ হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

হে মুসলমানগণ, যে সত্ত্বা আইন প্রণয়ন এর অধিকার রাখেন, যিনি হালাল ও হারাম করার মালিক তার গুনাবলী সম্পর্কে এবং জাহেল, তূচ্ছ, ঘৃণ্য কাফির- এর প্রণীত আইন গ্রহণ করা সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করুন! যেমন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা, মুহাম্মাদ (সাঃ)- কে রসূল ও নবী হওয়াতে সন্তুষ্ট থাকা, সত্যে পরিনত করে আল্লাহর আইনকে সালিস মানা এবং দুই ওয়াহী- এর নিকট বিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে যাওয়া ঈমানের শর্ত..... এবং যখন আল্লাহর আইন এর কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া ঈমানের শর্ত।

কেননা এই শরীয়াত ব্যতীত অন্যের নিকট বিচার নিয়ে যাওয়া "তা হচ্ছে ত্বাগুত এবং জাহেলিয়াত এর ফয়সালা" তা ঈমান বিরোধী কাজ এবং এটা মুনাফিকের আলামত....। এতে কোন সন্দেহ নেই- শরীয়াতকে সালিস মানার অর্থ, আল্লাহ তায়ালার দ্বীন- এর নিকট আত্মসমপর্ণ ও নতি স্বীকার করা। যখন বিষয়টি এরূপ, তখন নিশ্চয় শরীয়াতকে বিচারক না মানলে তা অস্বীকার করা হলো এবং ধর্ম ত্যাগ করা হলো। যদিও সে ঐগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে। অতএব 'কুফ্র' মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মধ্যেই শুধু নির্দিষ্ট নয়, যেমন মুর্জিয়াগণ মনে করে.....।

যে ব্যক্তি মুসলমানদের ঘটনাবলী নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি দেখতে পারবেন ইসলামী দেশ সমূহে কত বিপদ, কত মসীবত, দলাদলী এবং নিজেদের মধ্যে দুশমনী সংঘটিত হচ্ছে, তদ্রূপ পরস্পর যুদ্ধ ও খুনাখুনি হচ্ছে, অনুরূপ ইসলামী দেশ সমূহে সম্পদের প্রাচুর্য ও অধিক্য হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও অভাব, অনটন লেগেই আছে, এছাড়া আরো অনেক বড় বড় সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর একটি মাত্র কারণ, তা হচ্ছে- "আল্লাহর আইনকে অপসরণ করা এবং ত্বাগুত- এর নিকট বিচার নিয়ে যাওয়া।" আল্লাহর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

("নাওয়াকিযুল ঈমান আল ক্বাওলি'য়া ওয়াল আমালিয়া" বাবু আল হুক্ম বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ তায়ালা, ৩০১-৩১০পৃঃ)

শায়খ, ডঃ মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল ক্বাহ্ত্বানী (হাঃ)

তিনি বলেন, নিশ্চয় জীবন চলার পথ হতে আল্লাহর শরীয়াতকে অপসারণ করা এবং মানুষের অক্ষম আইন-কানুন আমদানী করা, এটা নতুন ধর্মত্যাগ করা, যা মুসলমানদের জীবন যাত্রার শেষ শতাব্দীতে প্রকাশ পেয়েছে। নিশ্চয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপী আল্লাহর আইন দ্বারা ছায়া বিস্তার করে ছিল এবং 'শরীয়াত' শাসক ও প্রজা সকলকেই শাসন করেছে.....।

কোরআনে কারিমে এবং সুন্নাতে মুতাহ্হারায় ফয়সালা বিষয়ে অনেক স্পষ্ট ও অকাট্য দলীল এসেছে। আর এটাই হচ্ছে- মুসলমানদের আক্বীদা এবং দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না তারা কাফির ।

(সূরা আল-মায়িদা ৪৪ নং আয়াত)(আল ওয়ালা ওয়াল বারা 'ফিল ইসলাম ৭৮ পৃঃ)

শাইখ, আব্দুল মাজিদ আশ-শাযলী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেন, বৈধ বা অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, মানব রচিত আইন প্রণয়নকারী মদ পান করতে বলে না, অথবা মদ হালাল বলে না। বরং ওটা সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বীন অনুসারে বলে। সে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করে। আর সে রাষ্ট্রের আইন প্রণেতা। তার দৃষ্টিতে দ্বীন হচ্ছে- বান্দা ও রবের মধ্যে সম্পর্ক। অতএব, উক্ত বিষয়ে আনুগত্য করতে কার্যত তার কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই এবং সে তা হালাল করতে চায় না। সে তো উক্ত হালাল বিষয়কে সম্মান করে এবং এটা চর্চা করার অধিকারও স্বীকার করে।

(হাদ্দুল ইসলাম ওয়া হাকীকাতুল ঈমান, ইমতাউন নায্র ফী কাশ্ফি শুবহাতি মুর্জিয়াতিল আসর; শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি প্রণীত গ্রন্থ ৫২ পৃঃ)

শাইখ, ডঃ সাফ্র আল হাওয়ালী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি এটাকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষবাদ- এর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন, নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষবাদ অর্থাৎ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফয়সালা করা, এটা দ্বীন বিরোধী বিধানের উপর জীবনকে দাঁড় করানোকে বলে। এজন্য এটাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাহেলী ব্যাবস্থাপনা গ্রহন করা, যার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির ইসলামে কোন স্থান নেই বরং সে কুরআনের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কাফির।

আল্লাহ বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করে না তারা কাফির। (সূরা মায়িদা, ৪৪)

তিনি অন্যত্র বলেন, নিশ্চয় অনেক আয়াত এবং এর মতো অনেক প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। বরং উক্ত বিষয়টি কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয়। এছাড়া উক্ত বিষয়ে আলিমদের অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে- যে ব্যক্তি মানবজীবনের কোন একটি সমস্যায় আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের ফয়সালা তালাশ করবে তার ঈমান শূণ্য হওয়া সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ হয়ে যায়। তার ক্ষেত্রে ফয়সালা হচ্ছে- সে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও জাহেল; এর প্রত্যেকটি সমান সমান।

বরং আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

অর্থঃ যদি তোমরা তাদের আনুগত্যকর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।

(সূরা আনআম ১২১)

অত্র আয়াতে একটি শাখা বিষয়ে, অর্থাৎ যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা ভক্ষণ করা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার অনুসারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং এর পরেও কি সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দের কোন অবকাশ রয়েছে? (আল–আলমানিয়া ৬৮৬ পৃঃ)

শাইখ, সালমান আল আওদাহ হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি দীর্ঘজীবী হউন! তিনি বলেন, কিছু দল স্পষ্ট ও খোলাখুলি কুফ্রী-এর উপর একত্রিত হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন, জাতীসংঘের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী দল সমূহ। তারা ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার করছে এবং আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে আইন প্রণয়নের অধীকার ও কর্তৃত্ব প্রদান করছে। (সিফাতুল গুরাবা, ৬৪ পৃঃ)

শাইখ, আবূ উরওয়া আল-মাগরিবীঃ

তিনি শাইখ আবদুল করীম শাজ্লী প্রণীত “তা‘সীসুন নয্র ফী রদ্দি-শুবহি মাশায়িখি মুর্জিয়াতিল আসর”- এর ভুমিকায় বলেনঃ মুসলমানদের আমীর যখন যুলুম করবে অথবা ফাসিক হবে, তখন তো ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কিন্তু যারা তাদের মধ্যে মুরতাদ হয়ে যাবে, তখন তদের ক্ষমতাচ্যুৎ করা, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। যেমন মুসলমানদের উপর জবর দখলকারী কাফির। সে ইয়াহুদী হোক কিংবা মুরতাদ শাসক হোক, পার্থক্য করার কোন কারণ নেই।

(‘সিফাতুল গুরাবা’- এর ভুমিকা, ৬,৭ পৃঃ)

উসতাদ, আবদুর রহমান হাসানঃ

তিনি “ফাসলুদ্ দ্বীন আনিদ্ দাওলাহ” এই শিরোনামে উল্লেখ করেছেনঃ এর দিকে আহ্বানকারীর নিকট এর অর্থ- নিশ্চয় দ্বীন মানুষের ক্রিয়াকাণ্ড সহজ করার জন্য। এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক নেই। এটা শুধুমাত্র ইবাদত সংক্রান্ত আইন-কানুন- এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনুষের বাস্তব জীবনে এর দ্বারা আমল করা যাবে না এবং প্রয়োগ করাও যাবে না। উক্ত শয়তানী চিন্তাধারা, যা আজ-কাল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামে পরিচিত। যে ব্যক্তি এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তদনুযায়ী আমল করবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর জাহেলী আইন দ্বারা ফয়সালা করাকে সৃষ্টিজগৎ- এর রব এর আইন- এর উপর প্রাধাণ্য দেবে, ইমাম ও আলিমগণ অকাট্য দলীল দ্বারা তাকে কাফির বলেছেন। কেননা ওটা ঈমান বিরোধী এবং তাওহীদ এর বাণীর বিপরীত।

(“আল-কায্যাফী মুসাইলামাতুল আসর” ৩২ পৃঃ)

শাইখ, শহীদ (আমাদের ধারণা মতে) মারওয়ান হাদীদ (রহঃ)

তিনি মুসলিম আলিমদের বিশেষভাবে এবং মুসলিম জাতিকে সাধারণভাবে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

অর্থঃ তোমাদের জন্যে ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; যারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্যে, যদি না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আন। (সূরা মুমতাহিনাহ্, ৪)

হে আলিমগণ! এই আয়াত দ্বারা কাদের সম্বোধন করা হয়েছে? এটা কি মুসলমানদের সম্বোধন করছে না? আপনারা কি আপনাদের শাসকদের সাথে এটা বাস্তবায়ন করছেন? নাকি তাদের সাথে একত্রে বসবাস করছেন এবং তাদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করছেন না? শাসকগণ কিতাবুল্লাহ ও তাঁর নবীর সুন্নাত অনুসারে ফয়সালা করছেন কি? যখন তারা আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করছেনা এবং যখন তারা তাদের বিশেষ ও সাধারণ ক্ষেত্রে এবং যে আইন দ্বারা তারা দেশে ফয়সালা করছে আল্লাহর কিতাব থেকে সংবিধান গ্রহণ করছে না এমতাবস্থায় তারা কাফির কি না? হে মুসলমানদের আলিমগণ ইল্ম দ্বারা আমাকে ফাত্ওয়া প্রদান করুন!

(শাইখ, শহীদ এর বক্তব্য হতে, ৫, ৬পৃঃ আনোয়ার শা‘বান (রহঃ) প্রচার করেছিলেন)

উসতাদ্ আবু আবদুর রহমান আস্ সাবীয়ীঃ

তিনি বলেন, আমরা বলছিঃ বরং সে (শরীয়ত পরিবর্তন কারী শাসক) সব চেয়ে বড় কাফির, যে তার কাফির হওয়াতে সন্দেহ পোষণ করবে। সে তো এ অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছে। বিষয়টি এরূপ যেমন 'শানক্বীত্বী' আযওয়াউল বায়ান ৪র্থ খণ্ড, ৮৪পৃষ্টাতে উল্লেখ করেছেনঃ "তারা কাফির ও মুশরিক। এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ করে না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছেন এবং যাকে ওয়াহীর নূর হতে অন্ধকারে রেখেছেন, তার কথা ভিন্ন।" (বারায়াতু আহলিস সুন্নাহ, ২৬পৃঃ)

শাইখ, আবদুল আযীয় আলি মুহাম্মদ আস সুলাইমানীঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর ফয়সালার বিপরীত প্রত্যেক ফয়সালা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত এবং যে শাসক আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর বিধান দ্বারা ফয়সালা করে না সে ত্বাগুত ও আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

(মাওয়ারিদ আয্-যামআন ১ম খণ্ড, ৪৩পৃঃ)

শাইখ, হাসান আইয়ূব (রহঃ)ঃ

তিনি তার গ্রন্থ "আস-সুলুকুল ইজতিমায়ী"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর আইনকে অস্বীকার করবে, তাতে বাধা প্রদান করবে এবং মুসলমানদের জীবনে এর দ্বারা ফয়সালা করতে অসন্তোষ প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তি মুসলমানদের ইজমা অনুযায়ী কাফির। যদিও সে রোযা রাখে, সলাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং হাজার বার বাইতুল্লায় হজ্ব করে।"

শাইখ, সুলাইমান ইবনে সাহ্মান হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি ত্বাগুত- এর সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন, মোট কথা ত্বাগুত তিন প্রকার, (১) বিধান-এর ক্ষেত্রে ত্বাগুত, (২) ইবাদত-এর ক্ষেত্রে ত্বাগুত, ও (৩) আনুগত্য ও অনুসরণ-এর ক্ষেত্রে ত্বাগুত। আর হুবহু এই ত্বাগুত (অর্থাৎ বিধান-এর ক্ষেত্রে ত্বাগুত) হতে আল্লাহ তায়ালা দুরে থাকতে বলেছেন।

(আদ্ দুরারুস সুন্নিয়াহ্, ৮ম খণ্ড, ২৭২পৃঃ)

শাইখ, মুহাম্মাদ সারুর যাইনুল আবিদ্বীনঃ

তিনি বলেন, নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর নামে ইসলামী দেশসমূহে সমসাময়িক যে পদ্ধতি তাদের সংবিধানে, তাদের আইন-কানুনে, তাদের স্বাধীন অনুষ্ঠানে এবং এর প্রত্যেক বিষয়ের ফয়সালাতে বিদ্যমান রয়েছে এবং এটা রক্ষা করতে তারা তাদের বিবৃতিতে অস্বীকার করে না।

যেমন তাদের বক্তব্য-"ধর্মে কোন রাজনীতি নেই এবং রাজনীতিতে কোন ধর্ম নেই।" এবং তারা ধর্মের ভিত্তিতে কোন দল গঠনের অনুমতি প্রদান করতে বাধা দেয়। আমরা কি বর্তমানে এমন কুফরী দেখতে পাচ্ছিনা- যে সম্পর্কে আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীল রয়েছে?

(আল উলামা ওয়া আমানাতুল কালিমাহ্, ১০৫-১০৮পৃঃ)

শাইখ, আবদুর রহীম আত-ত্বাহ্হান হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেন, নিশ্চয় যারা রাজনীতি হতে ধর্মকে পৃথক করে, তারা এর মাধ্যমে ধর্ম হতে রাষ্ট্রকে মুক্ত করতে চাচ্ছে। তারা বলে, ঐ কাফির শাসক যে আল হাইয়ু ওয়াল কাইয়ুম এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না মুসলমানদের বিচার করতে তাদের কোন অন্তরায় নেই। কেননা দ্বীন হচ্ছে তাদের মধ্যে ও তাদের রবের মাঝে সম্পর্কের বিষয়। তারা তদের জীবন চলার অন্যান্য বিষয়কে সংসদ, পার্লামেন্ট, প্রতিনিধী পরিষদ, মন্ত্রী পরিষদ এবং এজাতীয় অন্যান্য পরিষদ- এর নিকট দায়িত্ব প্রদান করে। রাজনীতি হতে ধর্মকে পৃথক করার দ্বারা এবং স্পষ্ট ও পরিস্কার ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রকে ধর্ম হতে আলাদা করতে চায় এবং শাসকদের সাথে ইসলামের কোন শরীক না হওয়ার দাবী করে। এটাই তারা মনস্থ করেছে।

অতঃপর তারা দ্বিতীয় একটি বিষয় ইচ্ছা করেছে যা এটা হতে সৃষ্টি হচ্ছে, তা হলো শাসিত লোকদেরকে ধর্মের বিরোধী ফয়সালা করা। যখন প্রশাসন দ্বীন হতে শূন্যের কোঠায় চলে যায়, এর দ্বারা তারা জাতিকে আল্লাহর দ্বীন হতে শুন্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়। সংক্ষেপে বলা যায়- রাজনীতি হতে ধর্মকে পৃথক করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাসকদেরকে ধর্ম হতে আলাদা হওয়া, তারপর গোটা জাতিকে ধর্মহীন করা এবং তাদেরকে রব্বুল আলামীনের দ্বীন হতে বহিস্কার করা। আর এটাকেই দ্বীন হতে মুরতাদ হওয়া গণ্য করা হবে।

('ফাসলুদ দ্বীন আনিল হুক্ম')

ডঃ নাছির ইবনে আবদুল কারীম আল-আক্ল (হাঃ)

তিনি বলেন, দ্বীন হতে নিশ্চিতরূপে এবং দ্বীনের ইমামগণ যে বিষয়ে ইজমা করেছেন তা হতে জানা যাচ্ছে- নিশ্চয় দ্বীন আক্বীদাহ্, আইন-কানুন, ইলম ও আমলকে বলে। এবং আক্বীদা ও আইন এই দুটিই ইসলাম। যে ব্যক্তি একটি বাদ দিয়ে অন্যটি যথেষ্ট মনে করবে, সে দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে। এই উম্মাত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া সত্বেও আহলে কিবলার সকলেই যুগ যুগ ধরে উক্ত বিষয়কে ধর্ম পালন করেছিলেন।

নিশ্চয় এই সংযুক্ত হওয়া এবং দু'টির প্রত্যেকটির প্রভাব অন্যটির মধ্যে নিশ্চিত ভাবে পাওয়া এই দাবী করছে- যে বক্তি আক্বীদাহ গ্রহণ করবে অথচ বিধান অনুযায়ী আমল করবে না, অথবা বিধান অনুসারে আমল করবে কিন্তু আক্বীদাহ গ্রহণ করবে না সে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে।

("আত-তালায়ুম বাইনাল আকীদাহ্ ওয়াশ শারীয়াহ" "আল-বাইয়াহ" বিজ্ঞাপন হতে সংগৃহিত)

উসতাদ, ডঃ আলী জুরাইশাহ্ হাফিযাহুল্লহু তায়ালাঃ

তিনি বলেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে অন্যের আইন গ্রহণ করল, সে আল্লাহর আইনকে অন্য আইন- এর সমান করে নিল। এ জন্য সে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বূদ অথবা অন্য রব গ্রহণ করল। কেননা আইন রচনা করা, সর্বপ্রথম প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্বের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খালিস আল্লাহর হক্ব। তদ্রূপ যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন পরিপূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে না, কিন্তু এতে সংশোধন করে। কেননা সে সমমানের অন্তরের প্রভাবে অথবা এর চেয়ে বেশী কর্তৃত্বের জন্যই একাজের মালিক হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, সে নিজের অন্তরকে শরীক নির্ধারণ করল। আর আল্লাহ তায়ালা এটা হতে অনেক বড়, অনেক মহান।

যেমন মদ, এটা অকাট্য প্রমাণ ও ইজমা দ্বারা হারাম। যখন মানব রচিত আইনে এর শাস্তি প্রদান করা হবে না, তবে তো তুমি ফয়সালার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে দিলে এবং এটাকে মুবাহ করলে। আর মুবাহ হচ্ছে হালাল- এর এক প্রকার। এজন্য এর দ্বারা তুমি আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা তুমি হালাল করলে। আর এটাই হচ্ছে পরিত্যাগ করার একটি পদ্ধতি। সংশোধনের পদ্ধতি হচ্ছে- মূল বিধান ঠিকই থাকবে।

সুতরাং হারাম হালালে পরিণত হবে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা উক্ত অপরাধের যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তাতে সংশোধন করা হবে। যেন সে মানব রচিত আইন দ্বারা এটা হারাম ঠিকই রাখবে এবং হারামও বলবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শরীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি সংশোধন করবে এবং চাবুক মারা অথবা রজ্ম করার পরিবর্তে জেলে রাখবে..... অতএব পরিত্যাগ করা বা সংশোধন করা, এটা হালাল করণের একটি অংশ। কুরআন কুফ্র ও শিরক আখ্যায়িত করে এটা বাতিল করে দিয়েছে।

("উসূলুস শরীয়াহ আল ইসলামিয়া" ১ম খণ্ড, ২২, ২৩পৃঃ "কালিমাতু হাক্ব" শাইখ ডঃ উমার আবদুর রহমান প্রণীত সহ ৫৬, ৫৭পৃঃ)

ডঃ আবদুল্লাহ ফাহ্দ আন-নাফীসীঃ

ইসলামী শাসনামলে যে সকল শাসক যুল্ম করেছেন, যে ফকীহ্গণ তাদের যুল্মের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তাদের কাফির আখ্যায়িত করেননি তাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করে উত্তরে বলেন, ঐ শাসকেরা আল্লাহ তায়ালার আইন অনুযায়ী ফয়সালা করতেন, বর্তমান সময়ের ন্যায় তারা মানব রচিত আইনে বিচার করতেন না। তিনি বলেনঃ "আগের ফক্বীহগণ চিন্তাই করতে পারেননি যে- পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করে কোন শাসক ফয়সালা করতে পারেন, যেমন আমরা বর্তমানে প্রত্যাশা করছি। ফক্বীহগণ কল্পনাই করতে পারেননি- কোন শাসক আল্লাহর আইন পরিহার করে ইসলামের উপর কর্তৃত্ব করবে, মুসলমানদের শাস্তিদেবে এবং আল্লাহর দুশমনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, যেমন বর্তমান শাসকদের অবস্থা।

অতঃপর তিনি হাফিজ ইবনে কাসীর- এর ফাতওয়া অনুসারে বর্তমান শাসকদের কাফির হওয়ার দলীল প্রদান করেন। তার একটি বক্তব্য- তাদের মধ্যে যে এমন কাজ করবে (অর্থাৎ তাতারদের ক্ষেত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে তদ্রূপ কাজ করবে) সে কাফির। তার সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর ফয়সালার নিকট ফিরে আসে। এবং এটা ব্যতীত ফয়সালার ক্ষেত্রে কম বেশী না করে।

(আস-সিয়াসাতুশ শারইয়া আন আত-তাজরিবাতিল জিহাদি'য়া ফী সূরিয়া, ২য় খণ্ড, ১১৫পৃঃ)

ডঃ মুহাম্মাদ নায়ীম ইয়াসীনঃ

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দাবি করে- এই শরীয়াতের কোন কোন আইন মেনে চলা এবং প্রয়োগ করা উপযুক্ত নয়, অথবা বর্তমান যুগে এটা অনুপযোগী, বা এরূপ কিছু সে এই দাবীর কারণেই কাফির। কেননা প্রভুত্বের বৈশিষ্ট হচ্ছে- নির্দেশ দেওয়া, ফয়সালা করা এবং আইন প্রণয়ন করা {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ বিধান দিবার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর}। দাসত্বেও বৈশিষ্ট হচ্ছ- মেনে চলা ও আনুগত্য করা....। যে ব্যক্তি দাবি করবে- আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি এমন আইন রচনা করার অধিকার তার রয়েছে কেননা তাকে শাসন ক্ষমতা ও আইন রচনার অধিকার দেয়া হয়েছে।

সে আরো দাবি করে- হারামকে হালাল করা এবং হালালকে হারাম করার অধিকার তার রয়েছে। তদ্রূপ আইন রচনা করা, এমন বিধান দেয়া যার মাধ্যমে যিনা ও সুদ বৈধ হবে, লজ্জাস্থান খুলে যাবে, অথবা আল্লাহর কিতাবে ও রসুলের সুন্নাতে যে সকল অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, তা পরিবর্তন করে দেয়া, কিংবা যাকাত, মিরাস, ও ইবাদত ইত্যাদিতে শারীয়তের নির্ধারিত অংশ যা শরীয়াত প্রণেতা কিতাব ও সুন্নাতে নির্দিষ্ট করেছেন তা রদবদল করা, এর মাধ্যমে সে কাফির হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি ত্বাগুত এর উপর ঈমান আনবে এবং প্রভুত্বের অধিকার হতে সে যা কিছু দাবি করে তা স্বীকার করে নেবে সেও কাফির।

এর দ্বারা তুমি জানতে পারলে-যখন শাসক 'আইন প্রণয়নকে নিজের অধিকার দাবি করবে, যা কিতাব ও সুন্নায় বিদ্যমান বিধানের বিপরীত, এর মাধ্যমে সে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে কিংবা তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যা হালাল করেছেন তা হারাম করে, তবে সে কাফির এবং আল্লাহর সঠিক দ্বীন হতে সে মুরতাদ হয়ে গেল। কেননা সে এর দ্বারা বিশ্বাস করে মানুষের উপকারের জন্য আইন রচনা করতে গিয়ে ইসলামের আইন হতে বের হয়ে যাওয়ার অবকাশ তার রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে সে কাফির।

যে ব্যক্তি এমন আইন প্রবর্তন করল, যার কারণে যিনা অথবা সুদ বৈধ হয়ে গেল কিংবা এমন অপরাধ বৈধ হয়ে গেল, আল্লাহর শরীয়তে যা হারাম

হওয়াতে কোন মতপার্থক্য নেই, তবে সে কাফির। এমন আইন প্রবর্তন করতে যারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে তারা সকলেই কাফির।

তুমি আরো জানতে পারলে- লোকদের মধ্যে তারাও কাফির, যারা এই ত্বাগুতদের জন্য এ সকল অধিকার স্বীকার করবে, এর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করবে, তাদের নিকট বিচার নিয়ে যাবে এবং তাদের ঐ সকল আইন- এর নিকট বিচার নিয়ে যাবে যা ইসলামের মূলণীতির বিপরীত।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ত্বাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে, পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (আল্লাহর আইন থেকে) অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়।

(সূরা নিসা ৬০)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ তাদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শূরা ২১)

(আল ঈমান আরকানুহূ, হাকীকাতুহু, নাওয়াকিযু, ১৪৯,১৫০,১৫১ পৃঃ)

শাইখ, উমার ইবনে মাহমূদ আবূ উমার (আবূ ক্বাতাদাহ ফিলিস্তীনী) হফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন এবং এই দ্বীনের রক্ষকদের মধ্যে তাঁকে একজন রক্ষাকারী করুন! তাঁকে এবং তাঁর সত্যবাদী মুওয়াহ্‌হিদ ভাইদেরকেও দ্বীনের সহায়ক করুন!

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রক্ষা করুন! মুসলিম দেশসমূহে শাসকদের সম্পর্কে শারীয়াতের হুকুম কি, আমি তাকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলে- তিনি এই দীর্ঘ উত্তর প্রদান করেন। এটা তার রিসালার লিখিত মূল বক্তব্য-

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الامين وعلى آله وصحبه اجمعين

أما بعد؛

নিশ্চয় আমাদের দেশেসমূহে রহমানের শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকদের সম্পর্কে আল্লাহর হুকুম জানা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ওয়জিব। এটা কোন নফ্‌ল বিষয় নয়। কেননা এই হুকুম এর উপরেই নির্ভর করছে- বিপজ্জনক মকদ্দমা ও গুরুত্বপূর্ণ আমল সমূহ। এর গুরুত্ব এতো বেশী যে, তাদের থেকে সম্পর্কহীন হওয়া, তাদের আনুগত্যের আওতায় প্রবেশ না করা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়া, যে বিষয়ে পূর্ববর্তী আলিমদের ইজমা হয়েছে, উক্ত সকল বিষয় এই হুকুম জানার উপর নির্ভর করছে।

এটা এজন্য যে, ধারণাকারী মনে করবে, এমন বিষয় মুসলমানদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া হতে বিরত রাখবে। অথবা এটা তাকে তুলাবে ইলম হতে ফিরিয়ে দেবে অথবা এর দ্বারা কিছু কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। এটা বাতিল ধারণা। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। কেননা আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- নাস্তিক ও ধর্মহীনদের কাফির আখ্যায়িত করা দ্বীনের প্রয়োজনীয় জিনিসের একটি আবশ্যক বিষয়। বিশেষকরে যখন এসকল নাস্তিক, অবিশ্বাসী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মূল কেন্দ্রে রয়েছে। এবং মুসলমানগণ জানতে পারে যে- রহমানের শরীয়াত পরিবর্তনকারী এ সকল শাসকদের ক্ষেত্রে নিরব থাকার জন্য আমাদের জাতির উপর নেমে এসেছে বিপদাপদ ও দুর্যোগ সমূহ। যখন বুঝে ওঠার আগেই অনেক মুসলমানকে এ সকল ত্বাগুতদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছে। এবং পরবর্তীতে তারা

মুরতাদ ও কাফিরদের একটি অংশে পরিণত হয়েছে, বিশেষকরে যুদ্ধের বিধান সম্পর্কে!

তদ্রূপ এদের বিষয়ে চুপ থাকার দরুন তাদের বাতিল মতাদর্শে ও আইন-কানুন এর জন্য পথ প্রস্তুত করা হয়েছে, যেন উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এর আমল করা যায়। তাদের আইন দ্বারা হারাম মাল হালাল হয়েছে, হারাম যৌনাঙ্গ হালাল করা হয়েছে, লোকদের রক্ত বিষয়ে বাতিল ও যুলুম দ্বারা ফয়সালা করা হচ্ছে। এছাড়া তাদের আইন বাস্তবায়নের দ্বারা দেশসমূহ নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দারিদ্রতা ও যুলুমের বিস্তার ঘটছে এবং ঐ অপরাধ সমূহ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন। এবং লোকেরা কোন রকম ভয় ভীতি ব্যতীত আল্লাহর দ্বীন হতে বের হয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো এসব কাফির শাসকদের অধীন হয়ে গেছে, যারা পাপের বিস্তার ঘটাচ্ছে, গুনাহের কাজে উৎসাহ দিচ্ছে এবং কুফ্‌র ও কাফিরদের পথকে সুন্দর করে দেখাচ্ছে, এমনকি আল্লাহ তায়ালার বাণী আমাদের ক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছেঃ

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অর্থঃ অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা মারয়াম, ৫৯)

তদ্রুপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণীঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

অর্থঃ স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। (সুরা রূম ৪১)

এগুলো আসমান ও যমীনের রব-এর শরীয়ত হতে মুখ ফিরে নেয়ার পরিণাম। অতএব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্তমান সময়ে যা মুসলমানদের জানা ওয়াজিব, তা হল এসকল শাসকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়লার হুকুম কি?

হে মুসলিম ভাই, আপনি জেনে রাখুন। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে প্রত্যেক অমঙ্গল ও ক্ষতি হতে রক্ষা করুন এবং আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে প্রত্যেক মন্দ ও গুনাহ হতে উদ্ধার করুন! নিশ্চয় শরীয়ত পরীবর্তন

করা আসমান ও যমীন এর রবকে অস্বীকার করাকে বলে। 'পরিবর্তন' দ্বারা উদ্দেশ্য- আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হালাল করেছেন, তা হারাম অভিহিত করা, অথবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল আখ্যায়িত করা। কেননা হালাল তো ওটা হবে যা আল্লাহ হালাল করেছেন, এবং হারামও ওটা হবে যা আল্লাহ তায়ালা হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সৃষ্টি যেমন তারই অধিকার, তদ্রূপ নির্দেশ প্রদান শুধু তারই কর্তৃত্বে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

অর্থঃ শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।

(সূরা আ'রাফ ৫৪)

যে ব্যক্তি মনে করবে হালাল করা ও হারাম করার ক্ষেত্রে আদেশ দানের কর্তৃত্ব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য রয়েছে সে কাফির। সে ঐরূপ কাফির হবে, যে মনে করে ওখানে আল্লাহ ব্যতীত সমপর্যায়ের অন্য একজন স্রষ্টা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

অর্থঃ (৩৯) হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু উপাস্য শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? (৪০) তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলি নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ। এই গুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই, বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে, আর কারো ইবাদত করবে না, এটাই সরল সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (সূরা ইউসুফ ৩৯, ৪০)

আপনি লক্ষ্য করুন! আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে হিফাযত করুন, কিভাবে বিধান দেয়ার অধিকার তার একক কর্তৃত্বে সীমাবদ্ধ করেছেন এবং এটাকেই ইবাদত হিসেবে নাম করণ করেছেন ও সরল সঠিক দ্বীন আখ্যায়িত

করেছেন। আর এটাই হচ্ছে নির্দেশ প্রদান। সুতরাং দ্বীন হচ্ছে ইবাদত এর নাম এবং ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর বিধানের কাছে অনুগত হওয়া। উক্ত কারণে যে ব্যক্তি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের রব ব্যতীত অন্য কারো বিধানের আনুগত্য করবে ও অধীন হবে, সে তো আল্লাহ ছাড়া অন্য করো ইবাদত করল। সে মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বীন ব্যতীত অন্য কারো ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। অতএব বিধান দেয়া এবং আইন প্রণয়নকেই দ্বীন বলে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

অর্থঃ রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারতো না।

(সূরা ইউসুফ, ৭৬)

সুতরাং জানা গেল বাদশাহর দ্বীন হচ্ছে তার বিধান দেয়া ও তার কর্তৃত্ব। উক্ত করণে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের নিকট নতি স্বীকার করবে, তবে সে তার দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি ওটা পরিত্যাগ করবে, সে তার দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে, এটাই হচ্ছে অত্র স্পষ্ট আয়াত সম্বন্ধে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যেক মুসলমানের সঠিক বুঝ।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ তাদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শূরা, ২১)

আল্লাহ তায়ালা আইন প্রণয়ণকে দ্বীন হিসেবে নাম করণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর আইন হচ্ছে তার দ্বীন। যে ব্যক্তি এটা গ্রহণ করবে, সে আল্লাহর নিকট নতি স্বীকার করবে এবং তার অনুগত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের আইন গ্রহণ করবে, সে তো আল্লাহর সাথে শিরক করল এবং মুশরিকদের দ্বীনে প্রবেশ করল। আমরা পরিত্যাগ করা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে, অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট বিচার নিয়ে যায় তার উক্ত দাবীকে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটা আল্লাহর ভাষায় ত্বাগুত-এর ফয়সালা বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴿٦٠﴾وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴿٦١﴾

অর্থঃ (৬০) আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আমরা ঈমান এনেছি যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ত্বাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে। পক্ষান্তরে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (আল্লাহর আইন থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়)। (৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদ্দিকে এবং রসূলের দিকে এসো, তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। (সূরা নিসা ৬০, ৬১)

অতএব, এটা হচ্ছে তাদের অবস্থা যারা উক্ত বাতিল কুফরী আইন- এর নিকট বিচার নিয়ে যায়। সুতরাং ঐ ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হবে, যে আইন রচনা করে এবং তদনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফয়সালা করা ওয়াজিব করে দেয়? সে নিঃসন্দেহে অত্র আয়াত সমূহের অর্থের মধ্যে আরো বেশী অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উক্ত আয়াতগুলোর নির্ধারিত হুকুমের আওতায় পড়বে। বরং আয়াতে কারীমাহ- এর 'নাস' দ্বারা সে স্বয়ং ত্বাগুত।

উক্ত অকাট্য দলীলের আলোকে রহমানের আইন পরিবর্তনকারী ঐ সকল শাসক কাফির ও মুরতাদ। এবং নিশ্চয় "উক্ত পরিবর্তন করা" কিতাব ও সুন্নাহ এর অকাট্য দলীল দ্বারা এবং আহলে সুন্নাহ- এর ইজমা অনুসারে কুফরী। এটা ভিন্ন কথা যে, এই সিদ্ধান্ত হতে মুর্জিয়া, জাহমিয়া ও বিদআতীগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের ইমামগণ রহিমাহুল্লাহ তায়ালা অনেক অকাট্য দলীল দ্বারা এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। যার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ দীর্ঘ ও ব্যাপক বিস্তৃত। এ বিষয়ে হক্ব সম্পর্কে গবেষকের দায়িত্ব হচ্ছে- ব্যক্তি বর্গের পক্ষাবলম্বন পরিহার করা, প্রবৃত্তি ও অজ্ঞতার চাদর খুলে ফেলে দেয়া এবং উক্ত মাসয়ালার প্রতি ইনসাফের দৃষ্টিপাত করা, প্রবৃত্তি ও সংশয় হতে নিজেকে দূরে রাখা।

সে অতি সত্বর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে দেখতে পাবে, এই মাসয়ালায় সত্য আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের সাথেই রয়েছে- এবং সকল ইমামদের সঙ্গেই বিদ্যমান। যেমন ইমাম আহমাদ, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, ইবনে কাসীর। তাঁদের পরে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, শাইখ আহমাদ শাকির, মাহমুদ শাকির, শাইখ মুহাম্মাদ আমীন আশ শানক্বীতী! এছাড়া অনেকেই উক্ত বিষয়ে ইলম ও অনুসন্ধান দ্বারা আলোকপাত করেছেন।

পক্ষান্তরে যারা লোকদের নিকট এই ইলম গোপন করার চেষ্টা চালায়, গোপন করে অথবা মিথ্যা সাজিয়ে কিংবা সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে, তবে তাদের সাক্ষ্য সত্বর লেখা হচ্ছে এবং তারা উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

সুতরাং হে মুসলিম ভাই, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং লোকেরা যে বিষয়ে মতানৈক্য করেছে তা হতে আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করুন! যেমন নবী (সাঃ)-এর দোয়া ছিল। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে ইসলাম যখন গারীব (অপরিচিত) হয়েছে এবং আমানতকে জরিমানা মনে করা হচ্ছে এবং হক্ব পন্থী লোকেরাও গারীব (অপরিচিত, বিদেশী) বিবেচিত হচ্ছে, এমতাবস্থায় আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে হক্ব পন্থী ও দ্বীন পন্থী করুন, মুহাম্মাদ নবীউল আমীন- এর অনুসারীদের দ্বীন এর উপর রাখুন। তাঁর উপর, তাঁর পরিবারের উপর এবং সকল সাহাবীদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। আমীন! আমীন!!

আপনাদের ভাই, প্রত্যেক কল্যাণের দিকে আহবানকারী,

আবু ক্বাতাদাহ্ ফিলিস্তীনী।

১৫- ০৩- ১৪১৮ হিজরী।

২০- ০৮- ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

শাইখ, মুহাম্মাদ শাকির আশ-শারীফঃ

তিনি তাঁর পুস্তিকা "আল-আল্মানি'য়াহ্" (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) উক্ত পুস্তিকার ভূমিকা লিখেছেন ফযীলাতুশ- শাইখ আবদুল্লা ইবনে আবদুর রহমান আল-জাবরীন। এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ- এর ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেনঃ মোট কথা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ- এর পূর্বের দুটি পদ্ধতি স্পষ্ট কুফরী। যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি উক্ত পদ্ধতির যে কোন একটি বিশ্বাস করবে এবং গ্রহণ করবে, সে দ্বীনে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে।

আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটা এজন্য যে, নিশ্চয় ইসলাম একটি ব্যাপক ও পূর্ণ দ্বীন। যে ব্যক্তি দ্বীনে ইসলামের কোন নিশ্চিত জানা বিষয়কে পরিত্যাগ করবে, তার কাফির ও পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্পর্কে শরীয়াতে অনেক অনেক দলীল বর্ণিত হয়েছে। যদিও এটা তুচ্ছ বিষয় সম্বন্ধে হয়ে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতো দুনিয়াবী রাজনীতি সম্পর্কীয় শরীয়াতের বিধানকে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করবে তার অবস্থা কিরূপ হবে? যে কেউ এমন কাজ করবে সে কাফির তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(আল-আলমানিয়াহ্ ওয়া ছামারুহা আল-খাবীসাহ্, ১৮, ১৯পৃঃ)

শহীদ, (আমরা ঐরূপ ধারনা করি) মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম ফারাজ রহিমাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তাঁর শেষ্ঠ পুস্তিকা "আল-জিহাদ আল ফারীযাতুল গায়িবাহ"- এর মধ্যে "আল-মুকারানাহ বাইনাত তাতার ওয়া হুক্কামিল ইয়াউম" শিরোনামে মন্তব্য করেনঃ

আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থঃ তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?

(সূরা মায়িদাঃ ৫০)

ইবনে কাসীর (রহঃ)- এর অত্র আয়াতের তাফসীর থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান হতে বের হয়ে যাবে, যে কেউ হোক না কেন, তাদের প্রত্যেকে এবং তাতার- এর হুকুম এর মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করেননি। বাস্তবে তাতারীগণ 'আল-ইয়াসিক' দ্বারা ফয়সালা করত। যা ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম হতে রচিত হয়েছে। এতে অনেক বিধান এমন রয়েছে যা শুধু প্রবৃত্তি ও চিন্তা হতে গ্রহণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে পশ্চিমাদের রচিত আইন হতে আল ইয়াসিককে কম মর্যাদা দেয়া হতো। এটা ইসলাম ও কোন শরীয়াত- এর সাথে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। বর্তমানকালের শাসকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ কি একইরূপ নয়? তারা এবং তাদের বন্ধু সাঙ্গপাঙ্গরা যারা শাসকদের নির্দেশকে তাদের সৃষ্টিরকর্তার চেয়ে বেশী সম্মান প্রদর্শন করে।

(আল-জিহাদ আল-ফারিযাতুল গায়িবাহ্ ১১, ১২ পৃঃ)

শাইখ, আবূ আবদুল ফাত্তাহ্ আলী ইবনে হাজ্জ (হাঃ)

তিনি তাঁর পুস্তিকায় বাস্তবায়ন করে এমন বিচারক যার সাথে অপবাদ প্রমাণিত হয় তাকে সম্বোধন করেন, মোট কথা তিনি উপদ্বীপীয় দেশ সমূহে শাসকদেরকে ইসলামী আইন দ্বারা বিচার করা ওয়াজিব এই দাবীর প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেনঃ হে বিচারক, আপনি জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি পদ্ধতিগত কোন আইন রচনা করল, অথবা এমন কোন আইন রচনা করল, যা শরীয়াত প্রণেতা আলোচনার মাধ্যমে বাধা দেননি, অথবা পার্থিব পরিবর্তশীল মাসআলার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন আইন প্রণয়ন করল, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী- اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِشُؤُوْنِ دُنْيَاكُمْ

"তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয়াদি সম্পর্কে বেশী অবগত"- এর আওতায় পড়ে তবে সে কাফির হবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা- এর বিপরীত আইন প্রণয়ন করল এবং যে আইন ইসলামী শরীয়াতের উদ্দেশ্য- এর সাথে সাংঘর্ষিক, সে নিঃসন্দেহ ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ তাদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্যে বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শূরাঃ ২১)

পূর্বের আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়েছে যে- শরীয়াত প্রণেতা আল হাকিম মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা এবং বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলেমগণ যার বর্ণনা দিয়েছেন এরূপ 'হাদ'- এর শর্তগুলো যে পূর্ণ করতে পারবে না তার জন্যে বিচারক- এর পদ গ্রহণ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি উপরোল্লেখিত শর্তগুলো পূর্ণ না করেই বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং লোকদের মধ্যে বিধান জারী করবে, এটা পরিপূর্ণ বাতিল। এতে কোন অস্পষ্টা নেই। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর পরিবর্তে ফয়সালা করা স্পষ্ট কুফ্র।

তদ্রূপ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফয়সালাকারী রাষ্ট্রের বিচারকের পদ গ্রহণ করবে, তবে সে বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়বে। এর দ্বারা সে কুফ্র- এর নিকট পৌঁছে যাবে। আল্লাহর কাছে এর থেকে আমরা আশ্রয় চাচ্ছি। তার ফয়সালা দ্বারা অর্জিত সম্পদ ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। বরং সে স্বয়ং তার পরিবার ও সন্তানদেরকে হারাম দ্বারা আহার করাচ্ছে। কেননা আল্লাহ যখন কোন বস্তু হারাম করেন তখন তার মূল্যও হারাম করে দেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থঃ মু'মিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।

(সূরা নূরঃ ৫১) ("গায়াতুল বায়ান ওয়াত তাদক্বীক্ব ফী ইকামাতিল হুজ্জাহ্ আলা কাযীত তাহক্বীক্ব" ৬৪-৬৬পৃঃ)

শাইখ, সাউদ শা'বান (রহঃ)ঃ

তিনি হাবশী দলের প্রতিবাদ করে এক স্থানে বলেন, আমি গতকাল টেলিভিশনে পাগড়ি পরিহিত এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম- আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা না করলে আল্লাহর সাথে কুফ্রী করল বলে গণ্য হবে না। আমি আল্লাহর নামে কসম করে আপনাদের বলছি, উক্ত পাগড়ি পরিহিত শাইখ হতে অন্য কাউকে আল্লাহ তায়ালা ও কিতাবুল্লাহ- এর উপর এত বড় স্পর্ধা দেখিয়েছে কি? যিনি বলেন, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা না করলে কাফির হবে না?

আল্লাহ তায়ালা কি কুরআনে কারীমে বলেননিঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা কাফির।" উক্ত তিনটি জঘন্য বৈশিষ্ট আল্লাহর বিধান-এর বিপরীত ফয়সালাকারী আরব শাসক ও বিশ্বের কাফির শাসকদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন। আমি জানি না তিনি কোথা থেকে পাগড়ী ক্রয় করেছেন এবং এর মূল্য কোথা হতে সংগ্রহ করেছেন। আর উক্ত পাগড়ী ধারী শাইখ প্রত্যেক ধৃষ্টতার সাথে আল্লাহর কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তিনি আবর শাসকদের নৈকট্য লাভের আশায় কথা বলেন। তিনি তাদের ভালবাসার জন্য বক্তব্য দেন! তিনি কি যালিমদের ভালবাসা লাভের জন্য খুতবা প্রদান করেন আর রব্বুল আলামীনের মুহাব্বত পরিহার করছেন? আপনি কি স্বেচ্ছায় উক্ত মর্যদায় পৌঁছার উপযোগী মনে করছেন? যালিমদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা পছন্দ করছেন, অথচ মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী বন্ধুকে পরিহার করছেন। উদ্দেশ্য একটাই- আরব কাফির, আমেরিকা ও ইসরাঈল-এর নৈকট্যলাভ করা।

("আল-মাকালাতুস সুন্নি'য়া ফী কাশফি যালা'লাতিল ফিরকাতিল হাবশি'য়া" প্রথম মুদ্রণ ১৬৮পৃঃ)

শাইখ, ওয়াজ্দী গানীম হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

শরীয়াতের বিধানকে শাসকদের বাধ্যতামূলক গ্রহণ না করা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ এ সকল শাসক ও তাদের অনুগত ব্যক্তিরা ইসলাম চায়না। তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাব এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এছাড়া যারা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন এর দিকে আহবান করে তাদের প্রত্যেকের সাথে যুদ্ধ করে। বর্তমানে আপনি তাদেরকে প্রত্যক্ষ করবেন, তারা মদ ও যিনা বৈধ করেছে এবং আইন দ্বারা ওগুলো সংরক্ষণ করছে। তারা মূলত ইসলাম চায়না। অতএব আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। ("সিলসিলাহ্ সুলূকুল মুসলিম")

শাইখ, আবদুর রহমান আবদুল খালিক হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেন, নিঃসন্দেহ পরিচিত অপরাধসমূহ- এর জন্য শরীয়াত- এর হাদ্দ (শাস্তি) যেমন, চুরিকরা, হত্যা করা, যিনা, মদপান করা, রাহাজানি করা, দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি অপরাধের শারীয়াতের হাদ্দ বা শাস্তি রয়েছে অর্থাৎ এসব অপরাধের শারীয়াতের নির্ধারীত শাস্তি নিশ্চিতরূপে দ্বীন হতে সকলের জানা এবং প্রসিদ্ধ। কোন মুসলমানের উক্ত বিষয় না জানার কোন সুযোগ নেই। যখন এটা দ্বীন হতে জানা ও প্রমাণিত বিষয়, সুতরাং তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা প্রত্যাখ্যান করা কুফ্র, যা তাকে ইসলাম হতে বের করে দেবে। উক্ত হুকুমে আদৌ কোন মতানৈক্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান, যা তাঁর কিতাব ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর যবানিতে প্রমাণিত তা প্রত্যাখ্যান করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

বিশেষ করে যখন কারণ ব্যাখ্যা করে এমন প্রত্যাখ্যান করা হবে। যেমন, এই আইন মানুষের উপযোগী নয়, অথবা বর্তমান সময়ের অনুকূলে নয়, কিংবা এটা নিষ্ঠুর আইন ইত্যাদি। কেননা আইন প্রণয়নের দোষ, ত্রুটি হচ্ছে বাস্তবে আইন প্রণেতার দোষ, ত্রুটি অন্বেষণ করা। যিনি এই আইন রচনা করেছেন এবং যিনি এর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা" যে ব্যক্তি আল্লাহর দোষ ত্রুটি, কিংবা স্বল্পতার প্রতি সম্বন্ধ, অথবা অজ্ঞতার অভিযোগ করবে, "সে কাফির ও ইসলাম হতে বহিস্কৃত" এতে কোন মুসলমান সন্দেহ করতে পারে না।

("আল-হুদূদুশ শারই'য়া ওয়া কাইফা মুতাব্বাকুহা" ২১পৃঃ আল-মাত্বাআহ আস-সালফিয়া, কায়রো)

ডঃ আইমান আল-জাওয়াহিরী জামাআতে জিহাদ-এর আমীর, মিসরঃ হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ বরং ইসলাম ও শরীয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী আদি কাফিরদের পূর্বে এ সকল মুরতাদ শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তিনটি কারণে।

(১) এটা হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পূর্বেই এটা করতে হবে। কেননা এ সকল মুরতাদ শাসক মুসলমানদের দেশে জবরদখল করে আছে। (২) মুরতাদ আদি কাফির হতে বড় অপরাধী। (৩) তারা নিকটবর্তী শত্রু। ("শিফাউ সুদূরিল মু'মিনীন" ২৩-২৫পৃঃ)

তিনি জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাওয়ার অবস্থা ব্যাখ্যা করে বলেনঃ এটা যেমন মুসলমানদের দেশে দেশে বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে। এদেশগুলোতে কাফির অপরাধী শাসকেরা বিজয়ী হয়েছে। তারা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিধান দ্বারা মুসলমানদের শাসন করছে এবং আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে...।

অতএব এই শাসকেরা কিতাব, সুন্নাহ ও উম্মাতের পূর্ববর্তীদের ইজমা অনুসারে কাফির। প্রত্যেক মুসলমানের হাত দ্বারা, মাল দ্বারা ও যবান দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব। প্রত্যেকে তাদের শক্তি ও সামার্থ অনুসারে তা আদায় করবে। যদিও তারা মুসলমানদের নামানুসারে নিজেদের নাম রাখে এবং তাদের ভাষায় কথা বলে, তবুও এদিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। অতএব, আদি কাফির ও যে ব্যক্তি এই দ্বীনের দিকে জোরপূর্বক ও অপবাদ দ্বারা নিজের সম্পৃক্ততার দাবি করে এদের মধ্যে কাফির এর হুকুম প্রয়োগ করতে কোন পার্থক্য নেই। বরং যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেনঃ শরীয়তের অবস্থান এই যে, কয়েকটি কারণে আদি কাফির হতে মুরতাদ এর শাস্তি কঠিন। সুতরাং এসকল শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের হত্যা করা ওয়াজিব। মুসলমানদের যে ব্যক্তি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হবে, সেতো শহীদ ইনশাআল্লাহ। ("মাআলিমুল জিহাদ", ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃঃ)

তিনি মিসর- এর ব্যাবস্থাপনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে আরো বলেনঃ এই পদ্ধতির সাথে আমাদের সংঘাত হচ্ছে- আকীদাগত সংঘাত। যার ফয়সালা করবে সম্মানিত শরীয়াত। অতএব এই পদ্ধতি হচ্ছে- শরীয়াত হতে মুরতাদ-এর রীতি, এর দ্বারা ফয়সালা করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, কাফির, মুরতাদ- এর ব্যবস্থাপনার সাথে কোনরূপ যুদ্ধ বিরতি অনুমোদন করা অসম্ভব। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব, এটাই ফকীহদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। মুরতাদ- এর ক্ষেত্রে তাওবাহ অথবা হত্যা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। ("তানযীমুল জিহাদ" ১৯৯৭ খৃঃ প্রকাশিত)

মুজাহিদ আবূদ আয্-যুমার হাফিযাহুল্লাহু তায়ালঃ

মিশরে ত্বাগুত- এর জেলখানা হতে আল্লাহ তাকে মুক্ত করুন! তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন এর পরিবর্তে অন্য আইন গ্রহণ করবে এবং এটা উত্তম কিংবা তার সমকক্ষ মনে করবে, তবে সে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল। তার পছন্দনীয় পদ্ধতি শিয়া সম্প্রদায় হোক কিংবা উদারপন্থী মতবাদ হোক, অথবা দেশীয় কোন মতবাদ, যা কম হোক বা বেশী হোক ইসলাম বিরোধী হবে এ সকল মতবাদ জাহেলিয়াত।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থঃ তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? (সূরা মায়িদাহ্ ৫০)

এটা আমি মনগড়া কথা বলছিনা, বরং এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের ইজমা। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির পুনঃনিরীক্ষণ করা কর্তব্য।

(কাইফা কাতালনাস সাদাত, ৪২,৪৩ পৃঃ)

ডঃ নাজিহ্ ইবরাহীম হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

মিশরে ত্বাগুত এর জেলখানা হতে আল্লাহ তায়ালা তাকে মুক্ত করুন! তিনি বলেনঃ সুতরাং শাসকগণ প্রাচ্য অথবা প্যাশ্চাত্যের সাথে স্পষ্ট ও জঘণ্য বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। তারা উভয়েই কাফির। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে পরিপূর্ণ মুহাব্বত রাখছে। ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাথে শত্রুতা, যুদ্ধ, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে। তারা বর্তমানে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করা পরিহার করেছে এবং শরীয়ত পরিবর্তন করেছে। তারা এসকল অপরাধ করার পরেও এবং সবগুলোকে লাঞ্ছিত করার পরেও তারা দাবি করছে- আমরা মুসলমান।

আর তাদের নিকট কিছু জঘণ্য আলিম আছেন যারা তাদের "খলীফাহ" এবং "আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ" উপাধি প্রদান করেন। জনগণকে শাসকদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের কুফরী এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয় এবং তাদের আইন এর নিকট বিচার প্রার্থনা করার আদেশ দেয়া হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নতুন দ্বীন, যা লোকদের মাঝে খরিদ করে আনা হয়েছে। এবং এটাই প্রচার করা হয় ও সন্তানদের মগজে এটাই শিক্ষা দেয়া হয়। উক্ত দ্বীন ঘোষণা দেয়- নিশ্চয় মসজিদ আল্লাহর জন্য এবং আইন রচনা করার অধিকার শুধুমাত্র শাসকদের জন্য। (মীছাকুল আমালিল ইসলামী, ২৯ পৃঃ)

শাইখ, আবূ ত্বলাল আল-কাসিমীঃ

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হেফাযত করুন, তিনি যদি ত্বাগুত- এর জেলখানায় জীবিত থাকেন, তবে তাঁকে মুক্ত করুন, আর যদি নিহত হয়ে থাকেন, তবে আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করছি, তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন এবং শাহাদাত- এর মর্যাদা দান করেন, তিনি বহুবার আল্লাহ তায়ালার নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে জীবিত ও শহীদ (ইনশাআল্লাহ) অবস্থায় রহম করুন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঐ সকল ভাইদের প্রতি রহম করুন, যারা তাঁর পূর্বে চলে গেছেন এবং যারা তার সাথে মিলিত হয়েছেন!

তিনি বলেনঃ "মিসরের সংবিধানের ১৩৬ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে"- "জনগণের আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে।" এই বিষয়টি নিঃসন্দেহ ইসলামের স্পষ্ট বিপরীত। যে ব্যক্তির এই দ্বীন সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রয়েছে, সে উক্ত বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য- যে ব্যক্তি নিজের জন্যে উক্ত অধিকার দাবী করবে সে তো আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। সে এই দাবির জন্যে ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যাবে। বরং যারা তার জন্য উক্ত অধিকার স্বীকার করবে তারা প্রত্যেকে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে।

অতঃপর কোরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, যাতে যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্যের নিকট বিচার নিয়ে যায় তাদের কুফরীর বিষয় স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি ইমাম আশ-শানক্বীতী- এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেনঃ উক্ত আসমানী নস্ দ্বারা চুড়ান্তভাবে স্পষ্ট হচ্ছে- নিশ্চয় যারা মানব রচিত আইন, যা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর রসূলের যবানীতে বিধান দিয়েছিলেন তার বিরোধিতা করার জন্য শয়তান তার বন্ধুদের মুখ দিয়ে রচনা করিয়ে নিয়েছে- এর অনুসরণ করবে, তাদের কাফির ও মুশরিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। তবে আল্লাহ যার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং ওয়াহী এর নূর হতে যাকে অন্ধকারে রেখেছেন তাদের কথা ভিন্ন।

("আল-আদিল্লাতুন নাকলি'য়া ওয়াল আকলি'য়া আলা হুরমাতি দুখুলিল বারলামানাতুশ তাশরীইয়া" ৬,৭পৃঃ)

ইসামুদ্দীন দারবালা ও আসিম আবদুল মাজিদঃ

আল্লাহ তায়ালা উসতাদ ইসাম এর উপর রহম করুন এবং উসতাদ আসিমকে মিসর এর জেলখানা হতে মুক্ত করুন! তারা বলেনঃ বর্তমানে শাসকেরা যারা ইসলামের অধিকাংশ আইন প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে এবং মানবরচিত আইন দ্বারা ওটা পরিবর্তন করে ফেলেছে, এটা স্বয়ং স্পষ্ট কুফ্র। বর্তমান যুগের শাসকদের অবস্থা হুবহু তাতারদের অবস্থার মত (যাদেরকে আলিমগণ কাফির ফাতওয়া দিয়েছিলেন)। তাদের আইনকে "বর্তমান আল ইয়াসিক" নামে নাম করণ করা হবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, যদিও ওখানে কোন সম্ভাব্য ইমাম না থাকেন। তবুও মুসলিম ইমাম প্রতিষ্ঠা ও তাকে ক্ষমতা প্রদান এর জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

ইমাম যখন কাফির হয়ে যাবে ও শরীয়াত পরিবর্তন করবে তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব। মুসলমানগণ যদি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা না করে তবে তারা গুনাহগার হবে- যতই মূল্য দিতে হোক না কেন। কেননা অবাধ্য কাফির এর ফিতনা ও তার কর্তৃত্ব এর থেকে বড় কোন ফিতনা নেই। উক্ত ফিতনা দূর করার জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থঃ আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(সূরা আনফালঃ ৩৯)

শরীয়াত পরিবর্তনকারী কাফির শাসক এর সাথে যুদ্ধ করতে হবে, যে তাকে রক্ষা করবে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে, এবং যে দল তাকে রক্ষা করবে, তার আইন ও পদ্ধতির পৃষ্টপোষকতা করবে তাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে। ("আল-ক্বওলুল ক্বাতিই' ফীমান ইমতানায়া আনিশ শারায়িই" ৯৪ পৃঃ)

মূল গ্রন্থে রয়েছে, "নিশ্চয় মানব রচিত আইন স্পষ্ট কুফ্র, এতে কোন অস্পষ্টতা নেই। এটা পরিপূর্ণ আল্লাহর আইন- এর বিপরীত হোক, অথবা কোন কোন বিষয়ে প্রয়োগ করে এবং অন্য বিষয়ে পরিহার করলেও তাতে কোন পার্থক্য হবে না। উক্ত নিয়ম (পদ্ধতি)- কে কুফ্র এর হুকুম দেয়া হবে- যখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইসলামের বিপরীত আইন রচনা করা হবে, অথবা ইসলামের সাথে সাথে অন্য আইন রচনা করা হবে তখন ইসলাম এক স্থানে অবস্থান করবে এবং মানব রচিত আইন অন্য স্থানে অবস্থান করবে।

(উপরের গ্রন্থ, ১১০ পৃঃ)

শাইখ, মুজাহিদ, উসামা বিন লাদিন হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

আল্লাহ তায়ালা তাকে দৃঢ় রাখুন, তার হায়াত বৃদ্ধি করে দিন এবং তাঁর দ্বারা মুসলমানদের উপকার করিয়ে নিন! আমীন!! সঊদী বাদশা ফাহ্দ ইবনে আবদুল আযীয এর নিকট প্রেরিত তাঁর একটি পত্রে তিনি বলেছেনঃ

"নাজদ ও হিজায, এর বাদশাহ ফাহ্দ ইবনে আবদুল আযীয এর প্রতি, যে ব্যক্তি হিদায়ত এর অনুসরণ করে তাঁর উপর শান্তি।

প্রথমঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর পরিবর্তে আপনার ফয়সালা করা এবং এর জন্য আইন প্রণয়ন করা, নিশ্চয় কুরআন, সুন্নাহর নাস সমূহ ও এই উম্মতের আলিমগণের মন্তব্য সমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে যে- প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে নিজের জন্য ও অপরের জন্য মানবরচিত আইন- এর অনুসরণ করার অনুমোদন দেয়, অথবা আল্লাহ তায়ালা এর বিধানের বিপরীত মানুষের আইন মান্য করার বৈধতা দেয়, সে কাফির এবং ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে।"

অতঃপর তিনি "আল ইয়াসিক"-এর সম্বন্ধে আলিমগণের মতামত বর্ণনা করে বলেনঃ "আল ইয়াসিক" তো মানবরচিত আইন- এর পূর্বের উদাহরণ, যার দ্বারা আপনি ফয়সালা করেন এবং আপনার ফয়সালার পদ্ধতি এবং বর্তমান পদ্ধতির আলোকে আপনার ফয়সালা প্রদান এটা ছাড়া আর কি? নিশ্চয় মানব রচিত আইনকে বিচারক বানানো এবং এর নিকট বিচার নিয়ে যাওয়া, নিঃসন্দেহ যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে এই আইন প্রণেতার গোলামী করল এবং উক্ত আইন যারা অনুসরন করবে এবং আনুগত্য করবে, তবে ঐ আইন প্রণেতা আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে নিজের দাসে পরিণত করল।

তিনি আরো বলেন, এটা সকলের জানা কথা- যে ব্যক্তি কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে, যেমন সুদ হারাম বিশ্বাস করা সত্বেও তা ভক্ষণ করবে এবং যে ব্যক্তি এমন আইন প্রণয়ন করল যার দ্বারা এসকল কবিরা গুনাহের কাজ গ্রহণ করা বৈধ্য হয়ে যায় এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অতএব যেমন কোন ব্যক্তি সুদের চর্চা করল অথচ সে এটা হারাম বলে স্বীকার করে, তবে সে একটি কবিরা গুনাহে লিপ্ত হল। এটা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কিন্তু যে ব্যক্তি এমন আইন রচনা করল, যা সুদকে বৈধ করল, তবে সে কাফির মুরতাদ। সুদ ভিত্তিক ব্যাংক তৈরীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি করা, এবং এর জন্য হারামাঈন শরীফাঈন এর অনুমোদনের জন্য ভিড় করা ও অপনাদের রচিত আইন দ্বারা আমল করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

(ফাহ্দ বিন আবদুল আযীয-এর প্রতি তার প্রেরিত পত্র, যা দশ পাতা বিশিষ্ট ছিল, ১, ৩, ৪পৃঃ সংক্ষিপ্তাকারে)

শাইখ, আবূ মুনযির আস-সায়িদী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইলম দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন! তিনি তার কিতাব "আল খুত্বতুল আরীযাহ ফী মিনহাজিল জামাআতিল ইসলামিয়া আল-মুকাতালাহ লিবিয়া, উক্ত গ্রন্থে পঞ্চম অধ্যায়ে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী শাসকদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ এই বিষয়ে আমরা স্পষ্ট করতে চাচ্ছি- যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করা পরিত্যাগ করবে এবং তা অন্য কিছু দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলবে তার ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, যদিও সে সালাত আদায় করে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে। তাকে অপসারণ করা, তার সাথে যুদ্ধ করা এবং অন্য একজন মুসলমান পুরুষকে তার স্থলে প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, প্রকাশ্যভাবে শারীয়াতের নিকট মাথানত করা কলবী ঈমানের দু'টি রুকনের মধ্যে একটি রুকন (স্তম্ভ) এর সাথে সম্পর্ক রাখে। এটা তো শুধুমাত্র 'আত্মসমর্পণ করা।"

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ঈমান অর্জনের জন্য "বিশ্বাস করা ও আত্মসমর্পন করা" শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু মুর্জিয়াগণ এর বিপরীত। তারা শুধু বিশ্বাস করাকেই যথেষ্ট মনে করে। নিশ্চয় সূচনাতেই শরীয়াতের নিকট আত্মসমর্পণ পরিহার করা এবং ওটা সংক্ষেপে দায়িত্ব রূপে গ্রহণ পরিত্যাগ করা আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেওয়া এবং অন্তরের মুহাব্বাতকে ছিন্নকারী প্রমান করবে। এছাড়া শারীয়াতকে সালিস না মানার সাথে সাথে যদি এর সাথে বিদ্রূপ করা, এটা অকেজো হওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করা বর্তমান যুগে ওটা অনুপযোগী বলা এবং নিশ্চিতভাবে দ্বীন হতে জানা বিষয়কে অস্বীকার করা, এগুলো কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করবে।

("আল-খুত্বতুল আরীযাহ ফী মিনহাজিল জামাআতিল ইসলামিয়া আল মুকাতালাহ" ৯৮পৃঃ)

অতঃপর তিনি শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে আলিমগণের মতামত উল্লেখ করার পর বলেনঃ "এ সকল মন্তব্য ও দলীল দ্বারা স্পষ্টভাবে জ্ঞানবান ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে- ইসলামী আইন পরিবর্তনকারী শাসকেরা বড় কাফির, ইসলাম হতে বহিস্কৃত।" (উপরের গ্রন্থ, ১১২পৃঃ)

শাইখ, আবূ মুহাম্মাদ ইসাম আল-মাকদিসী (হাঃ)

তিনি ত্বাগুতকে অস্বীকার করা ওয়াজিব, এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐ সকল বিচারক যারা এটার নিকট বিচার নিয়ে যায় এবং জর্ডানের মুওয়াহ্হিদ (একত্ববাদী) ভাইদের সম্বোধন করে বলেনঃ

এটা আসমান ও যমীনের মহাশক্তিধর এর পক্ষ হতে অকাট্য ও স্পষ্ট হুকুম। কোন বিষয়ে কিংবা কোন একটি মাসআলায় মানব রচিত আইন- এর অনুসারী ব্যক্তি মুশরিক, সে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। যদিও সে সিজদা না করে, তার জন্য সালাত আদায় না করে ও রুকু না করে। আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রে আনুগত্য করা একটি ইবাদত। ওটাও একমাত্র আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা- এর জন্য হওয়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ওটা গাইরুল্লাহ্- এর দিকে ফিরে দিল, সে তো গাইরুল্লাহর ইবাদত করল।

যখন আপনি এটা জানতে পারলেন এবং আপনার নিকট স্পষ্ট হলো যে- নিশ্চয় স্পষ্ট কুফ্র ও স্পষ্ট শিরক্ হচ্ছে, গাইরুল্লাহকে আইন প্রণেতা গ্রহণ করা। এই আইন প্রণয়নকারী কোন আলিম হোক, কিংবা কোন শাসক হোক, অথবা ডেপুটি হোক বা কোন গোত্রের নেতা হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। আরও জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কিতাবে শিরক্- এর ক্ষেত্রে বিধান দিয়েছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করল, সে যেন বড় অপবাদ আরোপ করল। (সূরা নিসাঃ ৪৮)

আরো জানতে পারলেন, নিশ্চয় আপনাদের রচিত শিরকী সংবিধাণের ২৬নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যা অকাট্যরূপে প্রমাণ করছে যে- "নিশ্চয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বাদশা এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যদের হাতে থাকবে।"

আরো জানতে পারলেন, নিশ্চই যে ব্যক্তি উক্ত নতুন দ্বীন গ্রহণ করবে, স্পষ্ট কুফ্র কবুল করবে এবং আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর তাওহীদ ধ্বংসকারী

জিনিস গ্রহণ করবে, সে তো আল্লাহর পরিবর্তে এ সকল আইন প্রণেতাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করল এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাদের অংশীদার স্থাপন করল।

সাবধান! আজকে আমরা আপনাদেরকে এক্ষণে এটা হতে মুক্ত হতে আহ্বান করছি। কেননা আপনি এজন্য এমন দিনে অনুশোচনা করবেন, যে দিন অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। হে বিচারক মণ্ডলী! সূচনাকারী হোন, কিংবা আইনজীবী হোন অথবা উকিল হোন কিংবা জামিনদার হোন, আপনাদের অপরাধ হচ্ছে উক্ত এই বড় শিরক করা। উক্ত অপরাধের ক্ষমা নেই এবং কোন তারতম্যও নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ ক্ষমা করেন।" (সূরাঃ নিসাঃ ৪৮)

এমনকি তিনি বলেন, আপনারা তো আপনাদের বাদশার নাম নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিচার চান এবং আপনাদের শিরকী আইন-এর নিকট আমাদের বিরুদ্ধে বিচার নিয়ে যান। আর আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর নাম নিয়ে এবং আল্লহর আইন-এর নিকটে আপনাদের বিচার চাব।

(শাইখ-এর পক্ষ হতে প্রশাসনের বিচারকদের নিকট প্রেরিত পত্র দেখুন)

উসতাদ, হানী আস-সুবায়ী হাফিযাহুল্লাহু ওয়া তায়ালাঃ

তিনি তাঁর পুস্তিকায় বিশেষকরে বলেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহর শাসন ধর্মনিরপক্ষতাবাদ এর বিপরীত। সুতরাং তার একটির অস্তিত্ব থাকার অর্থ অন্যটি অনুপস্থিত থাকা। আমরা যেন মিথ্যা রচনা ও সহাবস্থানের পদ্ধতি দ্বারা কখনো প্রতারিত না হই।

অতএব আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করা হচ্ছে দ্বীন..এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি দ্বীন...সুতরাং একটি অন্তরে ও মুসলমানদের জীবনে দু'টি দ্বীন একত্রে থাকতে পারে না। অতএব আল্লাহর শাসনের অর্থ হচ্ছে- মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রেখে জীবন যাপন করা। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর অর্থ হচ্ছে-এটার দিকে আহ্বানকারী ও এর প্রবর্তক এর সাথে সম্পর্ক রেখে জীবন যাপন করা।

নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শুধুমাত্র ফাঁকা শ্লোগান নয়, অথবা শুধু বিতর্কিত কুটতর্কের বিষয় নয়। বরং এর বাস্তব রূপ রয়েছে। আমাদের আরব ও মুসলিম জাতির জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এর শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে.....সুতরাং এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি জবরদখলকারী শাসন। এটিই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর স্পষ্ট রূপ। আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আরবের প্রতিটি ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং এটাকে ইসলামী নামকরণ করা হয়েছে– প্রজাতন্ত্র কিংবা রাজতন্ত্র অথবা আমিরাত যে পদ্ধতিতেই প্রকাশ করা হোক না কেন কোন পার্থক্য হবে না।

এখানে চিন্তামূলক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ রয়েছে। এটা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর বিপদজনক রূপ। কেননা এটা শাসন ক্ষমতার জন্য স্থান করে দেয়। এর জন্য রয়েছে তথ্য সংক্রান্ত ও সংস্কৃতি- বিষয়ক অনেক মঞ্চ। (যেমন, রেডিও, টেলিভিষণ, পত্রিকা, সাংবাদিক, সমিতি, প্রদর্শনী, সিনেমা, নাট্যশালা, প্রকাশনা ও তথ্যসূত্র.....ইত্যাদি)

শত আফসোস.....ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রকে বেষ্টন করেছে। এটা পরিণামের দিক দিয়ে অত্যন্ত ভয়াবহ, মুসলমানগণ যার মুখোমুখি হচ্ছে, যেন তারা তাদের লুণ্ঠিত হক পুনরুদ্ধার করতে না পারে।

অতএব আমাদের জীবন হতে এই দূষিত বৃক্ষের শিকড় কেটে ফেলা এবং বৃদ্ধ উটের কবরস্থানে তা নিক্ষেপ করা শরীয়াতের প্রয়োজনীয় বিষয়।

শাইখ, ডঃ মুহাম্মদ মাহমূদ আব্দুর রহীম (হাঃ)ঃ

"আত-তাহযীর মিন ফিতনাতিত তাকফীর"- গ্রন্থের লেখক তিনি শরীয়াত পরীবর্তনকারী প্রত্যেক ত্বাগুত এর সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে তার জন্য দুধ দোহনকারী নামে পরিচিত এবং তাঁর বিরোধীদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার দুশমনী প্রসিদ্ধ" শাইখ উক্ত লেখকের প্রতিবাদ করে বলেনঃ

যে ব্যক্তি জানা সত্বেও আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব বিশ্বাস করে না, তার কাফির হওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট। যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করা হালাল মনে করে। বরং যদি সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা এবং জানা সত্বেও আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা হালাল মনে করে, তার কাফির হওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট। যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস রাখে। কেননা এই বিদআতের শেষ সীমা হচ্ছে (বর্তমান যুগের মুর্জিয়াদের বিদয়াত) "মুসলমানদের পক্ষ হতে শরীয়াত সম্মত কাফির প্রতিপন্ন করার বিধানকে বাতিল করা।" এটা যদি মুর্জিয়া মাজহাব না হয়, তবে আর কে হবে?

("হাকীকাতুল খিলাফ বাইনাল সালাফি'য়া আশ-শারই'য়া ওয়া ইদ্দিইয়ায়িহা ফী মাসায়িলিল ঈমান" ৮৭, ৮৮ পৃঃ প্রথম মুদ্রণ)

শাইখ, আব্দুল হাকীম হাস্সান (আবূ আমর) (হাঃ)

তিনি তার গ্রন্থ এর তৃতীয় খণ্ডে "আত-তিবইয়ান ফী আহাম্মি মাসায়িলিল কুফর ওয়াল ঈমান" এর মধ্যে প্রশাসন বিষয়ে প্রতিকার করার লক্ষে বলেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের জন্য এমন আইন রচনা করল যার অনুমতি আল্লাহ দেননি, এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম হলো- তাদের অধিকাংশই কাফির। তারা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে নিজেদেরকে ইলাহের কাতারে দাঁড় করিয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের জন্য ওটা অনুমোদন করবে, সেও তদ্রূপ তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করল।

এতে বর্ণনা রয়েছে- যাতে কোন অপব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই- যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে নিজেকে বিধান প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠিত করে, অথবা আসমানী ওয়াহীর পরিবর্তে তার রচিত আইন গ্রহণ করতে মানুষকে ডাকে সে কাফির.....।

"শরীয়াত এর আহকাম দায়িত্বরূপে গ্রহণ না করে, তা হতে বের হয়ে যাওয়াটাই যখন কুফর, অতএব যে ব্যক্তি শরীয়াত বিরোধী আইন রচনা করে লোকদের মধ্যে এর হুকুম বাধ্যতামুলক করে দেয়, এটা লোকদের মানতে বাধ্য করে এবং যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে শাস্তি প্রদান করে? নিঃসন্দেহে সে কাফির, সে কাফির।"

(আত-তিবইয়ান ফী আহাম্মি মাসায়িলিল কুফ্র ওয়াল ঈমান, ৩য় খণ্ড, ৫৩৮, ৫৩৯পৃঃ)

শাইখ, মাহমূদ আবদুল মাজীদ (আবূ হাতিম) (হাঃ)

তিনি বলেনঃ নিশ্চয় এ সকল শাসক যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করে তারা মুসলমান নয়.....। সবচেয়ে বড় পথ, যা অত্র আয়াতটি বন্ধ করে দিয়েছে-

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

অর্থঃ "আল্লাহ কখনো মু'মিনদের উপরে কাফিরদের কোন কতৃত্ব দেবেন না।"

যাতে এ সকল কাফির মুসলমানদের শাসক না হয়।

হে মুসলিম ভাই, এ সকল মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন। যারা ইসলামী আইন ব্যতীত শাসিত হচ্ছে এমন সকল নাগরিকদের জিহাদ করতে হবে। কেননা এ সকল শাসক কাফির দুশমন, তারা মুসলমানদের দেশসমূহ ধবংসের জন্য মেতে উঠেছে। আর এটাই হচ্ছে জিহাদ ফরয়ে আইন হওয়ার ক্ষেত্র।

(আল-হিওয়ার মায়াত ত্বাওয়াগীত মাকবারাতুত দাওয়াতি ওয়াত দুয়াত, সংক্ষেপিত)

উসতাদ, আবূ আব্দুল্লাহ আস-সাদিক আমির, আল-জামায়াতিল ইসলামিয়া, লিবিয়াঃ

আল্লাহ তায়ালা তাকে হিফাযত করুন, বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান আহালুস-সুন্নাহ এর আলিমদের সম্বোধন করে তাঁর পুস্তিকায় বলেনঃ এটা এ সকল বিশ্বাসঘাতক শাসকদের বিষয় অস্পস্ট হওয়া থেকে বেশী গুরুতর, যারা ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে গেছে, তারা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল (সাঃ) এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা মুসলমানদের দ্বীন ও তাদের পবিত্র বস্তুসমূহকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করেছে। এটা মুসলিম দেশসমূহে মুরতাদ দলগুলোর হাতে ইসলামী আইন সমূহকে শুন্যকরণ হতেও বড় অপরাধ। এই দলগুলোর সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছেন, যতক্ষণ না সকল বিধান আল্লাহর হয়ে যায়.....।

আমি জানি না মুসলিম দেশে এ সকল ত্বাগুত শাসকদের কার্যকলাপ কিরূপে আপনাদের নিকট অস্পষ্ট থেকে গেল! কিরূপে আপনাদের নিকট এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুরতাদদের বিষয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল! কিভাবে আপনাদের কাছে তাদের কার্যকলাপ তালগোল পেকে গেলঃ যারা ফিত্নার ইন্ধন যোগাচ্ছে!

যারা হক্ব এর দুশমন, যারা বিভ্রান্তির অনুসারি, যারা কুফ্র ও নাস্তিকতার বিস্তারকারী। কিভাবে, অথচ তারা আল্লাহর আইনকে ফয়সালা করা হতে অপসারণ করেছে এবং এটা জঘণ্য কুফ্রী দেশীয় আইন দ্বারা পরিবর্তন করেছে। কিরূপে! অথচ তারা নৈরাজ্যবাদ ও ভাঙ্গন এর দিকে আহবান করছে, তারা পাপ ও অন্যায় কাজের অনুমোদন দিচ্ছে। কিরূপে! অথচ তারা সচেতন আলিমদের শত্রু ও সত্যবাদী দায়ীদের দুশমন। কিভাবে! অথচ তারা একত্ববাদী মু'মিনদের দুশমন, আর ইয়াহুদী, খৃষ্টান, গাভী পুজারী, মুর্তাদ ও সকল ধর্মত্যাগী দলের বন্ধু। কিরূপে! অথচ তারা ইসলামের অনুসারীদের উপর প্রভাব খাটাচ্ছে!

("আল ফাজ্র" পত্রিকা, ২৬ তম সংখ্যা, ১৭-১৯পৃঃ)

শাইখ, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ফায্যাযী আল-মাগরিবী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ "নযরাত ফীস সিয়াসাতিশ শারইয়া"- এর মধ্যে "আলা-কুফ্র কাসিম মুসতারাক বাইনা জাল্লিল আহযাব" এই শিরোনামে বলেন নিশ্চয় এ সকল দলের মধ্যে যৌথ চিন্তাই হচ্ছে কুফ্র। তাদের মধ্যে যা রয়েছে তা হচ্ছে যুদ্ধের ইন্ধন। ওরা এর দ্বারা প্রতিযোগিতা করছে, ওর সাথে এবং ওর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করছে, এর দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করছে, ওদের নিকট যা রয়েছে এ জন্য আনন্দবোধ করছে।

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অর্থঃ প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে।
(সূরা মু'মিনুনঃ ৫৩)

অন্যের নিকট যা রয়েছে তা ঘৃণা করছে।

وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ

অর্থঃ কোন কোন দল এর কোন কোন বিষয় অস্বীকার করে।
(সূরা রা'দ ৩৬)

বরং তারা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা ঘৃণা করছে। সাবধান! তারা সাংবাদিক, মুখপাত্র ও সদস্যদের দ্বারা আল্লাহর আইন এর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে, ঘৃণা করে ও হটকারিতা করে হাঁপাচ্ছে এবং এর দিকে জিহ্বা বের করে ডাকছে। তারা পশ্চাদমুখী, ও অন্ধকারমুখী বলে তাদের নাম করণ করছে। কেননা তারা তাদের দৃষ্টিতে পশ্চাদমুখী ও অন্ধকারমুখী চিন্তাধারা চাপিয়ে দিয়েছে এবং পশ্চাদমুখী ও অন্ধকারমুখী সমাজের দিকে আহ্বান করছে।

অদ্ভুত তাদের আচরণ, তারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করছে। তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদি তারা জানত কিন্তু যদি তাওবা করে তবে ভিন্ন কথা।

وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

অর্থঃ আর ঐ সব দলগুলোর যে কেউ তা অস্বীকার করে দোযখই হবে তার ঠিকানা। (সূরা হূদঃ ১৭)

হাঁ, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা, যদিও সে মাঝে মধ্যে ছালাত আদায় করে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে। যতদিন ইসলামী

আইন তার দৃষ্টিতে অন্ধকার বিবেচিত হবে এবং তার অনুসারী অন্ধকারমুখী অথবা পশ্চাতমুখী মনে হবে। সে ঐ অবস্থায় থাকবে যেমন সে তার নিয়ন্ত্রনে থাকা প্রত্যেক বিষয় দ্বারা বিবাদ করছে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তায়ালাকে বিচারক নির্ধারণ করে। আর তিনি হচ্ছেন উত্তম বিচারক। এবং যতদিন জাহেলিয়াত নেতৃত্বকারী পদ্ধতি রূপে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴿٦٠﴾وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴿٦١﴾

অর্থঃ (৬০) আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আমরা ঈমান এনেছি যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ত্বাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে। পক্ষান্তরে, শয়তান তদেরকে পথভ্রষ্ট করে (আল্লাহর আইন থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়)। (৬১) আর যখন তদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদ্দিকে এবং রসূলের দিকে এসো, তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। (সূরা নিসাঃ ৬০, ৬১)

নিশ্চয় ইসলামী বিশ্বে রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট বাস্তব রাজনৈতিক-এর সারসংক্ষেপ এই- লোকেরা বক্র জাহেলিয়াত ও একগুঁয়েমি পদ্ধতির ইচ্ছা পোষণ করেছে। তারা ধারাবাহিকভাবে দলীল পেশ করছে যে, তারা বিশ্বাস করবেনা। তারা অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াত এর ফয়সালা কামনা করছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থঃ তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে? (সূরা মায়িদাহঃ ৫০)

(নাযরাত ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়াহ, আশ-শূরা আল মুফতারা আলাইহা ওয়াদ দিমাকারাতিয়া মায়া মুনাকাশাতিশ শাইখ ইউসুফ আল-কারযাবী হাওলাশ শূরা ওয়াদ দিমাকারাতিয়া, ১৮, ৩০, ৩১পৃঃ)

শাইখ, মুহাম্মাদ আবদুল হাদী আল মিছরী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ সংক্ষেপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে- কাফির, জাহিলী ত্বাগুতি মতবাদ। لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই)- এই সাক্ষ্য প্রদানের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। দলীয়ভাবে হোক কিংবা ব্যক্তি বিশেষ হোক যে এই মতবাদ তৈরী করেছে তাতে কোন পার্থক্য নেই। নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে "স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা, আল্লাহর শরীয়াত পরিত্যাগ করে অন্য কিছুকে সালিস মানা এবং আল্লাহর পরিবর্তে ফয়সালা, আইন প্রণয়ন, আনুগত্য ও ইত্তেবা কবুল করা ত্বাগুত এর নিকট থেকে হতে হবে।"

এ অর্থে জীবনকে গাইরে দ্বীন এর উপর প্রতিষ্ঠা করা হলো। এজন্য এটা স্বাভাবিক ভাবেই জাহেলী মতবাদ। এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর জন্য এবং এই পদ্ধতি ও এটার আইন কানুন- এর জন্য ইসলামে কোন স্থান নেই। বরং কুরআনে কারীমের অকাট্য দলীল দ্বারা সে কাফির।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না সে কাফির। (সূরা মায়িদাহঃ ৪৪)

অতঃপর তিনি বলেনঃ নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জাহেলিয়াত- এর কোলে জন্ম নিয়েছে এবং জাহেলিয়াত এর কোলেই বেড়ে উঠেছে। অবশ্যই এটা স্পষ্ট কুফ্‌র। এতে কোন অস্পষ্টা, কোন প্রতারণা, কোন সন্দেহ নেই।

(মায়ালিমূল ইনতিলাকাবিল কুবরা ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়া, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭পৃঃ সংক্ষেপিত)

উসতাদ, আদ-দায়িয়াহ্ মুরশিদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে সুলাইমান আন-নাজদী (আবুল বারা)ঃ

আল্লাহ তায়ালা তাকে হিফাযত করুন, তিনি আলে সউদ-এর শাসকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ প্রত্যেক অহংকার নিয়ে তারা কুফ্‌র, ধর্মহীনতা ও আল্লাহ বিরোধী বিভিন্ন দরজায় প্রবেশ করেছে। কেননা তারা এমন আইন রচনা করেছে আল্লাহ যার অনুমতি দেননি এবং তারা এর নিকট বিচার নিয়ে যায়।

অতএব শরীয়াতের জানা বিষয় যে, চোরের হাত কেটে দিতে হবে, সামরিক হোক বা বেসামরিক নাগরিক হোক। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনদের রাজ্যে??? তারা এমন দাবী করে। এটা তাদের নিকট অচল। এজন্য তারা বিশেষকরে সেনাবাহীনিদের জন্য আইন রচনা করেছে। তারা চুরির শাস্তিকে জেল দেয়ার সাথে পরিবর্তন করে ফেলেছে। যেমন ওটা অন্যান্য রাষ্ট্রে পাওয়া যায়। যারা প্রকাশ্যে স্বরচিত আইন দ্বারা বিচার করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ তাদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। (সূরা শূরাঃ ২১)

যে কোন বিষয় হোক না কেন ত্বাগুত এর নিকট ফয়সালা নিয়ে যাওয়া আল্লাহ ও তার কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের বিরোধী। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের নিকটে ফয়সালা নিয়ে যেতে চায় আল্লাহ তায়ালা তার ঈমানের দাবী মিথ্যা বলেছেন। এটা তিনি (আল্লাহ)'ধারণা বা দাবী' বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে আইন প্রণেতা ও রচনাকারী দাবী করে এই রীতি ও মতবাদের প্রচলন ঘটালে তার অবস্থা কিরূপ হবে?

আমরা কি তার কথা বিশ্বাস করব এবং তাদের শাইখদের (সরকারী আলিম) কথা বিশ্বাস করব যে- তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তার কিতাব ও ফয়সালাকে ভালবাসেন, অথবা তার ক্ষেত্রে রব্বুল আলামীনের ফয়সালা বিশ্বাস করব যিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন বিষয় জানেন?? এছাড়া অনেক কুফরী পদ্ধতি ও মানব রচিত আইন রয়েছে-।

(আল-কাওয়াশিফুল জালি'য়া ফী কুফরিদ দাওলাতিস সাউদিয়া, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭পৃঃ সংক্ষেপিত)

শাইখ, ডঃ সালাহ আস-সাবী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ নিশ্চয় শরীয়াতকে সালিস মানা ইসলামের বন্ধন প্রমানের জন্য পূর্ব শর্ত। আল্লাহকে রব হিসেবে সন্তুষ্ট থাকা এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে নবী ও রসূল হিসেবে সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর শরীয়াত এর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা সত্য বলে মেনে নেয়া এবং এর বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হবে না। যে কেউ এর কোন একটা ছেড়ে দেবে সে কাফির হয়ে গেল। এটা দ্বীনের সত্য ও নিশ্চিতরূপে জানা বিষয়। এ বিষয়ে যুগের পর যুগ মুসলমানদের ইজমা হয়েছে। প্রবীণ ও নবীণ আহলে ইলমগণ উক্ত বিষয়ে তাদের আকিদাহ্ এর বিষয়ে সর্বদা অকট্য প্রমাণ দিয়েছেন এবং তাদের রচিত গ্রন্থ সমূহে এর বর্ণনা দিয়েছেন। ধারাবাহিক এই যুগ পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে কোন মতভেদ দৃষ্টি গোচর হয়নি।

তিনি তদ্রুপ অন্য আলচনায় বলেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা আবশ্যকরূপে গ্রহণ করতে বাধা দেবে এবং রক্ত সম্পর্কীয়, সম্পদ ও বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত অন্যের নিকট ফয়সালা নিয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে এমন আইন রচনা করে, আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি, সে তো আল্লাহর ফয়সালার বিরোধিতা করা বৈধ মনে করল, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা হালাল করে নিল, তাকে কাফির প্রতিপন্ন করা দ্বীনে ইসলাম হতে সকলের জানা কথা।

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকাম ধ্বংস করতে এবং তার শরীয়াত পরিবর্তন করার দুঃসাহস দেখাবে এবং উক্ত স্থলে মানুষের প্রবৃত্তিকে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হিসেবে হালাল করে নিবে, জাতির জন্য এর দ্বারা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবে, এর দ্বারা ফয়সালা করতে ও এর নিকট ফয়সালা নিয়ে যেতে বাধ্য করবে, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সঙ্গে শিরক করল, তার প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্বকে অস্বীকার করল।

(তাহকীমুশ শারিয়া ওয়া ছিলাতুহু বি আসলিদ দ্বীন, আস-সাবী প্রণীত, ৩১পৃঃ)

শাইখ, আলী আব্দুল্লাহ আত-ত্বানত্বাবী (রহঃ)ঃ

তিনি বিবাহ সংক্রান্ত মানব রচিত দু'টি আইনের একটির প্রতিবাদ করে বলেনঃ আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে- এই পদ্ধতি পুরাপুরি ইসলামী শারীয়াতের আহকামের বিপরীত। এই মতবাদে স্ত্রীর "জানা থাকার" সাথে ত্বালাক- এর প্রভাব নির্ভর করে। 'জানা থাকার' সীমা এভাবে নির্ধারণ করেছে- লোটারি পাবলিক এর সামনে উপস্থিত হয়ে স্ত্রীকে ত্বালাক দিতে হবে, অথবা ভরা মজলিসে স্ত্রী ত্বালাকের বিষয় ঘোষণা করতে হবে।

অথচ শুধুমাত্র স্বামী এর মুখ হতে ত্বালাক এর শব্দাবলি প্রকাশ হলেই শরীয়াত অনুযায়ী ত্বালাক হয়ে যাবে এবং এর পূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি হবে। উক্ত মতবাদ অনুসারে লোটারি পাবলিকের সামনে না হয়ে শুধু স্ত্রীর এর উপস্থিতিতে ত্বালাক প্রদান করে এবং ইদ্দত এর বিরতির সময় স্ত্রীর নিকট হতে দূরে অবস্থান করে, তবে শরীয়াত অনুসারে উক্ত স্ত্রী স্বামী এর নিকট বেগানা নারী বলে বিবেচিত হবে।

পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন অনুসারে ঐ মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করবে ততদিন স্ত্রী হিসেবে গণ্য করবে। ফলে তার ত্বালাক প্রদানকারীর জন্যে স্ত্রী হিসেবে হালাল ঘোষণা করবে। অতএব উক্ত আইন প্রণেতা আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করেদিল এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করল। কেননা এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার ত্বালাক প্রদানকারী ব্যতীত অন্যকে বিবাহ করতে চায়, তবে শরীয়াত এর অনুমোদন দিয়েছে। অথচ উক্ত আইন এটা হারাম করেছে। এমন সময়ে যদি সে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে তাকে শাস্তি দেবে এবং তার নতুন স্বামীকে দু'টি অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে (১) প্রতারণা (২) যিনা।

দ্বিতীয়, উক্ত মতবাদ হারামকে হালাল করেছে এবং হালাল বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এই অপরাধ পরবর্তীতে সম্পদ সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করে। যদি ত্বালাকের প্রদানপত্র স্বামী, স্ত্রীকে ঘোষণার মাধ্যমে প্রদানের পূর্বেই তাদের কেউ মারা যায়, তবে উক্ত আইনে স্ত্রী স্বামীর সম্পদের ওয়ারিস হবে। অথচ এমতাবস্থায় শরীয়াত অনুসারে স্ত্রী তার সম্পদের কোন ওয়ারিস হবে না।

বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। তৃতীয় পর্যায়ে এটা বংশ পর্যায়ে গড়াবে। যদি উক্ত বিরতির সময় ত্বালাক প্রাপ্ত নারী ব্যভিচার এর মাধ্যমে

গর্ভবতী হয়, তখন ত্বালাক দাতার দিকেই সন্তানের বংশ সম্পর্ক হবে। অথচ শরীয়াত অনুসারে উক্ত সন্তানের তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অবশেষে উক্ত মতবাদ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শক্তিশালী হস্তক্ষেপ করে অন্তরের অপমানের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে স্বামী তাকে ত্বালাকের ক্ষেত্রে ঝুলন্ত রেখে দেবে, সে তার স্ত্রী ও নয় এবং উক্ত আইন অনুসারে ত্বালাক প্রাপ্তও নয়।

(আল আসরাহ্ বাইনাশ শারয়ি ওয়াল কানুন, ৯২ পৃঃ)

ডঃ আদনান আলী রিযা আন-নাহবী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়াল বলেছেনঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। (সূরা আনকাবূতঃ ৬৩)

এসকল মুশরিকদের স্বীকারূক্তি করা, অর্থাৎ আল্লাহই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করেন, তিনিই সূর্য্য ও চন্দ্রকে অধীন করে দিয়েছেন, এসব কিছু ঈমানের মাপকাঠির জন্য যথেষ্ট ছিল- যে তারা মুসলমান হবে অথবা মু'মিন হবে। তারা উক্ত বিশ্বাস পোষণের সাথে সাথে অংশীদারদের উপর ঈমান আনয়ন করত। তারা আল্লাহর সকল উত্তম নামের উপর ঈমান আনতো না। অতএব তাদের ঈমান বাতিল হয়ে গেছে এবং তারা মুশরীকে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে, তারা ছালাত ও ছিয়াম এর মধ্যে এ দোষ-ত্রুটি কিছু কিছু প্রকাশ করছে। অতএব মুসলমানদের উপর ওয়াজিব, নিজেদের প্রশ্ন করে ঈমানের বাস্তব অবস্থা দেখে নেয়া। কখনো কখনো ঈমান ও তাওহীদ এর মূলনীতির উপর কিছু কিছু স্বভাব ও প্রথা প্রবল আকার ধারণ

করেছে। কখনো কখনো কেউ কেউ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ইসলামী বিধান ও 'নস' এর বিরোধিতার মাধ্যমে অপমান করছে অতঃপর তারা পথভ্রষ্টতা ও বিভিন্ন কারণ দর্শিয়ে এর অনুমোদন দিয়েছে। তাদের নিকট অভিভাকত্ব ও প্রভুত্ব এর ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ ও তাদের রব ও তাদের খালিক এর দাসত্ব করার ক্ষেত্রে খটকা করার পর এর দ্বারা তারা নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে।

নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের ক্ষেত্রে চিন্তার মুলবিষয় সম্পর্কে অশান্ত হয়েছে। এবং রব্বুল আলামীন আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন ও অনুগত হওয়ার প্রকৃত অর্থের বিলুপ্তি ঘটেছে! চিন্তা-চেতনা ও মনোযোগের মূলবস্তু গায়েব হয়েছে এবং চর্চা ও বাস্তবায়নের মূল উপাদান অদৃশ্য হয়ে গেছে। আপনি এমন অনেক লোককে দেখতে পারবেন, যারা নিম্নোক্ত প্রশ্ন করছে- আল্লাহ এটা বা ওটা কেন সৃষ্টি করেছেন? কিংবা এটা বা ওটা কেন করেছেন? ভাবটি এমন যে, তারা আল্লাহর হিসাব নিকাশ করছে! তারা যা বলে এর থেকে আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান ও অনেক বড়। আপনি এমন নারী বা পুরুষকে পাবেন, যে আল্লাহর নির্দেশকে তুচ্ছ মনে করছে। আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে রাস্তা বের করে চলছে এবং আল্লাহর আইন এর বিপরীত নিজেদের পক্ষ হতে আইন রচনা করছে। অতঃপর আপনি এর অনুসারীদের দেখবেন, তারা প্রত্যেক চিৎকার কারীর জন্য ডানা ঝাপটাচ্ছে।

নিশ্চয় অভিভাবক্ত ও প্রভুত্ব বাস্তবমূখী চিন্তা ও মানুষের বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য দাসত্বের বস্তবতা সম্পর্কে ব্যাপক অস্থিরতা বিরাজ করছে। উক্ত অবস্থার মূখ্য কারণ হচ্ছে 'অজ্ঞতা'। এছাড়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অনেক উপাদান রয়েছে।

এতদসত্বেও লোকেরা কিয়ামতের দিন উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবে না। যেদিন কোন বন্ধু অন্য বন্ধুর কোন বিষয়ে কোন কাজে আসবে না। (আয্ওয়াউ আলা ত্বরীকিন নাজাত, ৫০ পৃঃ)

ডঃ আহমাদ আল-আস্সালঃ

শরীয়াতকে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে পরিবেষ্টন করা এবং এর অনুসারীদের যে চক্রান্তের মাধ্যমে উক্ত বেদনাদায়ক অধঃপতন যা এই জাতির ঘাড়ে চেপেছে তা দুই ভাবে সংঘটিত হয়েছে।

প্রথমঃ ইজতেহাদের দরজা বন্ধ করে দেয়া। এটা ঐ সময়ের ঘটনা যখন তুর্কী জাতি উস্মানিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হানাফী মাজহাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং প্রশিদ্ধ আলিমগণের টীকাসমূহ চুড়ান্ত রূপ দিতে যেন আর পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার সুযোগ না থাকে এর ইচ্ছা পোষণ করা। এ বিষয়ে দু'টি গ্রন্থ রচনা করা হয়। (১) "কিতাবুল লালী" ও (২) "মাজমাউল বিহার।" এই অংশটিই অতী ভয়াবহ ছিল যা ফিক্হ- এর ভরা পাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং জীবন চলার পথে নিত্যনতুন সমস্যার সমাধানকল্পে শরীয়ত হতে ইজতেহাদের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়।

দ্বিতীয়ঃ দুর্বল ও ব্যর্থতার ফলাফল এবং শক্তিশালী পশ্চিমা উপনিবেশবাদ-এর দাপট। অতএব, রাষ্ট্র স্বীয় বিষয়ে পরাজিত হয়ে যায় এবং মানবরচিত আইন প্রবেশের কারণে রাষ্ট্রে বিশৃখংলা দেখা দেয়। যেমন পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জাতীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে তদনুযায়ী আমল করা যায়। আর এটা ছিল চরম অপমান ও লাঞ্ছনা। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী আইন অনুসারে সর্ব প্রথম শাস্তি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বানিজ্য বিষয়ক আইন রচনা করা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উক্ত আইন বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্রোত চলতেই থাকে।

উসমানীয় খিলাফতের অনুগত বড় বড় আরব রাষ্ট্র উক্ত ইউরোপীয় আইন গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগের মাধ্যমে লোকদের উক্ত আইন মানতে বাধ্য করা হয়। অভিশপ্ত কামাল আতাতুর্ক অস্ত্রের জোরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর নতুন ভিত্তি স্থাপন করে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে যা সকলের জানা আছে এবং সর্বদা তুর্কী মুসলিম জনতা এই জঘন্য অপরাধে পদপৃষ্ট হয়ে ডুবে আছে। সবকিছুকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে এবং তাদের আকীদাগত বিষয় এবং শরীয়া-এর সার্থে সম্পৃক্ত মানুষের সকল অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

(আস সিলসিলাহ নাহ্ওয়া হীনা মুসলিম কিতাব দাওরিল জামিয়াত আল ইসলামিয়া ফী তাত্বীকিশ শারীয়াহ ফিল মুজতামায়াতিল মুসলিমাহ, ১৪-১৯ পৃঃ সংক্ষেপিত)

উসতাদ, ইবরাহীম আল-আস্আস্ হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ ত্বাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত এই দ্বীনের দিকে নিজেকে সম্বন্ধ করা যথার্থ বলে বিবেচিত হবে না। ত্বাগুতদের শীর্ষে রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফয়সালা করে। নিশ্চয় এই মাসআলা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় শিরক। নিশ্চয় তাওহীদে উলুহিয়াত হচ্ছে ইসলামের মূল আকীদাহ। এর দিকে সর্ব প্রথম দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর দ্বারাই মাখলুককে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করা হয়। এর দ্বারাই ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব কবরের শিরকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এর মাধ্যমেই প্রসাদের শিরককে প্রত্যাখ্যান করা আমাদের উপর দায়িত্ব...।

এ যুগের সবচেয়ে বড় বিদআত হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফয়সালা করা। এ যুগের সবচেয়ে বড় শিরক হচ্ছে প্রশাসন এর ক্ষেত্রে শিরক করা। নিশ্চয় পরিস্কার ও সালাফী সহীহ আকীদা হচ্ছে- তাওহীদ উলুহিয়াহ (প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ববাদ)। আর তাওহীদে উলুহিয়াহ হচ্ছে- আনুগত্য, অনুসরণ ও নতী স্বীকার করার ক্ষেত্রে একত্ববাদ। এই তাওহীদ দ্বারাই আমরা পরীক্ষা করি, এর দ্বারাই আমরা বন্ধুত্ব স্থাপন করি এবং এর মাধ্যমেই শত্রুতা করি। "মানুষের রবের শরীয়াত দ্বারা ফয়সালা করা" এটাই আহলুস সুন্নাহ এর নিদর্শন হওয়া উচিত এবং ঐ সকল বিদআতিদের থেকে তাদের পার্থক্যকারী হওয়া উচিত যারা এসব ভয়াবহ বিষয়ের কোন একটি পরিবর্তন করে।

(আস-সালাফ্ ওয়াস সালফিউন, দ্বিতীয় মূদ্রণ ৫৭-৬২ পৃঃ কিছু পরিবর্তন সহ)

শাইখ, মুহাম্মদ মুসতাফা আল মিকরা (আবূ ইসার) (হাঃ)

তিনি বলেনঃ তাওহীদ-এর সাক্ষ্যের দাবি হচ্ছে- মুসলিম ব্যক্তি প্রশাসনের ক্ষেত্রে এক আল্লাহর নিকট আত্নসমর্পণ করবে এবং অন্য সবকিছু পরিহার করে তাঁর শরীয়াত অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। আর আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তা হল- শাসক আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করেছে এবং অন্য কিছুর মাঝে প্রবেশ করেছে। জাহেলিয়াত-এর প্রভুদের নিকটে ফয়সালা তালাস করছে। প্রকাশ্যভাবে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা ইচ্ছা শক্তি ও ক্ষমতা বিধান প্রদানের ত্বাগুত এর নিকটে বিচার নিয়ে যাওয়ার উপর সম্পন্ন হচ্ছে। আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করার পেছনে ত্বাগুত এর নিকটে ফয়সালা নিয়ে

যাওয়া ও জাহেলিয়াত- এর বিধান তালাস করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থঃ তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালা কারী কে?

(সূরা মায়িদাহঃ ৫০)

এই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী; সত্যকে ছুঁড়ে মারছে, বাতিলকে বাস্তবায়ন করছে, لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই) এই সাক্ষ্য এর দাবি হতে বের হয়ে গেছে। ত্বাগুতকে দেবতা ঘোষণা করেছে। কেননা সে পরিবর্তন করেছে, যদিও একটি বিষয় হোক না কেন, যদিও তার নিকট আল্লাহর ফয়সালাই মূল হয়ে থাকে, সে তো কুফরী করেছে ও শিরক করেছে। তার কুফ্র ও শির্ক হচ্ছে-সে আল্লাহর পরিবর্তে আইন রচনা করেছে। এবং সে প্রভূত্বের বৈশিষ্ট সমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট নিজের নফসের জন্য মঞ্জুর করেছে।

কেননা সে উক্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে, সে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট নয় এবং সে সঠিক অর্থে ও যথার্থভাবে আত্নসমর্পন করেনি। তদ্রুপ যদি সে আল্লাহর বিধান ছেড়ে দেয়া হালাল মনে করে, যদিও সে একটি বার ও একটি মাসআলায়, তবে সে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করল। বর্তমান যুগে মুর্জিয়াগণ যারা কিছু কিছু সন্দেহের কারণে শাসকদের কুফরীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রতিবাদ করে।

তিনি বলেনঃ তাদের জন্য এটা যথেষ্ট নয় কি এসকল শাসকদের আল্লাহর শারীয়াতকে অপসারণ করা এবং তদস্থলে পথভ্রষ্টতার আইন হালাল করা। এবং শরীয়ত ও এর দিকে আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও গোপনে যুদ্ধ করা, যা বলার অপেক্ষ রাখে না, ওটা কি শুধু জঘন্য অস্বীকার করার জন্য নয় যা অন্তরের বিশ্বাস শুন্যর ফল যার পেছনে কোন আমল থাকে না?

অনুরূপভাবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর পরিবর্তে ফয়সালা করা হালাল করে নেয়া যেমন প্রকাশ্যে হচ্ছে, তদ্রুপ পরোক্ষভাবেও হচ্ছে। যখন তারা ইসলামী শারীয়াত ব্যতীত অন্য মতবাদ গ্রহণ করবে, যে মূল উৎস থেকে তারা তাদের আইন প্রণয়ন করে। এ ক্ষেত্রে নুন্যতম যা বলা হয়- তারা

অন্য উৎস হতে আইন সংগ্রহ করা বৈধ মনে করে এবং আইন প্রণয়ন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর বিপরীত ফয়সালা করা হালাল মনে করে। কখনও তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফয়সালা করা বৈধ মনে করে 'হালাল কিংবা বৈধ করা' শব্দ প্রয়োগ না করেই। কিন্তু তারা কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত এর দ্বারা ফয়সালা করা উচিত বলে মনে করে.....। যখন আপনার নিকটে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল, সুতরাং শরীয়ত পরীবর্তনকারী শাসক বড় কাফির, এটা তাকে মিল্লাতে ইসলাম হতে বের করে দেবে। এ জন্য তার উপর কোন দুঃখ প্রকাশ করা যাবে না এবং কোন সম্মান প্রদর্শন করাও যাবে না। ওটা আহলে সুন্নাহ- এর কাফির ঘোষণা দেয়ার নীতি সমূহের কয়েকটি কারণ, যেগুলো আমি আমার গ্রন্থ সমূহের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি। এখানে শুধুমাত্র পাঁচটি কারন উল্লেখ করেছি, নিম্নে তা প্রদত্ব হল-

প্রথমঃ নিশ্চয় আইন রচনা করা হচ্ছে- প্রভুত্বের বৈশিষ্ট সমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট। যে ব্যক্তি নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য উক্ত অধিকার মঞ্জুর করবে, সে তো নিজেকে অথবা অন্যকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সমকক্ষ স্থির করল।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা হালাল করা এবং তিনি যা কিছু হালাল করেছেন তা হারাম করা। এটা কাফির প্রতিপন্ন করার একটি রূপ। জাহিল কিংবা অহংকারী ব্যতীত অন্য কেউ এটা অস্বীকার করে না।

তৃতীয়ঃ নিশ্চয় উক্ত পরীবর্তনকারী আল্লাহর বিধান- এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর সামনে নিজের কিংবা অন্যের মতকে প্রাধান্য দিয়ে, মাখলুক এর আইনমুখী হয়ে উত্তম সৃষ্টিকারী আল্লাহর আইনকে পেছনে ফেলে অন্যের ফয়সালাকে ভাল মনে করে।

চতুর্থঃ আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে শিরক করা, পূর্ণ তাওহীদকেই ধ্বংস করে দেয়। কেননা সে আল্লাহর রুবুবিয়াত- এর অস্বীকার করার দাবি করেছে এবং তার উলুহিয়াত- এর ক্ষেত্রে বিবাদে লিপ্ত রয়েছে ও তাঁর নাম ও গুণে কিছু মাখলুককে সমকক্ষ মনে করেছে।

পঞ্চমঃ কোন মাখলুকের জন্য অবকাশ নেই যে, সে আল্লাহর ওয়াহির বিপরীত কাজ করে, যদিও সে নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা হোক কিংবা কোন প্রেরিত নবী হোক.....।

শাইখ, আব্দুল মুনয়িম মুসতাফাহ্ হালিমাহ্ (আবু বাসীর) হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

মুর্জিয়াগণ, যারা দাবি করে এসব ত্বাগুত- এর আনুগত্য করা ওয়াজিব। কেননা তারা মুসলমানের শাসক। তাদের উক্ত দাবির প্রতিবাদ করে তিনি বলেনঃ ঐ সকল মুসলিম শাসক, ভাল কাজে যাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব, তারা হচ্ছে ঐ সব শাসক যারা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা মুসলমানদের বিচার করেন, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন এবং কাফিরদের সাথে শত্রুতা করেন, তারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ করেন। কিন্তু- এসকল ত্বাগুত যাদেরকে আপনারা মুসলমানদের শাসক বলে আখ্যায়িত করেছেন, তারা তো আল্লাহর আইনকে কাফিরদের আইন দারা পরিবর্তন করেছে। তারা এর কাছে বিচার নিয়ে যায়, এর দ্বারা ফয়সালা করে এবং লোকদের উপর এটা ফরয করে দেয়। তারা এটা লোকদের নিকট সুন্দর করে উত্থাপন করে।

তারা ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। তারা মুমিন এবং বিশেষকরে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের সাথে দুশমনী রাখে। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা বন্ধ করে দেয় এবং এটাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও সহিংস আচরণ বলে আখ্যায়িত করে। যেন লোকদের এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও তারা অশ্লীল কর্ম ও মন্দ কাজকে লোকদের চোখে সুন্দর করে দেখায় এবং এগুলোর সংরক্ষণের জন্য আইন রচনা করে। আল্লাহর বান্দাদের বিভ্রান্ত করার জন্য অস্ত্র হিসেবে মহিলাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, দ্বীনের আহকামের বিরুদ্ধে অবাধ্য হওয়ার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করে। তারা জাতিকে বিভক্ত করেছে।

বরং এক ভূখণ্ডকে পরস্পর সংঘাত ও হানাহানিতে লিপ্ত এরকম বহু কাফির ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলের জন্ম দিয়েছে, আন্দলোন করতে এবং বান্দাদের মধ্যে বাস্তব প্রয়োগ করতে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এবং দেশে দেশে তাদের ভাষায় এটাকে গণতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করছে। এসকল কাফির দলের জন্য এমন কিছু কাজ বৈধ রয়েছে যা আল্লাহর পথের দায়ীদের জন্য নেই। যদি আমরা তাদের লজ্জাজনক কাজের ও তাদের কুফরির পরীক্ষা করতে চাই, তখন আমরা তাদের দেখতে পাব তারা ঈমান বিধ্বংসী সকল কাজেই জড়িত, যা তাদেরকে মিল্লাত হতে বহিস্কার করছে।

অতএব এগুলো তাদের সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য, তা সত্বেও আপনারা তাদের সর্ম্পকে ভাল মন্তব্য করেছেন, তাদেরকে মুসলমানদের শাসক আখ্যায়িত করে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব বলছেন!

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা কখনো মু'মিনদের উপরে কাফিরদের কোন কর্তৃত্ব দেবেন না।"

অতঃপর আমাদের কাছে বিষয়টি হচ্ছে- শাসকদের নিকট হতে কিছু কিছু পাপ ও অশ্লীল কর্ম প্রকাশ পাওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, নিশ্চয় তারা এমন শাসক যাদের নিকট হতে كُفْرٌ بَوَاحٌ স্পষ্ট কুফরী প্রকাশ পেয়েছে যাতে কারো মতভেদ করা উচিত নয়।

("আল-মিনহাজ" ইসলামী ম্যাগাজিন, ৩য় সংখ্যা, ৯০,৯১পৃঃ)

তদ্রূপ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফায়সালা করে তার সর্ম্পকে চূড়ান্ত রায়" এই শিরোনামে তিনি বলেনঃ

যখন আমরা এই বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করি, অর্থাৎ ঐ শাসক যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করে তার সীমালঙ্ঘন এবং তার ক্ষেত্রে শরীয়াতের হুকুম সম্পর্কে পর্যালোচনা করি ... তখন আমরা দেখতে পাব উক্ত শাসক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পরিহার করে ফয়সালা করা হালাল মনে করেছে। বাস্তব অবস্থা ও আমলের দ্বারাই তারা এটা প্রমাণ করছে আর এটা মৌখিকভাবে প্রকাশের চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে- কিতাব ও সুন্নাহর দলীল সমূহ এবং এই উম্মাতের নির্ভরযোগ্য আলেমগনের সকল মন্তব্য একত্রে প্রমান করছে যে, সে কাফির, সে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত। এ বিষয়ে সন্দেহ করা, দ্বিধা করা ও সিদ্ধান্তহীনতার কোন অবকাশ নেই। তাকে কাফির ঘোষণা করতে ঐ ব্যক্তি দ্বিধা করবে যে বোকা গুজব রটনাকারী, কিংবা জাহিল, যে দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তি থেকে অন্ধ। ('আত ত্বাগুত' আবূ বাসীর প্রণিত, ৮২, ৮৩ পৃঃ)

শাইখ, মোহাম্মদ বুন নি'য়াত (আল-মাগরিবী) (হাঃ)

তিনি বলেনঃ শুধুমাত্র আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফয়সালা করার অনুমোদন দেয়া, অথবা আল্লাহ তায়ালার আইন ব্যতীত অন্যের নিকট ফয়সালা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া, কিংবা আল্লাহর শরীয়াত- এর নিকট বিচার নিয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ না করা, কিংবা অন্য কিছু দ্বারা এর পরিবর্তন করা 'কুফ্‌র'। কেননা 'পরিবর্তন করা' নিজের জন্য 'হালাল করার' নামান্তর। উক্ত ইরজা'ও মুর্জিয়াদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বিরত থাকুন।

(আকীদাতুস সালাফিঈন ফী মীযানী আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ, পার্শ্ব টীকা, ১০২ পৃঃ)

ডঃ মুহাম্মদ আল মিসআরী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ ফাসিক এর শাসন শরীয়াত অনুসারে অকেজো। অতএব প্রথমেই তাকে শাসন ক্ষমতা প্রদান করা যাবে না। যখন এরপর তার থেকে ফিস্‌ক প্রকাশ পাবে, তখন শরীয়াতের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি অনুসারে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব। এটা সকলের জানা কথা যে, বর্তমানে হিজরী পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সকল শাসক ফাসিক ও অপরাধী। তারা আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে এবং তার আনুগত্য করছে না। কেননা তারা কুফরি বিধান দ্বারা ফয়সালা করছে, আর ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করছে না। অতএব এ সকল শাসকের কোন প্রকার আনুগত্য করা যাবে না।

(ত্বায়াতু উলিল আম্‌র হুদূদুহা ওয়া কুয়ূদুহা, প্রথম মদ্রণ, ৫২ পৃঃ)

উসতাদ ইউসূফ আল-আযম (রহঃ)ঃ

তিনি হাফিজ ইবনে কাসীর (রহঃ)-এর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেনঃ এটা কি বর্তমান মুসলমান দেশগুলোতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না? এখানে অনেক ইয়াসিক রয়েছে এবং এখানে প্রচুর চেঙ্গীস খান বিদ্যমান। প্রত্যেক নেতা মতবাদ তৈরী করেছে এবং প্রত্যেক দেশে দল প্রণয়ন করা হয়েছে। কুরআনের পরিবর্তে এখানে বিচার চাওয়া হয়। এটা কি স্বয়ং পথভ্রষ্টতা নয়, যেদিকে হাফিয ইবনে কাসীর (রহঃ) ইশারা করেছেন?

(আল-ক্বওলুল ক্বাতি 'ফীমান ইমতানায়া আনিশ শরায়ীই, ৯৫পৃঃ)

শাইখ, আবদুর রহমান দামেশকী, হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

আবিসিনীয়দের কাফির শাসকদের ক্ষেত্রে প্রশংসা করার বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ এই কথার দ্বারা কতইনা ভাগ্যবান হয়েছে এবং এমন ফাতওয়া তাদের কতইনা প্রয়োজন। এটা তো কুরআনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ফয়সালাকেই শক্তিশালী করবে এবং মুসলমানদের দাসে পরিণত করতে তাদের ক্ষমতা প্রদান করবে। যদিও আমরা এটা মেনে নেই যে- আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালাকারী শাসক কাফির নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কুরআনকে ওর থেকে উত্তম মনে করবে সে ফাসিক থাকবে। তবে আমরা আবিসিনীয়দের নিকট আহ্বান করব আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফয়সালাকারী শাসকদের সামান্য ব্যাখ্যা প্রদান করুন! ...

যদি তারা তাদের 'ফিস্ক'- এর বিবরণ প্রকাশ না করে, বরং তারা তাদের প্রশংসা করে, তবে তাদের ক্ষেত্রে হুকুম হচ্ছে- তারা মুনাফিকের দল, মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তো তাদের মধ্যকার একজন।"

প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে সে ভালবাসে তার সঙ্গেই তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে। (আল-হাব্শী শুয়ূযুহু ওয়া আখতাউহু, ৬৯-৭১পৃঃ)

তদ্রূপ তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর ওয়াহী অনুসারে আমল করা বাধ্য করে। এবং পরবর্তীতে এটা ব্যতীত ত্বাগুত- এর বিধানকে অস্বীকার করাকে তার নিকট দাবী করে। কেননা একই সময়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর প্রতি ঈমান এবং ত্বাগুত- এর আবিস্কৃত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা একত্র হওয়া অসম্ভব। কেননা যে ব্যক্তি শাহাদাতাঈন-এর স্বীকৃতি দিয়েছে সে তো আল্লাহর পরিবর্তে যার পূজা করা হয় তা অস্বীকার করতে আদিষ্ট হয়েছে।

যেমনঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহর পরিবর্তে যার পূজা করা হয় তা অস্বীকার করবে, তার মাল ও রক্ত হারাম হয়ে যাবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য কিছুকে সালিস মান্য করাকে গাইরুল্লাহ্র ইবাদাত করা বলে। কেননা আনুগত্য করা ইবাদতের একটি শ্রেণী। এ জন্য আল্লাহর অবাধ্যতায় পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের আনুগত্য করাকে তাদের ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

(মাওসূআতু আহলিস সুন্নাহ ফী নাকদি উসূলি ফিরকাতিল আহ্বাশ ওয়া মান ওয়াফাকাহুম ফী উসূলিহিম, ২য় খণ্ড, ১২৭৫পৃঃ)

শাইখ, আহমাদ আবূ লাবান (রহঃ)ঃ

মুসলিম শাসকদের ক্ষেত্রে শরীয়াতের হুকুম সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে কাফির হয় তাকে হত্যা করা বৈধ কি না? এর উত্তরে তিনি বলেনঃ তাকে হত্যা করা শুধু বৈধ নয়, বরং তাকে শরীয়াত অনুসারে হত্যা করা ওয়াজিব। মুসলমানদের যে দলই হোক না কেন, তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা ওয়াজিব। তাকে শুধু একাই নয়, বরং তার সকল ভাইকেও হত্যা করতে হবে। অর্থাৎ ঐ মুরতাদ শাসকেরা যারা লোকদের জন্য নতুন দ্বীন রচনা করেছে, বান্দাদের অসম্মান করেছে এবং নগরসমূহ ধ্বংস করেছে।

উসতাদ, উমার আবদুল হাকিম (আবূ মুসআব, সিরিয়া) (হাঃ)

তিনি বলেনঃ বর্তমান সময়ে আমাদের দেশগুলোতে মুসলমানদের শাসকেরা যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর আহকাম সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস করে দিয়েছে। নিজেদের জন্য এবং স্বীয় জাতির জন্য এমন বিধান গ্রহণ করেছে যা প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য কিংবা নিজের প্রবৃত্তি হতে আমদানি করেছে। এর দ্বারা তারা বর্তমান কালের ইয়াসিক শুরু করেছে। এটা চেঙ্গীস খাঁন এর ইয়াসিক থেকে বেশী জঘণ্য যেন এর মাধ্যমে রক্ত সম্পর্কীয়, মালসম্পর্কীয় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ফয়সালা করতে পারে।

উক্ত অপরাধে তারা মুরতাদে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের মিল্লাত, মিল্লাতে ইবরাহীম হতে বের হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কাফির, যালিম ও ফাসিক। এটা তাদের বড় অপরাধ। আর কুফ্র এর চেয়ে গুরুতর কোন গুণাহ নেই।

...তারা দায়ীদেরকে গৃহ হতে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের পিছু নিয়েছে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের হত্যা করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। অতএব, তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছে এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এটা তো তাদের ধৃষ্টতা, ঘৃণা ও অহংকারই বৃদ্ধি করেছে।

(আত-তাজরিবাহ্ আল-জিহাদিয়া ফী সূরিয়া, ২য় খণ্ড, ১০৮, ১০৯পৃঃ)

শহীদ, (আমরা অনুরূপ ধারনা করি) আবূ উসায়িদ, সিরিয়া (রহঃ)ঃ

তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি নিজের জন্য জীবন চলার পদ্ধতি আবিস্কারের অধিকার প্রদান করবে অথবা আইন প্রণয়নের অধিকার দেবে, সে মূলত শিরক করল এবং আল্লাহর সঙ্গে কুফ্রী করল। এবং সে তার প্রবৃত্তিকে মাবূদরূপে গ্রহণ করল। এমনকি যদিও সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর উপর ঈমানের দাবী করে। কেননা সে নিজের জন্য এমন অধিকার প্রদান করেছে, যা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। তা হচ্ছে বান্দাদের উপর ফয়সালা করা।

যেমন ফিরআউন তার জাতিকে বলেছিল- مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِى

অর্থঃ "আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই।"

এর মাধ্যমে সে এটা প্রমাণ করাতে ইচ্ছা করেনি যে, সে সব কিছু সৃষ্টি করেছে, অথবা সে সূর্য্য বা চন্দ্রের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, কিংবা নীল নদের প্লাবন তার ক্ষমতায় রয়েছে। এ অর্থে মানুষের ইবাদত তার জন্য ছিল না। সে তো ইচ্ছা করেছিল, সে একমাত্র অনুসরণ যোগ্য, কেননা তার ক্ষমতা ও দাপট রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ وَلٰكِنَّهُمْ اَطَاعُوْهُ - "কিন্তু তারা তার আনুগত্য করেছে"- ঐ বিষয়ে সে আইন রচনা করেছিল।

অতএব, এই উম্মাতের যে কেউ ফেরআউন- এর উক্ত স্থলে নিজেকে স্থাপন করবে (আইন প্রণয়নকারীর স্থলে) সে তো নিজেকে তাদের সামনে ইলাহ হিসেবে দাঁড় করাল। এবং যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তার আনুগত্য করবে, সে আল্লাহর পরিবর্তে তার ইবাদত করল।

(আল-হুক্ম ওয়া তাকফীরুশ শিরক; আত-তাজরিবাহ আল-জিহাদিয়া ফী সুরিয়া, ২য় খণ্ড, সহ, বাবুল হুক্ম আলা হুক্কামিল ইয়াউম)

শাইখ, আবদুল মালিক আল-বার্‌রাক হাফিযাহুল্লাহ্ তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ মানবরচিত আইন দ্বারা ফয়সালা করা আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি শরীয়াত প্রণয়ন করার নামান্তর। উক্ত বিষয় শিরক হওয়ার সম্বন্ধে কেউ মতভেদ করেনি। নিঃসন্দেহ সংবিধান ও মানবরচিত আইন এক প্রকার ত্বাগুত। তদ্রুপ যে শাসকেরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করে না তারাও ত্বাগুত। কেননা তারা উক্ত সংবিধান প্রণেতাদের নিকট ফয়সালা নিয়ে যায়। অতঃপর তারা লোকদের মধ্যে ওটা সালিস মান্য করার মাধ্যমে অনুসরণ করে এবং এটা তাদেরকে বাধ্য করে দেয়। এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, বিচার চাওয়া এক প্রকার ইবাদত। সুতরাং যে বক্তি ত্বাগুত এর নিকট বিচার প্রার্থনা করবে সে তার ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ত্বাগুত এর ইবাদত করল, সে আল্লাহর সাথে শিরক করল।

ঐ সকল শাসক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শরীয়াত অনুযায়ী ফয়সালা করে না তাদের কাফির ঘোষণা করার অনেক দলীল বিদ্যমান যা গণনা করা অসম্ভব। কেননা ঐ সকল সংবিধান এবং মানবরচিত আইন হারাম বস্তুকে হালাল করেছে। যেমন, যখন উভয়ের সম্মতিক্রমে যিনা সংঘটিত হবে তখন

তা বৈধ হবে, সুধ, মদ ও জুয়ার অনুমোদন প্রদান করেছে। এগুলোর জন্য ভবন নির্মান করেছে এবং এগুলোর জন্য বিশেষ আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে, এ সকল হালাল করে নেয়ার দলীল।

(ডঃ আল বূতী প্রণীত গ্রন্থ 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' -এর প্রতিবাদে লিখিত গ্রন্থ রুদুদ আল আবাতীল ওয়া শুবহাত হাওলাল জিহাদ, ২৪৬-২৪৮ পৃঃ)

শাইখ, মুহাম্মাদ জামাল ইমরান আল কারশী (হাঃ)

নির্ভেজাল তাওহীদ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীত ফয়সালা করার হুকুম আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন; তিনি এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ এর কল্যাণ কামনা এবং উক্ত বিষয়ে কিছু কিছু বড় মাপের শাইখদের গুঞ্জন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। .....আল্লাহ সুবহানাহু যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা না করার মাসআলা, কিতাব ও সুন্নাহ এর মধ্যে বর্ণিত সীমা উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করছে। উক্ত মাসআলার পূর্বে প্রথমে জানতে হবে- আমাদের ইমান হচ্ছে, বলা ও আমল করা, এটা বাড়ে ও কমে। এবং এর জন্য কিছু শর্ত, কিছু রুক্ন ও কিছু বিনষ্টকারী বিষয় রয়েছে। এবং নিশ্চয় কুফ্র বলা ও আমল করাকে বলে। আর কুফরে আকবার হচ্ছে- উক্তিমূলক ও কর্মমূলক বিষয়। এবং কুফরে আসগার হচ্ছে- উক্তিমূলক ও কর্মমূলক। যে ব্যক্তি এর বিপরীত ধারণা করেন তার কথা ভিন্ন। আর এটাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের পথ।

.....দ্বিতীয় মাসআলাঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা মূলত 'কুফর'। কেননা এটা জাহেলিয়াত ও ত্বাগুত-এর ফয়সালা।

.....তৃতীয় মাসআলাঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফয়সালাকারী শাসক, তার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে- যদি তার নিকট আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করা মূল বস্তু হয়, [১]এবং কিছু কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়, তখন আমরা প্রশ্ন করব, এটি কি সে হালাল মনে করেছে কি না? এটা ছোট কুফ্র না বড় কুফ্র।

[১]. উক্ত হুকুম বর্তমান যুগের শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা তাদের সুন্দর লিপিবদ্ধ সংবিধান ও কর্ম পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু শাইখ উক্ত কায়িদা নির্ধারণ করেছেন। আর তাঁর আলোচনার মধ্যেই দলীল বিদ্যমান।

.....চতুর্থ মাসআলাঃ যখন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালাকারী শাসক ওটা কর্মপদ্ধিতি নির্ধারণ করবে এবং আইন রচনা করবে, তবে সে কাফির ও মূরর্তাদ যদিও উক্ত আইন তার ফয়সালার উপর প্রাধান্য না পায়। বরং আমার বক্তব্য হচ্ছে- যদি সে আইন এর মাধ্যমে সুদ হালাল করে নেয়, ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ সকল ব্যাংক সংরক্ষণ করে, সুদ ভিত্তিক আইন প্রণয়ন করে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা দ্বীনে ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে যাবে। যদিও সে এর পর ইসলাম দ্বারা ফয়সালা করে, সালাত আদায় করে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।

('নিদাউল ইসলাম' ম্যাগাজিন, ১২ তম সংখ্যা, ২০ পৃঃ)

শাইখ, আবুল ওয়ালিদ আল-আনসারী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

"উবাদাহ (রাঃ)-এর হাদীসে উল্লেখিত মানব রচিত আইন দ্বারা ফয়সালা করা কুফর" এই শিরোনামে উল্লেখ করেছেনঃ মুসলিম দেশ সমূহ সর্বদা এই বন্দী দশায় পদদলিত হচ্ছে। মুসলমানদের সন্তানেরা এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে বা বন্ধুত্ব স্থাপন করার উপক্রম হচ্ছে। এমনকি উক্ত বিষয় তাদের অন্তরে হালাল মনে হচ্ছে, এর ভয়াবহতা কম মনে হচ্ছে, উক্ত বিষয়ের সমালোচকদের তারা ঘৃণা করছে! .....এমন কি সে বাতিল দ্বারা বকবক করছে....!!

এতদসত্ত্বেও সঠিক উপলব্ধিকারী ও ধার্মিক কিছু ব্যক্তি বিদ্যমান, যারা বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ও অশ্লিল কর্ম হতে বারণ করেন....। ঐ বিষয় যার দ্বারা কর্দমার আর্দ্রতাই বৃদ্ধি হবে, বোকাদের নির্বুদ্ধিতাই বৃদ্ধি পাবে যাদেরকে ইল্ম- এর দিকে সম্বন্ধ করা হয় (তথাকথিত আলিম) তাদের অনেকেই কিছু কিছু সংশয় দ্বারা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেন যে, উক্ত মানবরচিত বিভিন্ন আইনকে সালিস মান্য করলে কাফির হবে না, দ্বীন হতে মুরতাদ হয়ে যাবে না। উক্ত কর্মের দ্বারাও সে মুসলমান থাকবে। যদিও তার নিকট উক্ত ফয়সালা পৌঁছে থাকে। যেন এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর শরীয়াত এর বিপরীত ফয়সালাকারী শাসকের জন্য ওযর হিসেবে মেনে নিচ্ছে।

ঐ পাগলের ক্ষেত্রে বিস্মিত হতে হয়। আপনি তো তাওহীদের অধ্যায়ের একটি অধ্যায় লক্ষ্য করেন না, এর মাসআলা সমূহের একটি মাসআলার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না। তার চতুর্দিকে সন্দেহ, সংশয় ও কল্পনা নাড়া দেয়

যেমন ঐগুলো এই অধ্যায়ের চারপাশে নাড়া দিচ্ছে। অথচ কিতাব ও সুন্নাহ প্রমাণ করছে এটা হক্, এক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, এর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। এবং লোকেরা দ্বীনের মৌলিক বিষয় ও শাখাগত বিষয়ে যে মতভেদ করছে, সেটা কিতাব ও সুন্নাহ এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

অর্থঃ "তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, এর মিমাংসার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর।" (সূরা শূরাঃ ১০)

অর্থাৎ উক্ত বিষয় ছোট হোক কিংবা বড় হোক। আল্লাহর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। (নিদাউল ইসলাম ২৭ তম সংখ্যা, ১৭পৃঃ)

তদ্রূপ তিনি বলেনঃ দ্বিতীয়তঃ এটা আপনার নিকট অধিক বিপদের কারণ ও অধিকতর শক্ত, বরং আল্লাহর কসম, ওটা বড় ভয়াবহ বিষয়। আপনি কি উক্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত? তা হচ্ছে- বর্তমান যুগের কাফির নেতাগণ মুরতাদদের পদস্থ ব্যক্তিবর্গ স্থায়ীভাবে ইয়াহুদীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছে। আপনি বিশ্বাস করুন, যদি আল্লাহ তায়ালা নির্বাক চতুস্পদ জীব-জন্তুকে কথা বলার ক্ষমতা প্রদান করতেন, তবে তারা অবশ্যই বলত যে, এটা বড় অপবাদ এবং এই একক দ্বীনের আইন- এর সঙ্গে অস্বীকার করার সামিল। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর দ্বীনের উপর তার শরীয়াতের উপর অথবা মুসলমানদের দেশে এবং তাদের রক্ত ও সম্পদের উপর আক্রমণ করে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এই উম্মাতের যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

("আল-মিনহাজ" ম্যাগাজিন, ১ম সংখ্যা, ৪৭পৃঃ)

তিনি অন্যত্র বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে শির্ক ও কুফরী করা, তার দ্বীনের সাথে যুদ্ধ করা, তার ওয়ালীদের সাথে বিরোধিতা করা, জঘণ্য কাজ। এর সমকক্ষ কোন অন্যায় কর্ম নেই। যদিও এটা অন্তরকে ধ্বংস করে এবং শরীর নষ্ট করে দেয়।

এজন্য আল্লামা, শাইখ, সা'দ ইবনে হাম্‌দ ইবনে আতীক (রহঃ) "আদ-দুরারুস সুন্নিয়াহ" গ্রন্থের ১০ম খণ্ডে, ৫১০পৃঃ বলেনঃ যদি গ্রাম্য ও

শহরের অধিবাসী লড়াই করে সকলেই নিহত হয় তবে তাদের বিশ্বে ত্বাগুত প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে ওটা হালকা অপরাধ। যে ত্বাগুত ইসলামী শরীয়াত যা দ্বারা রসূল (সাঃ) কে প্রেরণ করা হয়েছিল তার বিপরীত ফয়সালা করবে।

অনুরূপ তিনি বলেনঃ মোটকথা, এই মহান দ্বীন ও এই মজবুত শরীয়াত ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের বাস্তব কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ দু'টোর অকল্যাণ প্রতিহত করে।

('আল-মিনহাজ' ম্যাগাজিন ২য় সংখ্যা, ৭৫পৃঃ)

শাইখ, বাশার ইবনে ফাহ্দ আল-বাশার হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি দশটি জিনিসকে ইসলাম ধ্বংসকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মেধ্যে যেটি বেশী ভয়াবহ এবং বেশী সংঘটিত হয় তা হচ্ছে চতুর্থ প্রকার ধ্বংসকারী বস্তুঃ নিশ্চয় যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে, নবী (সাঃ)- এর বিপরীত হিদায়াত তার হিদায়াত হতে পরিপূর্ণ। অথবা অন্যের বিধান তার বিধান থেকে সুন্দর। যেমন ঐ ব্যক্তি যে ত্বাগুত এর বিধানকে তার বিধান এর উপর প্রাধান্য দেয়, তবে সে কাফির....।

এই মাসআলা অর্থাৎ "আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা" মুসলিম দেশগুলোতে উক্ত বিপদ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অতএব তালিবে ইলম ও আলিমদের দায়িত্ব হবে, তারা লোকদের মধ্যে উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান প্রচার করবে। যেন লোকেরা এ সকল শয়তানদের সম্পর্কে জানতে পারে, যারা মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে বসেছে এবং তাদের মধ্যে ইউরোপীয় আইন, অথবা সুইজারল্যান্ড এর আইন কিংবা অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করছে। এটাও জানতে পারে যে, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর সাথে দুশমনী করা। এবং এটা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লাহ এর সাথে কুফরী করা।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা দুই প্রকার। (১) বড় কুফ্‌র, যা তাকে মিল্লাত হতে বের করে দেবে। (২) ওটা অপরাধ করা। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ অপরাধ করাঃ যেমন, কোন ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অথবা ঘুষ নিয়ে, কিংবা অন্য কোন কারণে কোন একটি মাসআলায় আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করে, সে তো বড় অপরাধ করল।

কিন্তু সে উক্ত অপরাধে কুফ্‌র এর ঐ সীমায় পৌঁছবে না, যা তাকে মিল্লাত থেকে বের করে দেয়....।

কিন্তু বড় কুফ্‌র যা তাকে মিল্লাত থেকে বের করে দেবে। এটা কয়েক প্রকার। কিছু বিশ্বাসগত, কিছু কর্মমূলক। কিন্তু বিশ্বাসগত কুফ্‌র, এখানে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি মানবরচিত আইনকে শরীয়াত হতে উত্তম বিশ্বাস করবে, অথবা মানব রচিত আইন শরীয়াতের সমপর্যায়ের, কিংবা মানবরচিত আইন অনুসারে আমল করা বৈধ বিশ্বাস করবে। যদিও সে শরীয়াতকে উত্তম মনে করে।

অতঃপর শাইখ বাশার বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে রক্ষা করুন। এখানে কর্মমূলক শিরক রয়েছে। আর 'কর্ম' অন্তরে যা লুকায়িত রয়েছে। তার উপর প্রমাণ করে।

বিষয়টি এমন নয়, যেমন বর্তমান যুগের মুর্জিয়াগণ বিশ্বাস করে। অর্থাৎ, কর্ম অন্তরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এজন্য তারা কর্মমূলক কুফ্‌রকে কখনো বড় কুফরি বলে গন্য করে না। অতএব কুফ্‌র যখন কর্ম থেকে উদ্ভুত হবে, এটা ওদের নিকটে ছোট কুফ্‌র বলে বিবেচিত হবে, যা তাকে মিল্লাত থেকে বের করে দেবে না। যে ব্যক্তি তাদের পক্ষ সমর্থন করে তাকে আমরা বলব, আপনারা ঐ সকল শাইখদের নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করুন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি কারো বল প্রয়োগ ব্যতীতই পূর্ণজ্ঞান সহকারে এবং পরিপূর্ণ ইচ্ছা শক্তি নিয়ে কুরআন শরীফকে পদদলিত করল, আপনাদের নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে হুকুম কি???

যদি তারা উত্তরে বলে উক্ত কর্ম তাকে মিল্লাত হতে বের করে দেবে না, যতক্ষণ না সে বলবে, আমি এই কিতাবকে ঘৃণা করি। তবে তারাও তদ্রূপ কাফির। ঐ বিষয়ে তাদের মতে আমাদের কোন আলোচনা নেই। যদি তারা উত্তরে বলেন, উক্ত অপরাধের দ্বারা তাকে কাফির প্রতিপন্ন করা হবে, উক্ত কুফ্‌র তাকে মিল্লাত থেকে বের করে দেবে।

আমরা তাদের জিজ্ঞেস করবঃ আপনারা তার বিরুদ্ধে কিরূপে কুফ্‌র-এর হুকুম দিলেন, সে কুফরী আমল করলেও, সে এটা অন্তর দ্বারা হালাল মনে করেনি? প্রমাণতো এটাই হবে সে সর্বদা তার ইসলাম প্রকাশ করছে এবং রোযা ও এর মত দ্বীনি অনুষ্ঠানের কিছু কিছু আমল করছে?

যখন আপনি তাদের নিকট থেকে উত্তর গ্রহণ করবেন, তখন জানতে পারবেন, তারা এমন কথা বলে যা তারা জানে না, এমন বিষয়ে বকবক করে যা তারা চেনে না। কিংবা আপনি জানতে পারবেন তারা মুর্জিয়াদের সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যেমন শাইখ, আবূ কাতাদাহ ফিলিস্থীনী (হাফিযাহুল্লাহু তায়ালা) এবং অন্যান্য মুওয়াহ্‌হিদ ভাই বহুবার এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এরপর আপনি জানতে পারবেন, নিশ্চয় আমরা নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী ইনশাআল্লাহ তায়ালা এবং আমরা খারিজী নই যেমন তারা ধারণা করে।

অতঃপর শাইখ বাশার হাফিযাহুল্লাহু তায়ালা বলেনঃ অন্তরে যা নিহিত রয়েছে আসল কর্মই তা প্রমাণ করবে। এবং প্রত্যেক পাত্রে যা রয়েছে তাই সে বের করে দেয়।

অতএব, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করবে, যেমন শাইখ, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) তাঁর পুস্তক 'তাহকীমুল ক্বাওয়ানীন'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেনঃ সবচেয়ে বড় কুফ্‌র; আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর সাথে সবচেয়ে বড় দুশমনী এবং 'মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল'-এই সাক্ষ্য প্রদান এর সবচেয়ে বিরোধী বিষয় হচ্ছে- আল্লাহর শরীয়াত- এর অনুরূপ আইন রচনা করা, এর জন্য মূল উৎস থাকবে। এবং এর জন্য কিছু গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র থাকবে, যেমন আলিমগণ উলামাদের গ্রন্থ, কিতাব ও সুন্নাহ এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুতরাং এমন সংবিধান রচনা করা, যেদিকে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে, এবং এর নিকট বিচার নিয়ে যেতে এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করতে লোকদেরকে বাধ্য করে, এরপর কোন কুফ্‌র নেই। এটা শির্‌ক এরপর কোন শির্‌ক নেই। এটা আনুগত্য এর ক্ষেত্রে শির্‌ক এবং আইন রচনার ক্ষেত্রেও শির্‌ক। আল্লাহর ফয়সালার বিপরীত কোন একটি অংশে হলেও মুসলমানদেরকে বাধ্য করা, যেন তারা এর নিকট ফয়সালা নিয়ে যায় এবং এটা যেন তাদের জন্য ব্যাপক আইনরূপে পরিগণিত হয়..... তবে উক্ত বাধ্যকারী আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লাকে অস্বীকার করল।

কেননা সে আল্লাহ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালার সঙ্গে নিজেকে শরীয়াত প্রণেতারূপে দাঁড় করাল। একটি অংশ হোক না কেন, যখন সে এটা বাধ্য করবে এবং ব্যপকরূপ দেবে, তখন সে গুণাহর সীমা হতে বের হয়ে কুফ্‌র-এর সীমায় পৌঁছে যাবে। কেননা বাধ্য করতে এবং আইন প্রণয়ন করতে

কোন পার্থক্য নেই যে- পুর্ন সংবিধান শরীয়াত- এর বিপরীত হবে, অথবা এর কিছু অংশ বিরোধী হবে এবং কিছু অংশ- সামঞ্জস্যপুর্ণ হবে।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস কর ও কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই। এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে, এবং তোমরা যা করছো আল্লাহ তদ্বিষয়ে অমনোযোগী নন। (সূরা বাকারাঃ ৮৫)

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীত ফয়সালা করা যেটা গোণাহের কাজ এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা যা কুফ্র, যখন এই দুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, যে প্রকার গুণাহরূপে বিবেচিত হবে উক্ত বিষয়ে পূর্বের কিছু কিছু আলিমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা ছোট কুফ্র। কেননা পূর্বের কোন আলিমই ঐ সময় এমন কথা চিন্তা করতে পারেননি যে, একদিন আইন রচনা করা হবে এবং তা মুসলমানদের বাধ্য করা হবে আর কিতাব ও সুন্নাহকে একপার্শ্বে ছুঁড়ে মারা হবে। হাফিয ইবনে কাসীর (রহঃ) চেঙ্গিস খান ও তাঁর ইয়াসিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কর্ম করবে এবং যে ব্যক্তি এর নিকট ফয়সালা নিয়ে যাবে, সে মুসলমানদের ইজমা অনুসারে কাফির। এবং কিতাব ও সুন্নাহ এর দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

অতএব, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি, যে ইয়াহুদিয়াত ও নাসরানিয়াত হতে আইন গ্রহণ করছে না (ইয়াসিক এর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে, যা ইয়াহুদিয়াত, নাসরানিয়াত এবং মিল্লাতে ইসলাম ও চেঙ্গিস খান-এর কিছু কিছু মতাদর্শ হতে গ্রহণ করা হয়েছিল) বরং সে দ্বীন বিদ্বেসী, এবং সকল ধর্ম হতে মুক্ত হয়ে অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও তাদের অনুরূপ অন্য কিছু মতবাদ গ্রহণ করেছে? ("নাওয়াকিযুল ইসলাম" টেপ প্রথম অংশ)

শাইখ, আব্দুল আযীয মুসতফা কামিল হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ ত্বাগুত-এর ফয়সালা করা প্রতিষ্ঠিত করা ও বাধ্য করা এর উপর রাষ্ট্রের সংবিধান দৃঢ় করা, যেটা মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার করে। এর মাধ্যমে বাস্তবে ও সরাসরি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষের কাছে ন্যস্ত করা হয়। অতএব বলা হয়, "রাষ্ট্রে ফয়সালা করার ক্ষেত্রে আইন-এর প্রধান্য থাকবে" আরো বলা হয়ঃ "আইন-এর উর্ধ্বে নেই।"

মানবরচিত দ্বীনে আশ্চর্যজনক প্রথা হচ্ছে- রাষ্ট্রে স্বীয় মানবরচিত আইন দ্বারা ফয়সালা করার জন্য মহান আল্লাহর নামে শাসকদেরকে উক্ত আইন এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়, অথচ এর মাধ্যমেই মহান আল্লাহকে অস্বীকার করা হচ্ছে। .....এটাকে তারা সাংবিধানিক শপথ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। অতঃপর শাসক কমিশনের সামনে কসম করে বলেঃ আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, সংবিধান এবং মানবরচিত আইন-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব। (আল-কামূসুস্ সিয়াসী, ১৭৭৬ পৃঃ)

এটা ঐ সময়ে হয়ে থাকে যখন তারা নিশ্চিতরূপে জানে উক্ত সংবিধান মৌলিকভাবে এবং শাখাগতভাবে আল্লাহর আইন-এর বিপরীত ও বাধাদানকারী .....।

এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে- নিশ্চয় শাসকেরা ও মানবরচিত আইন-এর কাছে বিচার প্রার্থনাকারীগণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞসারে মানবরচিত দ্বীন আলিঙ্গন করে নেয়, এর সুসংবাদ দেয়, বরং এটাকে বাধ্য করে দেয়...।

(আল-হুকুম ওয়াত তাহাকুম, ১ম খণ্ড, ২৮৯ পৃঃ)

শাইখ, আব্দুল্লাহ আত-দামীজী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

"হুকমু সিয়াসাতিদ দুনয়া বিগাইরিদ্ দ্বীন" এই শিরোনামে তিনি বলেনঃ এখন আমরা জানতে পারলাম, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শরীয়াত-এর ব্যপকতা রয়েছে। যে ব্যক্তি এই দ্বীন অনুসারে দুনিয়াতে শাসন করে না তার হুকুম জানা বাকী থাকল। অন্যভাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর দ্বীনকে সালিস মান্য করে না এবং এটাকে মানব রচিত আইন দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে। উক্ত বিষয়ের হুকুম সম্পর্কে আমাদের বেশী কষ্ট করতে হবে না। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বহুসংখ্যক স্পষ্ট আয়াতে উক্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন।

তন্মধ্যে একটি হচ্ছে-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ত্বাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (আল্লাহর আইন থেকে) অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়।

(সূরা নিসা ৬০)

তাঁর বাণীর ব্যাখ্যা প্রদানের প্রথম মুহূর্তেই প্রকাশ পাচ্ছে- يَزْعُمُونَ ("তারা দাবী করে")- এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আল্লাহর শরীয়ত- এর বিপরীত অন্যের নিকটে ফয়সালা নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের ঈমানকে বাতিল করে দিয়েছেন। এটা এজন্য যে, কোন বান্দার অন্তরে ঈমানের সাঙ্গে আল্লাহর শরীয়ত- এর বিপরীত অন্যের নিকটে ফয়সালা নিয়ে যাওয়া কখনো একত্র হতে পারে না। বরং একটি অন্যটির বিপরীত। ত্বাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত বাস্তবে কোন ঈমান অর্জন হবে না।

যেমন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেছেনঃ

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ত্বাগুতকে অস্বীকার এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আকড়িয়ে ধরল, যা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা বাকারাঃ ২৫৬)

আর এটাই لَا إِلَـهَ إِلَّاللَّهُ (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই)-এর ভাবার্থ।

(আল ইমামতুল উযমা ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়া ১০১ পৃঃ)

মুহাম্মাদ বিন হামিদ আল হুসাইনী (রহঃ) (আবূ আম্মার)

তিনি বলেছেনঃ আমরা একটি পিচ্ছিল পথে অবস্থান করছি যা ইসলামী দেশসমূহের শাসকদের উপর প্রবল আকার ধারণ করেছে এবং তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামের প্রথম বিষয় হচ্ছে শাহাদাতাঈন এর উচ্চারণ করা। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আনিত সবকিছু গ্রহণ করা, এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, এবং ওটা মেনে নেয়া। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুসলিম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐগুলো সংরক্ষণ করবে। অতঃপর যখন ঐ ব্যক্তি রসূল (সাঃ)- এর আনিত কোন বিষয়কে প্রত্যাখান করা প্রকাশ করবে এবং এর অনুসরণ করতে অস্বীকার করবে, অথচ সে জানে উক্ত বিষয় রসূল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার একটি এবং এর দিকে আহ্বান করবে, তবে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। উক্ত প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট কথার মাধ্যমে হোক কিংবা এমন আমলের মাধ্যমে যা ওটার উপর প্রমাণ করে, এতে কোন পার্থক্য হবে না।

আর এটাই মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ শাসকদের থেকে সংঘটিত হচ্ছে। কেননা তারা কিতাবুল্লাহ ও তাঁর নবীর সুন্নাহ অনুসারে ফয়সালা করতে অস্বীকার করছে। এছাড়া তারা এই কুফ্র- এর সঙ্গে অন্য একটি কুফ্র যুক্ত করেছে। তা হচ্ছে- তারা নিজেদের পক্ষ হতে আইন রচনা করে আল্লাহর আইন-এর স্থলাভিষিক্ত করেছে। তারা এর নিকটে বিচার চায় এবং এর নিকটেই তারা লোকদের আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়। এটাকে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিংবা ঐ ব্যক্তির পক্ষ হতে যে ব্যক্তি এই মানবরচিত আইন তাদের জন্য প্রণয়ন করেছে আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

অতএব তারা একত্রে দু'টি কুফ্র করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর শরীয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর পরিবর্তে রব গ্রহণ করা। এখানে বাস্তবে এটাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যা অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই- তারা আল্লাহর শরীয়াতকে পরিহার করেছে এবং এর নিকটে বিচার নিয়ে যেতে অস্বীকার করেছে। তারা এমন মতবাদ গ্রহণ করেছে যা মানুষ রচনা করেছে, এবং এটাকে মানুষের মধ্যে ফয়সালাকারী বিধান নির্ধারণ করেছে।

(আত-ত্বারীক ইলাল খিলাফাহ, ৪০, ৪১পৃঃ)

শাইখ, আহমাদ আব্দুস সালাম শাহীন হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মানবরচিত মতবাদ যা নিয়ে গর্ব করে এর সংজ্ঞা প্রদান করার পর তিনি বলেনঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাঠামো পরীক্ষা করার পর এবং এই বিষয়গুলো মিসরের সংবিধানে বিদ্যমান, এই আইন-এর কুফরী ও শরীয়াতের বিপরীত হওয়ার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।....

কেননা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেনঃ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থঃ "বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।"

অথচ ৬৪ নং ধারায় তারা বলেঃ রাষ্ট্রে বিচার করার মূলে আইন- এর প্রধান্য থাকবে। ৩ নং ধারায় তারা বলেঃ একমাত্র জনগণের হাতেই কর্তৃত্ব থাকবে, এতে অন্যের কোন অংশ থাকবে না।..... এ সকল লোকেরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে বিধান রচনা করে লোকদের তা মানতে বাধ্য করছে ও তাদের ঘাড়ে কুফ্র চাপিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ "তাদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।"

(সূরা শূরাঃ ২১)

.....অথচ তারা তাদের পক্ষ হতে আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়ে আল্লাহর জন্যে বহু দেবতা নির্ধারণ করেছে।

অতএব প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে তার জন্য আল্লাহর পরিবর্তে আইন রচনার অধিকার থাকবে, যেমন **১১২ নং ধারায়** উল্লেখ রয়েছে। এবং আল্লাহর পরিবর্তে গণপরিষদের আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে, যেমন **৮৬ নং ধারায়** উল্লেখ রয়েছে, জনগণেরও আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে। এর কাছেই সাধারণ লোকদের বিষয় সমূহ উত্থাপন করতে হবে, যাতে সে এর অনুমোদন করবে অথবা প্রত্যাখ্যান করবে।

এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, এরা সকলেই আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ এবং তাদের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার রয়েছে, যেমন সংবিধানের বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে। ......তারা নির্লজ্জভবে ঘোষণা করছে যে, তারা

আল্লাহর পরিবর্তে অইন রচনা করে এবং ফয়সালা করার মূলে আইন- এর কর্তৃত্ব থাকবে, গণপরিষদের জন্য আইন রচনার অধিকার থাকবে, এবং প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে।

আমরা কিরূপে এমন মতবাদকে কাফির ঘোষণা করার ক্ষেত্রে ইতস্তত করতে পারি? অথচ তারা উক্ত কুফ্রকে প্রচার করছে এবং এটাকে আইনে পরিণত করে লোকদের তা মানতে বাধ্য করছে, এটাকে বিচারক নির্ধারণ করেছে। যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা বিরোধিতা করে তাকে হত্যা করছে, অতএব এর চেয়ে বড় মুর্তাদ আর কে হতে পারে?

(ফাতহুর রহমান ফির রাদ্দি আলা বায়ানিল ইখওয়ান, ১৪০-১৪২ পৃঃ)

শাইখ, আব্দুল কারীম আশ-শাজনী (আবু উবাইদাহ্) (হাঃ)

তিনি বলেনঃ আল্লাহর বিধান হতে বিচ্যুত হয়ে মানবরচিত আইন-এর দিকে প্রতাবর্তন করা এটা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশে তাতারদের একটি দলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যারা ইয়াসিক দ্বারা বিচার করত।

বাস্তবে তাতারগণ ইয়াসিক দ্বারা ফয়সালা করাকে মুসলমানদের উপর ফরয করেনি বরং তারা নিজেদের মাধ্যে এর দ্বারা বিচার করত। যেমন ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেনঃ এটা তার সন্তানদের মধ্যে অনুসরণীয় আইন-এর রূপ ধারণ করে, এটাকে তারা ফয়সালা করার ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ- এর উপর প্রাধান্য দিত।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ২য় খণ্ড, ৬৭ পৃঃ)

তদ্রুপ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া মন্তব্য করেছেনঃ তারা নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম দ্বারা ফয়সালা করা আবশ্যক মনে করত না। (মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮ তম খণ্ড, ৫০৫ পৃঃ)

অথচ তার যুগেও তাদের শাসনাধীন প্রত্যেক দেশে আল্লাহর বিধান দ্বারাই ফয়সালা করা হত (যেমন, ইরাক, সিরিয়া, খোরাসান)। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানব রচিত কুফরী আইনকে মুসলমানদের উপর ফরয করে দেয়া হচ্ছে!! অতএব সাদৃশ্য বিধান করার ও কিয়াস করার কোন সুযোগ নেই।

(আর রদ্দুল মামূন, ৮, ৯পৃঃ)

আবূ কুতাইবাহ আশ-শামী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ নিশ্চয় বর্তমান সময়ের মুসলিম দেশগুলোর শাসকেরা প্রত্যেকেই ত্বাগুত, মুর্তাদ ও কাফির। সকল দ্বার দিয়ে তারা ইসলাম হতে বের হয়ে গেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরীয়াতকে মানবরচিত আইন দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। শয়তান এবং তাদের ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান প্রভুরা তাদেরকে এটা লিখে দিয়েছে। তারা আল্লাহর ওয়ালিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে।

আল্লাহর বান্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে, ধন-সম্পদ লুন্ঠন করে এবং পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করে। মুওয়াহ্হিদ মুসলমানদের সামনে লৌহ ও অগ্নি ব্যতীত আর কিছু বাকী নেই, নবুওয়াতের আদর্শে খিলাফত আনয়ন-এর জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। ....আমাদের পূর্ববর্তী ন্যায়নিষ্ঠ আলিম এবং মুজাহিদ ভাইগণ এ সকল শাসকদের কাফির হওয়া সম্পর্কে শরীয়ত-এর দলীল বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা এসকল ত্বাগুত মর্তাদকে কুফ্র-এর সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন বিষয় ছেড়ে দেননি। তাদের কাফির হওয়া সম্পর্কে প্রবৃত্তি পূজারী অথবা যে ব্যক্তি ওয়াহির নূর হতে নিজের অন্তরকে অন্ধ করে রেখেছে সে ব্যতীত অন্য কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। .....

পরিশেষে আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি যেন ত্বগুত-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কল্পনা শক্তিকে ধারালো করে দেন এবং সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করেন, এবং তাদেরকে পরাজিত করার জন্য মুজাহিদীনদের হাতে ক্ষমতা প্রদান করেন, তখন আল্লাহর সাহায্য পেয়ে মুমিনগণ আনন্দিত হবে। পূর্বের ও পরের সকল ক্ষমতা আল্লাহর জন্যই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝেনা।

(তাহরীযুল মুজাহিদীন আলা কিতালিত ত্বাওয়াগীত আল মুর্তাদীন,৩-৫পৃঃ)

শাইখ, মুহাম্মাদ বাদরী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

"আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করি" এই শিরনামে বলেনঃ কেননা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ স্পষ্ট কুফ্র, যেমন আমরা এর স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছি। এটা হচ্ছে, দ্বীনকে পরিত্যাগ করে অন্য কিছুর উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা অথবা রাষ্ট্র হতে দ্বীনকে পৃথক করা। অর্থাৎ এটা হচ্ছে আল্লাহর

নাযিলকৃত বিধাণ- এর বিপরীত ফয়সালা করা, তার সুবহানাহু- এর শরীয়া এর বিরোধী জিনিসকে সালিস মান্য করা এবং গাইরুল্লাহর নিকট হতে বিধান ও আইন গ্রহণ করা।

এজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে- কোন কিছু বাদ না দিয়ে ব্যাপকভাবে আল্লাহর বিধানকে পরিহার করা। তার কিতাব ও নবীর সুন্নাহ- তে বর্ণিত বিধানের উপর অন্য মতবাদকে অগ্রাধিকার দেয়া। এবং শরিয়াতে বিদ্যমান এরকম প্রত্যেক বিষয় শূন্য করে দেয়া। বরং বিষয়টি দলীল দেয়ার সীমায় পৌছে গেছে যে- মানবরচিত আইন আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান-এর চেয়ে উত্তম..... এক্ষেত্রে দলীল প্রদানকারীদের দাবী হচ্ছে- শরীয়তের বিধান নাযিল হয়েছিল সময়ের আলোকে, কোন কারণবশত এবং বিভিন্ন সমস্যা-এর জন্য যা ফুরিয়ে গিয়েছে। অতএব ঐগুলোর সমাপ্তির সাথে সাথে সকল বিধান বাতিল হয়ে গেছে..... নিশ্চয় মানবরচিত বিধান- এর ক্ষেত্রে হুকুম সূর্যের ন্যায় পরিস্কার, আর তা হচ্ছে স্পষ্ট কুফ্র, যাতে কোন অস্পষ্টতা ও প্রতারণা নেই।

(উমদাতুত তাফসীর, আহমাদ শাকির প্রণীত, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৭, ১৭২ পৃঃ)

এটা আমাদের কোন মনগড়া মতামত নয়, অথবা কোন আলিম কিংবা কোন মুফাস্সির এর মত নয়, কিংবা ফুকাহাদের কোন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত নয় যা আমরা বর্ণনা করছি। এটা তো অকাট্য দলীল, যাতে অপব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই এবং দ্বীনের আবশ্যকীয় জানা বিষয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা কাফির। (সূরা মায়িদাহ ৪৪)

অতএব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীত ফয়সালা করে এটা কোন গুনাহের কাজ নয়, বরং এটা স্পষ্ট কুফ্র..... এবং কুফ্রকে গ্রহণ করা ও এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাটাও কুফ্র..... উক্ত কারণে আমাদের জন্য প্রয়োজন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে প্রতাখ্যান করা, যেন আমরা আল্লাহর দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং আমাদের জীবনে ইসলামী বৈশিষ্টকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি।

(লিমাযা নারফিযুল আলমানিয়াহ্, ১০৫-১১৫ পৃঃ)

শাইখ, আবুল ফযল উমার আল-হাদূশী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ .....শির্ক এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, এর মাধ্যে প্রবেশ করা, এর সংরক্ষণ করা, সবচেয়ে বড় শির্ক। এটা তাকে মিল্লাতে ইসলাম হতে বের করে দেবে। সুতরাং নবী ও রসূল এবং সালাফদের পদ্ধতি হচ্ছে- যে ব্যক্তি উক্ত পরিষদে প্রবেশ করে অথবা এগুলো সংরক্ষণ করে, তার থেকে মুক্ত হওয়া, যেমন গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা হয়।

অতএব, আমরা বলছিঃ আইন রচনা করার মহান দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব এক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তির তাওহীদ সহীহ্ বলে প্রমাণিত হবে না। আমরা আরো বলছিঃ বিবাদের সময় এককভাবে তাঁর আয়াতকে মহান বিধান, অকাট্য প্রমাণ এবং চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনস্থল না মান্য করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তির তাওহীদ বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত হবে না। আপনাদের তাওহীদও সহীহ্ বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ না আদেশ, নিষেধ, হালাল ও হারাম করার অধিকার সংসদের না হয়ে এক আল্লাহর জন্য হয়।

বরং কিতাব ও সুন্নাহ- এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আপনাদের ভাষায় "জাতির ইচ্ছা"- এর অনুসারে হয়ে না যায়। তাদের রচিত মতবাদ এবং ধর্মহীন মানবরচিত মতবাদের উপর ইসলামী শরীয়াতের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের তাওহীদ মূল্যহীন হয়ে যাবে। এটা আল্লাহর আইন-এর ক্ষেত্রে হুবহু শির্ক করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থঃ "বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কাউকে অংশিদার স্থাপন করেন না" (সূরা কাহ্ফ ২৬)

(আল-ক্বওলুস সাদী ফী মায়ালিমিত তাওহীদ, দ্বিতীয় মূদ্রণ, ১৪১৭-১৯৯৮; ৩৩ পৃঃ)

শাইখ, আব্দুল হামীদ ইবনে উমার সারহান (হাঃ)

তিনি বলেনঃ আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা- এর কিতাবে অনেক 'নস' বিদ্যমান, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, নিশ্চয় যে শাসক আল্লাহর বিধান পরিহার করেছে, এটাকে অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, এর জন্য আইন রচনা করেছে, আল্লাহ যার পক্ষে কোন প্রমাণ

অবতীর্ণ করেননি, তবে সে ব্যক্তি মুশরিক, কাফির, মিল্লাতে ইসলাম হতে বহির্ভূত।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ তাদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। (সূরা শুরাঃ ২১)

অতএব ঐ সকল লোক যারা আইন রচনা করেছে, তারা ত্বাগুত ও ভণ্ড দেবতা। আর যারা তাদের রচিত আইন এর অনুসরণ করেছে তারা মুশরিক। কেননা আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। এতে কারো অংশীদার দাবী করা কিংবা ঝগড়া করা উচিত নয়। যদি কেউ এমন কাজ করে তবে সে নিজেকে ইলাহ বানিয়ে নিল। প্রত্যেক ব্যক্তির তাকে অস্বীকার করা ওয়াজিব। বরং তাকে অস্বীকার করা ব্যতীত প্রথমে তার ইসলাম প্রমাণিত হবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ত্বাগুতকে অস্বীকার এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আকড়িয়ে ধরল, যা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা বাকারাঃ ২৫৬)

("ওয়া মাল্লাম ওয়াহকুম বিমা আনযালাল্লাহু ফা উলাইকা হুমুল কাফিরুন" গ্রন্থ; প্রণেতা, আবদুল হামীদ ইবনে উমার ইবনে সারহান, ৩১ পৃঃ)

তিনি আরো বলেনঃ এ বিষয়ে অনেক আয়াত বিদ্যমান, যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর পরিবর্তে অন্য দেবতা গ্রহণ করা কুফ্র এবং মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা বুঝায়। আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে- মানবরচিত আইন, যা কাফির ও মুশরিকগণ রচনা করেছে। অতএব যারা এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয় এবং এর প্রতি সমর্থনের জন্য লোকদের কাছে গণভোট চায়, তাদের এবং উক্ত বিষয়ে এদের যারা আনুগত্য করবে এদের কাফির হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। (পূর্বের গ্রন্থ, ৩৮পৃঃ)

শাইখ, যিয়াউদ্দীন আল কুদসী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াতের পরিবর্তে জাতির জন্য আইন রচনা করল এবং সে স্বীকার করল যে, এটা তার পক্ষ থেকে অথবা অন্যের পক্ষ হতে রচিত। বর্তমানে আমরা এমন শাসক লক্ষ্য করছি, সে সকল দলের নিকট এবং মুসলমানদের সকল আলেম- এর নিকটে কাফির, ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।

(আল-হুক্‌ম লিল্লাহ শাইখ যিয়াউদ্দিন আল কুদসী প্রণীত, ৮২,৮৩পৃঃ)

শাইখ, সুলাইমান ইবনে নাসির ইবনে আবদুল্লাহ আল উল্‌ওয়ান হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীত ফয়সালাকারী শাসকের কুফ্‌রী, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও ফিরেস্তাকে অস্বীকার করবে-এর চেয়ে হালকা। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয়, উক্ত শাসক মুসলমান এবং তার কুফরী ছোট কুফ্‌র। সাবধান! বরং সে শরীয়াতকে অপসারণ করার জন্য দ্বীন হতে বহিস্কৃত। ইবনে কাসীর (রহঃ) উক্ত বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন, দেখুন, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ১১৯ পৃঃ।

(আত-তিবইয়ান শারহু নাওয়াকিযিল ইসলাম লিল ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ); গ্রন্থকার, সুলাইমান ইবনে নাসির ইবনে আবদুল্লাহ আল উল্‌ওয়ান, পার্শ্ব টীকা, ৩৮পৃঃ)

শাইখ, সাইয়্যিদ আল-গাব্বাশী (রহঃ)ঃ

তিনি বলেনঃ নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা-এর শরীয়াতকে অপসারণ করবে এবং নিজের পক্ষ থেকে লোকদের জন্য আইন রচনা করে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করবে, যেমন আল্লাহর নির্দেশে উক্ত বিষয় আপনার নিকটে স্পষ্ট এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, তার সাথে যুদ্ধ করে, তার কাফির হওয়া সমন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এবং যে ব্যক্তি এর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, এর আনুগত্য করবে এর পূর্ণ কিংবা আংশিক অনুসরণ করবে, তাদের কাফির হওয়া সম্পর্কে কোন সংশয় নেই।

কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াত- এর বিপরীত অন্য মতবাদ-এর অনুমোদন দেবে সে ব্যক্তি ইজমা অনুসারে কাফির। যেমন ইবনে হাযম ও ইবনে তাইমিয়া বর্ণনা করেছে। শানকীত্বী বলেনঃ “আল্লাহর বিধান-এর ক্ষেত্রে শিরক করা, আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শিরক করার অনুরূপ।” আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

অতএব উক্ত স্থানের দায়িত্ব গ্রহনকারী শাসক হোক, কিংবা প্রতিষ্ঠানের আকারে কোন সংস্থা হোক, অথবা সংবিধান রচনার কোন পরিষদ হোক কোন পার্থক্য হবে না।

(“আল ক্বাওলুস সাদীদ ফী বায়ানী আন্না দুখূলাল মাজলিস মুনাফিন লিত্তাওহীদ” এটা শাইখ, সাইয়্যিদ আল গাব্বাশ রচিত “ইবলাগুল হাক্ব ইলাল খালক”-এর সংক্ষিপ্ত রূপ; এটা শাইখ, আবু মোহাম্মদ আল মাকদিসী সংক্ষেপ এবং সমীক্ষা করেছেন, ১০ পৃঃ)

শাইখ, মুহাম্মদ আবুল ফাত্হ আল-বানূনী (হাঃ)

তিনি বলেনঃ এখান থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে যে- বর্তমানে বহু সংখ্যক মুসলমানের আল্লাহর বিধানকে মানবরচিত মতবাদ দ্বারা পরিবর্তন করা, যা তাদের নেতাগণ তৈরী করছে, যা তারা তাদের জ্ঞান ও প্রবৃত্তি হতে সংগ্রহ করেছে এবং এটাকে আল্লাহ আয্যা ও জাল্লা-এর আহকাম-এর উপরে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দিচ্ছে, এই লোকেরা ঈমানের বন্ধন ছিন্ন করে বের হয়ে গেছে।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থঃ অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না- যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক না করে, অতপর তুমি যা বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করে। (সূরা নিসাঃ ৬৫)

আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে- মুসলমানগণ শরীয়াতকে সালিস মানার ক্ষেত্রে অন্যদের অন্ধ অনুসরণ করে। অথচ তারা প্রভুত্ব ও শাসন ক্ষমতার প্রতি ঈমান আনয়ন করে। তারা এটা প্রবৃত্তি ও গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। যারা এর মাধ্যমে স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে দিতে চায় তারা ধারণা করে এর দ্বারা তারা ঈমানের সীমা হতে বের হয়ে যাবে না। সাবধান! এ বিষয়ে মুসলমানদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং তাওবাহ করে নত হয়ে স্বীয় রবের কাছে ফিরে আসা উচিত যেন তাদের জন্য ঈমানের বৈশিষ্ট্য নষ্ট না হয় এবং তাদের সম্মান ও নেতৃত্ব তাদের কাছে ফিরে আসে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থঃ তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে? (সূরা আল মায়িদাঃ ৫০)

("আল হুকমুত তাকলীফী ফিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া" মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্হ বানূনী প্রণীত ২৩পৃঃ)

শাইখ, আবূ ইস্‌রা আল আসীওয়াত্বী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তিনি বলেনঃ আমরা বলছি, যে শাসক আল্লাহর পরিবর্তে আইন প্রণয়ন করে তার ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি প্রয়োগ হওয়া সম্ভব বলে আমরা মেনে নেব? সুতরাং যে কোন ইনসাফকারীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে- বর্তমান যুগে আমাদের শাসকদের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করবে। যারা বহুবার কুফরে আকবারে লিপ্ত হয়েছে যা তাদেরকে মিল্লাত হতে বের করে দেবে।

এটা এজন্য, তাদের অবস্থার লক্ষণ সর্বদা এটা প্রমাণ করছে না যে, তাদের উপর প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশী প্রবল হয়েছে, যে জন্য তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান- এর বিপরীত ফয়সালা করেছে, অথচ তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করে এবং তারা এটাও স্বীকার করে যে, এজন্য তারা গুণাহগার হবে এবং শাস্তিযোগ্য হবে। বরং আমি বলছি, এ সকল শাসকদের উত্তম অবস্থা হচ্ছে সে গণতন্ত্র সম্পর্কে কথা বলে। অর্থাৎ সে বলে আমি জনগণের সঙ্গে আছি। অতএব যদি সে শরীয়াতে ইসলামীয়াকে পছন্দ করে তবে আমি এ বিষয়ে কখনো নিষেধ করব না। অতএব যে ব্যক্তির এটাই উত্তম অবস্থা তবে সে কাফির, মিল্লাত হতে বহির্ভূত।

(ওয়াকফাত মায়াশ শাইখ আল আলবানী হাওলা শারীত "মিন মিনহাজিল খাওয়ারিজ" ১৫পৃঃ)

শাইখ, আবদুল কারীম আস সা'দি (আবূ মিহজান) আনসার জোটের আমীর, লেবানন, হাফিযাহুল্লাহু তায়ালাঃ

তাঁর কিছু ভাইদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে যে- তিনি বিশ্বাস করেন, বর্তমান যুগে মুসলিম দেশগুলো শাসনকারী সকল মতবাদ কাফির। কেননা তারা রহমানের শরীয়াত অনুযায়ী ফয়সালা করে না। তারা শরীয়াতের ফয়সালাকে মানবরচিত আইন দ্বারা পরিবর্তন করেছে। যেটা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করতে এবং তিনি যা হালাল করেছেন তা হারাম করতে তৎপর, আর এটা কুফ্র। এ সকল মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গনতন্ত্রের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠীত। আর এটা হচ্ছে জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন। এটা স্পষ্ট কুফ্র।

(এটা টেলিগ্রাফের পত্রিকা হতে প্রকাশিত, সিডনী, তাং ১৬/০৪/১৯৯৭)

উসতাদ, আহমাদ আল খালায়িলাহ (আবূ মুসআব) (হাঃ)

তিনি বলেন, হে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর পরিপন্থি ফয়সালাকারী বিচারক! যখন আপনি এটা জানতে পারলেন এবং আপনার নিকটে প্রকাশ পেল যে- নিশ্চয় স্পষ্ট কুফ্র এবং প্রকাশ্য শিরক হচ্ছে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে আইন প্রণেতা গ্রহণ করা। উক্ত আইন প্রণয়নকারী আলিম হোক, কিংবা শাসক হোক, কিংবা প্রতিনিধি হোক অথবা কোন গোত্রীয় নেতা হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। এবং আরো জানলেন যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কিতাবে শিরক- এর সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্যে তিনি ইচ্ছা করেন। (সূরা নিসাঃ ৪৮)

অতঃপর আপনি আরো জানলেন, আপনাদের মানবরচিত সংবিধানের ২৬ নং ধারা অকাট্যরূপে প্রমাণ করছে যে, নিশ্চয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বাদশা ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের জন্য মুক্ত থাকবে এবং আইন রচনা ও ইত্যাদির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংবিধানের জন্য ওয়াকফ থাকবে। আপনি আরো জানতে পারলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে এই নতুন দ্বীন আল্লাহর দ্বীন ও তার তাওহীদ ধ্বংসকারী স্পষ্ট কুফ্রকে কবুল করবে, সে তো আল্লাহর পরিবর্তে এ সকল আইন প্রণেতাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করল এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে তাদেরকে শরীক করল।

(আল-মিনহাজ ম্যাগাজিন, ১ম সংখ্যা, ৫৫পৃঃ)

উসতাদ, মুহাম্মাদ ত্বাহা আত-ত্বারাবলিসী (হাঃ)

"আল-আনযিমাতুল হাকিমাতু ফিল আলামিল ইসলামী" উক্ত শিরনামে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ হয়েছে.... উক্ত ফাহ্দ আলে সউদ, আল্লাহ তার উপর লা'নত করুন, পূর্বপুরুষদের ন্যায় সেও তেল সম্পদ লুণ্ঠিত করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করছে, যেন এর দ্বারা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ক্রুশ- এর রাজত্ব শক্তিশালী করতে পারে এবং আল্লাহর পবিত্র ভুমি অপবিত্র করার জন্য তাদের সেনাবাহিনী ডেকে আনতে পারে। এবং কাফির আইন দ্বারা সৌউদি রাষ্ট্রের হানাহানি লাগানো যায়, মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা যায়। যারা বিভিন্ন ভাষাভাষি যারা কাজের সন্ধানে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র হতে আগমন করেছে, যাদেরকে তারা বিদেশী বলে আখ্যায়িত করে।

এটা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করার জন্য সম্ভব হয়েছে। বিশেষকরে পবিত্র ভুমির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সম্ভব হয়েছে। যে ভুমি আমাদের নির্ভেজাল দ্বীনের উৎস। এটা এ জন্য যে, এ স্থানে প্রবেশের জন্য ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ এ সময় বিদেশীদের জন্য বিশেষ করে আমেরিকান ও ইংরেজদের জন্য বিষয়টি সহজ করা হয়েছে। এ সকল মুরতাদ শাসকদেরকে মিথ্যা কথা জানা এবং রাজনীতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু দুষ্ট পন্ডিত রাষ্ট্রে পুরোহিত এর আসন গ্রহণ করেছে এবং জুমআর খতীবদেরকে তাদের সম্পর্কে দোয়া ও প্রশংসা করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করুনঃ তাদের সম্বন্ধে আমাদেরকে এমন একদিন দেখিয়ে দিন, যে দিন তারা ইসলামের রিসালাত- এর সঙ্গে খিয়ানত করার মূল্য পরিশোধ করবে!

("আল-মিনহাজ" ম্যাগাজিন, ৩য় সংখ্যা, ৯৫পৃঃ)

উসতাদ, আবূ আয্যাম আশ-শানক্বীত্বী (হাঃ)

তিনি বলেনঃ বরং ঐ সকল বিষয় সীমালজ্ঘন করেছে। অতঃপর আল্লাহর হুকুমাত ও শরীয়তের সীমা ছেড়ে গেছে। ইসলামী বিধানকে মানবরচিত আইন দ্বারা পরিবর্তন করেছে। আগুন ও লোহার (অস্ত্র) জোরে লোকদের উপরে তা ফরয করে দিয়েছে। বিষয়টি এমন পর্যায়ে গড়িয়েছে- যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে তাকে বহুবিধ শাস্তি ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। অতএব ইসলামের গুরবাত (একাকীত্ব) মজবুত হয়েছে। সত্যের রাস্তা জনশূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু ছোট দল ব্যতীত তাদেরকেউ এদিক ওদিক দিয়ে তারা দংশন করছে।

তারপর তিনি আরো বলেনঃ এ সকল ত্বাগুতদের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করা আবশ্যক, যারা তাদের কুফ্র, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীত ফয়সালা করা, দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, এবং খেত ও বংশ ধ্বংসের মাধ্যমে ইসলামী দেশেও তাদের আদর্শের উপর ক্ষমতা দখল করেছে। নিশ্চয় সাধারণ মুসলমানগণের স্বীয় দ্বীন সম্পর্কে অবগত হওয়ার সকল মাধ্যম বন্ধ করা হয়েছে। তাদের অন্তরে উক্ত ত্বাগুত- এর ব্যক্তিত্বকে উজ্জল করা হয়েছে। হক্বপন্থিদের দেখানো হয়েছে তারা সামান্য চোরের দল, তারা বাহিরের ভাড়ার গোলাম। এর মাধ্যমে তারা স্বীয় আসন ও ক্ষমতাই মযবূত করেছে।

আল্লাহর কসম! এটাই হচ্ছে সকল ত্বাগুতদের দ্বীন। ফেরআউন কি মুসা ও হারুনকে বলেনি যে-

وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ

অর্থঃ "এদেশে তোমাদের বড়ত্ব হয়ে যাবে??"

অতএব আমাদের এ ত্বাগুতগুলোকে লাঞ্চিত করা, তাদের রহস্য ও কুফ্র ফাঁস করে দেয়ার কামনা করা উচিত। এবং এর সাথে লোকদের জন্য আওয়াজ বুলন্দ করা উচিত, যেন আল্লাহ পবিত্র বস্তু হতে অপবিত্র বস্তু পৃথক করে দেন। (মাজাল্লাতুল ফাজর, ৪৮তম সংখ্যা, ৩৬, ৩৮পৃঃ)

ঐ সকল আলিমদের নাম- এর তালিকা
যাদের মতামতের প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি

আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় আমরা আহলুস্ সুন্নাহ- এর কিছু সংখ্যক শাইখ ও দায়িদের তালিকা প্রদান করছি, যারা স্বীয় ভাই শাইখদের অনুরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

* শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, তিনি স্বীয় গ্রন্থ "মুহাররামাত ইসতাহানা বিহান্নাস ইয়াজিবুল হায্র মিনহা"- এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

* শাইখ, আবূ আব্দুল্লাহ আহমদ (রহঃ) যিনি উপদ্বীপে সশস্ত্র ইসলামী জামায়াতের প্রথম আমীর ছিলেন। তিনি উক্ত বিষয়ে তার কিছু প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

* শাইখ, আব্দুল্লাহ আন-নূরী (রহঃ), "সাআলূনী" ১ম খণ্ডে উক্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন।

* শাইখ, আনওয়ার শা'বান, শাইখ মারওয়ান হাদীদ (রহঃ)-এর পুস্তিকায় উক্ত বিষয় আলোচনা করেছেন।

* শাইখ, আহমাদ আল-মাহাল্লাবী, তিনি উক্ত বিষয় জুময়ার কোন এক খুতবায় উল্লেখ করেছেন।

* শাইখ, ফাতিহ; কুরাইযার উত্তর ইরাকের কুর্দিস্থানের ইসলামী আন্দোলনের একজন দলপতি, তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন এক সময় বর্ণনা করেছেন।

* শাইখ, ডঃ আলাউদ্দীন খারুফাহ্, তিনি স্বীয় গ্রন্থ "মুহাকামাতু আরায়িদ দাওয়ালিবী মুসতাশার খাদিমাল হারামাঈন"- এর মধ্যে আলোচনা করেছেন।

* উসতাদ, আহমাদ আমীন আবদুল গাফ্ফার, তিনি স্বীয় গ্রন্থ "আল জাহেলিয়াহ কাদীমান ওয়া হাদীসান"- এর মধ্যে উক্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন।

* শাইখ, জুহাইমান (রহঃ), তিনি স্বীয় একটি টেপে এর বর্ণনা দিয়েছেন।

* শাইখ, ত্বাহা মুহাম্মাদ, তিনি স্বীয় পুস্তিকায় "ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ- খুতওয়াত আলাত ত্বরীক" এই শিরোনামে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

* উসতাদ, উমার রাশিদ, মুখপাত্র, যুদ্ধরত জামায়াতে ইসলামী লিবিয়া; তিনি মিশরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কে স্বীয় মন্তব্যে উক্ত বিষয় আলোকপাত করেছেন।

* উসতাদ, মুহাম্মদ কাযিম হাবীব, তিনি স্বীয় গ্রন্থ "আর রিদ্দাতু বাইলাল আম্স ওয়াল ইয়াউম"- এর মধ্যে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

* উসতাদ, আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ, তিনি স্বীয় বক্তব্য "আল-ই'লামুল আলমানী ওয়া দাওরুহ ফী হারবিস সাহওয়াতিল ইসলামিয়া" এই শিরোনামে উক্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন।

* শাইখ, মুহাম্মদ আলী আলহিনদী, তিনি স্বীয় গ্রন্থ "আইয়ুহাল মুহাল্লিফূনা আসসুলতানু লিল্লাহিল ওয়াহিদ আদ দাইয়ান লা লিল ইনসান"- এর মধ্যে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন।

* উসতাদ, সামী আত্বা হাসান, তিনি স্বীয় গ্রন্থ "ফাসলুল মাকাল ফীমা বাইনাল আলমানিয়া ওয়াল মা'সূনিয়া মিনাল ইত্তেসাল"- এর মধ্যে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

* শাইখ, ডঃ সাইয়িদ মুহাম্মদ নূহ, তিনি স্বীয় গ্রন্থ "হাজাতুল বাশারিয়া আল-ইয়াউম ইলাল হুক্মি বিমা আনযালাল্লাহু কিতাবান ওয়া সুন্নাহ"- এর মধ্যে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

* শাইখ, আব্দুল গনী আর রিখাল, তিনি স্বীয় গ্রন্থ "আল ইসলামিউনা ওয়া সারাবুদ দীমক্রাতিয়া- দিরাসাতান উসূলিয়াহ্ লিমুশারাকাতিল ইসলামিঈন ফিল মাজালিসিন নিয়াবিয়া"- এর মাধ্যে উক্ত বিষয় আলোচনা করেছেন।

* উসতাদ, আবূ ইনসাফ, "মিনহাজি'য়া আত তাগয়ীরিল ইসলামী" নামক প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

('আল-ফাজর' ম্যাগ্যজিন, ৪৭ তম সংখ্যা)

* উসতাদ, ইউসুফ মানছুর, তিনি স্বীয় প্রবন্ধ 'আল আমালুল জামায়ী'- এর মধ্যে উক্ত বিষয় আলোচনা করেছেন।

('আল-ফাজর' ম্যাগ্যজিন. ৪৭ তম সংখ্যা)

* শাইখ, সায়ীদ আল হাম্মাদী, তিনি স্বীয় প্রবন্ধ "আহকামুল জিহাদ বাইনান নাসয়ি ওয়ান নুসখি"-এর মধ্যে উক্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন।

('সাওতুল হাক্ব' ম্যাগাজিন ৮১ তম সংখ্যা)

* উসতাদ, মুহাম্মদ আব্দুস সালাম খালীল, "আল-মিনহাজুল ইসলামী' ম্যাগাজিন ১ম সংখ্যা এর মধ্যে তিনি এর আলোচনা করেছেন।

* আল-আসাতিজাহঃ আব্দুল্লাহ আল ওয়ায্যাফ, আহমাদ সালামাহ, ফায়সাল আব্দুল আযীয, তাওহীদ আব্দুল হাকীম, ঈমান অধ্যয়, মুর্তাদ হওয়ার কারণ, অনুচ্ছেদ- এর মধ্যে আলোচনা করেছেন।

* উসতাদ, আবূ হামযা আল মিসরী, তিনি স্বীয় পুস্তিকা ও পাঠ্যে উক্ত বিষয় আলোচনা করেছেন।

* আরব উপদ্বীপের সঊদীর একদল গণ্যমান্য আলিম 'আল-মুনাশাদাহ' নামক রিসালায় উক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। শাইখ ইবনে বায- এর ফাতওয়া ইয়াহুদীদের সঙ্গে সন্ধী করা বৈধ প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁরা এটা তাঁর নিকটে প্রেরণ করেছিলেন। তৃতীয় অনুচ্ছেদে ঐ সকল শাসকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যারা ইসলামের বিপরীত আক্বীদাহ-এর উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রায় ত্রিশ জন আলিম- এর তালিকা দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি এখানে তাদের নাম উল্লেখ করা হলঃ

* শাইখ, আব্দুল্লাহ ইবনে খালীল। * শাইখ, আব্দুল্লাহ ইবনে কাঊদ। * শাইখ, সালিহ আল ওয়ানইয়ান। * শাইখ, হামূদ ইবনে আকলা শুয়াইবী। * শাইখ, ইবরাহীম আদ দাবইয়ান। * শাইখ, সালিহ্ আস্-সুলতান। * শাইখ, আব্দুল্লাহ আল জালালী। * শাইখ, আবদুল মুহসিন আল উবাইকান। * শাইখ, মুহাম্মদ আল মানসূর। * শাইখ, ডঃ সাঈদ আলে যুয়াইর। * শাইখ, সা'দ আল হামীদ। * শাইখ, ডঃ আব্দুল্লাহ ইবনে হামূদ আত-তুওয়াইজিরী। * শাইখ, নাসির আল আক্ল।

* শাইখ, আব্দুল্লাহ আত-ত্বারীকী। * শাইখ, আব্দুল্লাহ আল-খুযাইরী। * শাইখ, আব্দুল ওয়াহ্হাব আত-তুরাইরী। * শাইখ, আঈয আল করনী। *

শাইখ, সায়ীদ, আল-গামিদী। * শাইখ, আলী আদ দাখীলুল্লাহ। * শাইখ, ডঃ আব্দুর রহমান আল বাররাক।

এছাড়া যারা জাতির হিত কামনা করে এবং তাদেরকে উক্ত বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাদের কয়েকজনঃ

* শাইখ, মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল ফার্রাহ। * শাইখ, আলী আল খুযাইর। * শাইখ, ডঃ সুলাইমান ইবনে সানইয়ান। * শাইখ, সুলাইমান আর রুশওয়াদী।
* শাইখ, দাবইয়ান ইবনে মুহাম্মদ আদ দাবইয়ান। * শাইখ, ডঃ মুহাম্মদ ইবনে সালিহ আল মুদাইফির। * শাইখ, ডঃ নাসির আল উমার। * শাইখ, আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আর রইস। * শাইখ, মুহাম্মদ ইবনে হামূদ আল ফাওযান। * শাইখ, আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান আল মুসয়িরী। * শাইখ, হাম্দ আস-সুলাইফীহ্। * শাইখ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আব্দুল আযীয আল-ইয়াহ্ইয়া। * শাইখ, ইবরাহীম ইবনে সালিহ্ আল খুযাইরী। * শাইখ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দুবাইখী। * শাইখ ডঃ মুহাম্মদ আল-লাহিম।

আল্লাহ সকলকে হিফাযত করুন, দীর্ঘজীবি করুন এবং তাদের ইলম দ্বারা মুসলমানদের উপকৃত করুন।

এই শাইখদের কিছু পুস্তিকা প্রকাশ পেয়েছে, যার নামঃ "লিমাযা খাফূ মিনাল্ লাজনাতিশ শারইয়া মায়া দিরাসাহ আন ওয়াকিইল কুযাত ফিস সউদি'য়া" সংকলন করেছেন- উসতাদ, সুলাইমান আন-নাহদী হাফিযাহুল্লাহু তায়ালা, এর মধ্যে আলে সউদ- এর শসকদের কুফ্র- এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে আরো কয়েকজন শাইখদের নাম উল্লেখ করা হয়েছেঃ * শাইখ, ডঃ আব্দুল্লাহ আল-হামিদ। * ডঃ মুহাম্মদ আল-মুসয়িরী, আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন!

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

প্রয়োগক্ষেত্র নয় তত্ত্বগতভাবে মন্তব্য ও ফাত্ওয়া সমূহ!

(যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীত ফয়সালা করে- যে সকল আলিম তাদের কাফির বলেন, অথচ তারা স্বীয় দেশে কাফির শাসকদের ক্ষেত্রে নিরবতা অবলম্বন করেছেন)

আমরা উক্ত অনুচ্ছেদে ঐ শাইখদের ফাত্ওয়া উল্লেখ করব যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-এর বিপরীত ফয়সালা করে, তাদের কাফির হওয়ার বিষয় স্বীকার করেন এমন কি তাদের কেউ কেউ উক্ত হুকুম সাধারণভাবে সকল শাসকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বীয় দেশের আমীরকে এর আওতা হতে বাদ দিয়েছেন এবং মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে তাদের কিছু প্রতিবেশীকেও এর আওতা বহির্ভূত বলেছেন।

* উক্ত মুফতীদের শীর্ষে রয়েছেন- সউদীর মুফতী, শাইখ, আব্দুল আযীয ইবনে বায। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে-মানুষের বিধান ও তাদের মতাদর্শ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ)- এর বিধান থেকে উত্তম, অথবা এর সমপর্যায়ের, কিংবা এর মতই, কিংবা এটা পরিত্যাগ করবে এবং উক্ত স্থলে মানবরচিত বিধান ও পদ্ধতি চালু করবে তার কোন ঈমান নেই, যদিও সে বিশ্বাস করে আল্লাহর বিধানই উত্তম, পরিপূর্ণ ও ইনসাফ পূর্ণ।

("ওয়াজুবু তাহকীমি শারয়িল্লা ওয়া নবযু মা খালাফাহু")

আমরা বলছিঃ শাইখ ইবনে বায-এর উক্ত মন্তব্য পূর্ণ সঠিক। আফসোস কিন্তু তিনি স্বীয় দেশের বাদশাহ-এর ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসারে ফয়সালা দেননি। বরং এর চেয়ে অধিককতর ক্ষতিকর যে- তিনি মনে করেন সে মুসলমানদের আমীর! শুধুমাত্র এটাই নয়, বরং এর স্বপক্ষে বহু ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রধান করেছেন এভাবে- ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর শাসকবর্গ যাদেরকে তিনি ইতিপূর্বে কাফির বলেছেন, তিনি দাবি করেন তারা মুসলমানদের শাসক। আর যারা তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন (এর মাধ্যমে তিনি আমাদের আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মুজাহিদ ভাইদের বুঝিয়েছে) তাদের বিদ্রোহী ও খারিজী বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের শাস্তি প্রদান করা এবং প্রতিরোধ করা ওয়াজিব যতক্ষণ না তারা হিদায়াতের রাস্তায় ফিরে আসে। তার নিকটে হিদায়াত হচ্ছে এই কাফির মুর্তাদদের সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হওয়া ও নিরব থাকা।

* শাইখ, মুহাম্মাদ ইবনে উসাইমীন- এর ফাতওয়া। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করে, এটা হালকা মনে করে, অথবা ঘৃণা করে, কিংবা এ বিশ্বাস করে যে- এর বিপরীতটাই মানুষের জন্য বেশী উপযোগী ও অধিক উপকারী তবে সে কাফির, উক্ত কুফরীর জন্য ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে। এদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা লোকদের জন্য ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত আইন রচনা করে, যেন এটা লোকদের চলার পথ হয়ে যায়। তারা তো শরীয়াত বিরোধী আইন এ জন্যই প্রণয়ন করে যে- তারা বিশ্বাস করে এটা মানুষের জন্য অধিক উপযোগী ও বেশী উপকারী।

কেননা নিশ্চয় যুক্তি নির্ভর ও জন্মগত স্বভাব দ্বারা জানা যাচ্ছে যে- নিশ্চয় মানুষ এক মতাদর্শ হতে অন্য মতাদর্শে গ্রহণ করে এজন্যই যে, সে বিশ্বাস করে যেটা সে গ্রহণ করেছে তা পূর্বের মতাদর্শ হতে উত্তম এবং আগের মতাদর্শ অসম্পূর্ণ।

("মাজমূয়া ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিশ শাইখ ইবনে উসাইমীন", ২য় খণ্ড, ১৪৩পৃঃ
'ওয়াকফাত মায়াশ শাইখ আলবানী হাওলা শারীত্ব' শাইখ, আবূ ইসরা প্রণীত, সহ ১৩পৃঃ)

* শাইখ, আবু বাকর আল-জাযায়িরী- এর ফাতওয়া। তিনি বলেছেনঃ প্রভুত্বের ক্ষেত্রে স্পষ্ট শিরক হচ্ছে- অমুসলিম শাসকদের নিকটে- নতিস্বীকার করা। তাদের পূর্ণ অনুগত হওয়া। তাদের পক্ষ হতে বাধ্য করা ব্যতীতই তাদের আনুগত্য করা- যখন তারা বাতিল দ্বারা তাদের বিচার করে এবং কুফ্র ও কাফিরদের আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে। অতঃপর তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করে এবং তাদের উপর হালাল বস্তুকে হারাম ঘোষণা করা। (মিনহাজুল মুসলিম)

* শাইখ, সালিহ আল ফাওযান- এর ফাতাওয়া। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াত পরিবর্তন করে অন্য কোন মতাদর্শে এবং মানবরচিত আইন-এর নিকটে বিচার প্রার্থনা করল, তবে সে তো উক্ত আইন প্রণেতা ও তদনুযায়ী ফয়সালাকারীকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করালো।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ তাদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। (সূরা শূরাঃ ২১)

তিনি আরো বলেনঃ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

অর্থঃ যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে। (সূরা আনআমঃ ১২১)

আল ইয়াসিক সম্পর্কে ইবনে কাসীর (রহঃ)- এর বক্তব্য বর্ণনার পর তিনি আরো বলেনঃ তাতারদের সম্বন্ধে যে আইন উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ আইন এবং যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের পরিবর্তে মানবরচিত আইনকে গ্রহণ করবে যা বর্তমান সময়ে অনেক রাষ্ট্রে করা হয়েছে, আর এটাকেই বিধানের মূল উৎস বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এজন্য ইসলামী শরীয়াত নিরর্থক হয়ে গেছে কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যতীত, তবে সে কাফির।

("ওয়াক্ফাত মায়াশ শাইখ আল-আলবানী হাওলা শারীত" (মিন মিনহাজিল খাওয়ারিজ)
শাইখ আবূ ইসরা আল আসয়ূতী প্রণীত, ৪৮পৃঃ)

*ডঃ ইউসুফ আল কারযাবী। তিনি বলেনঃ নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ব্যক্তি শারীয়াতকে সালিস মান্য করার ক্ষেত্রে স্বমূলে উৎপাটন করে। নাম ব্যতীত ইসলামে তার কোন অংশ নেই। সে নিশ্চত ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাকে তাওবা করতে বলা ওয়াজিব। তার থেকে সন্দেহ অপসারণ করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে হুজ্জাত (দলীল) দাঁড় করাতে হবে। নচেৎ বিচারক তাকে মুরতাদ বলে ঘোষণা দেবেন। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততা কেড়ে নেয়া হবে, অথবা মুসলিম জাতীয়তা প্রত্যাহার করা হবে। তার এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে আলাদা করে দেয়া হবে। এবং পার্থিব জীবনে ও মৃত্যুর পর তার উপর ধর্মত্যাগী মুরতাদ এর বিধান প্রয়োগ হবে।

("আল ইসলাম ওয়াল আলমানিয়া ওয়াজহান লিওয়াজাহিন" ৭৩, ৭৪পৃঃ)

"আল ইবাদাহ" গ্রন্থে তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেনঃ সৃষ্টির যে ব্যক্তি এই দাবী করবে যে- আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তার হালাল, হারাম, আদেশ বা নিষেধ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকার রয়েছে, তবে সে সীমালঙ্ঘন করল, এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজেকে রব বা ইলাহ হিসেবে দাঁড় করাল। যে ব্যক্তি তার এ অধিকার সমর্থন করবে, তার আইন ও মতাদর্শের কাছে

আত্মসমর্পন করবে, তার মাজহাব ও আইন-এর কাছে নতি স্বীকার করবে এবং তার হালালকে হালাল বলে মেনে নেবে এবং তার হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করবে, তবে সে তাকে রব হিসেবে গ্রহণ করল এবং আল্লাহর সঙ্গে বা তাঁর পরিবর্তে তার পূজা করল এবং বুঝতে পারুক আর না পারুক মুশরিকদের দলে প্রবেশ করল। (আল-ইবাদাহ্ঃ ৫৫)

* ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির হানাদী স্বীয় গ্রন্থ "নাহবু দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া রশীদিয়া"-এর মধ্যে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

আফসোস! এতদসত্ত্বেও তারা উক্ত শাসকদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন এমনকি তারা স্বীয় দেশের শাসকদেরকে কাফির শাসকদের স্থলে নিক্ষেপ করেননি, অথচ তারা তাদের কুফরীর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

অতএব তাদের উক্ত অপব্যাখ্যার দরুণ তাঁরা অসংখ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। কেননা তাদের নিকট হতে ফাতওয়া প্রকাশ পায়। যদিও আমরা এটাও অবগত আছি যে অনেক ত্বালিবে ইলম এর দ্বারা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এরূপ অপব্যাখ্যা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন যার পক্ষে আল্লাহ তায়ালা কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার হিদায়াত প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ আমরা তোমার হিদায়াত প্রার্থনা করছি!!

কিন্তু শাইখ, আবদুর রহমান আবদুল খালিক, শাইখ, মুকবিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদিয়ী, এবং শাইখ আবদুল মাজিদ আয্ যানদানী তারা এ শাসকদের কুফ্র এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মার্কসবাদী, উদারপন্থী ইত্যাদি কাফির মতবাদ গ্রহণ করেছে। এতদসত্ত্বেও তারা উপসাগরীয় রাষ্ট্রের কিছু শাসকদের সম্বন্ধে ফয়সালার ক্ষেত্রে দ্বিধা করেছেন। যেমন ফাহ্দ ও জাবির। তারা বলেনঃ আমরা স্বীকার করছি, এখানে এ শাসকদের অনেক কর্ম শরীয়াত বিরোধী তবুও তারা সর্বদা নিজেদের পক্ষ হতে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তারা মুসলমান এবং উক্ত কাফির মতবাদের কোনটি তারা গ্রহণ করেননি। বরং তারা প্রচার করেন ইসলামই তাদের দ্বীন।

তৃতীয় অধ্যায়

মুর্জিয়া মাজহাবের কয়েকটি সংশয়ের প্রতিবাদ এবং শরীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকদের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব এর বিবরণ

প্রথম সংশয়ঃ

কুফর দূনা কুফর (ছোট কুফর)ঃ

প্রথম সংশয় হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মন্তব্যের ভূল তাফসীর। কেননা "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না তারা কাফির" উক্ত আয়াতে বর্ণিত কুফরকে তিনি ছোট কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ডঃ সালেহ আস সাবী (হাফিযাল্লাহু তায়ালা) উক্ত সংশয়ের প্রতিবাদ করে বলেনঃ বর্তমানে বাতিলপন্থিরা উক্ত বিষয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করেছেন, যার কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ্যৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর শারীয়াত পরিবর্তণ করে অথবা আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে কিতাব, সুন্নাত ও এই জাতির ইজমা অনুসারে সে কাফির"। তারা বলে এটা একটি গুণাহের কাজ, যা তাকে মিল্লাত হতে বের করে দিবে না। উক্ত বিষয়ে তাদের দলিল হচ্ছে আহলে কিবলার কোন ব্যক্তিকে কোন গুণাহর জন্য কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না, যতক্ষণ না সে এটা হালাল মনে না করে। এবং অনেক আলিম (সঠিক কথা হচ্ছে কম সংখ্যক) অত্র আয়াত:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেন না। তারাই কাফির"। (সূরা মায়িদাহঃ ৪৪)

এর তাফসীর প্রসংঙ্গে ইবনে আব্বাস, ত্বাউস ও মুজাহিদ ইত্যাদি মন্তব্য করেছেন: এটা ছোট কুফর। এটা আল্লাহ তা'য়ালা ও ফিরিস্তাকে অস্বীকার করার মত কাফির নয়।

তারা বলেন: এর দ্বারা কাফির প্রতিপন্ন করা ঐ খারিজিদের নীতি, যারা উক্ত দলিল এবং এর ন্যায় আল্লাহর বাণীঃ (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। (সূরা ইউসুফ ৪০)

এর মাধ্যমে তাদের প্রতিপক্ষ যারা আহলে কিবলা ছিল তাদেরকে কাফির প্রতিপন্ন করত।

আশ্চর্য: এই সাদৃশ্য বিধান মানবরচিত মতবাদ দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের করিডোরে প্রবেশ করেছে। যেটা ইসলামী ধারা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নিয়োজিত রয়েছে। আপনি উক্ত দাবির অভিনয়কারীদের প্রত্যক্ষ করবেন, তারা বারবার এই বক্তব্য পেশ করে ইসলামী আন্দোলনের সন্তানদেরকে দোষারোপ করছে এবং তাদেরকে বারবার খারিজী বলছে। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে না এবং কোন বিষয়কে

প্রত্যাখ্যান করে না। অতএব, উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'কুফ্র' এর হুকুম এর উপর সঠিক প্রমাণিত হবে না, বরং অনুরূপ গুণাহ হবে না।

অতএব বর্তমান সময়ে উক্ত সুক্ষ পরিস্থিতি যা মুসলমানদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

(তাহকীমুশ শারীয়াত ওয়া সিলাতুহু বি আসলিদ-দ্বীন ৪১পৃঃ)

এটাই তাদের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ, একদল সম্মানী আলিম এই সংশয়ের প্রতিবাদের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছেন। কিন্তু আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় শাইখ আহমাদ শাকির ও তাঁর ভাই মাহমুদ শাকির (রহঃ) এর প্রতিবাদের উপরেই সংক্ষেপ করেছি। শাইখ আহমাদ শাকির "উমদাতুত তাফসীর" এর মধ্যে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর আসারের পর্যালোচনা করে বলেন: নিশ্চয় ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যের উক্ত আসার দ্বারা বর্তমান যুগে পথভ্রষ্ট জ্ঞানপাপীরা খেল তামাশায় মেতে উঠেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বীনের বিরুদ্ধে স্পর্ধা দেখাচ্ছে এবং মুসলিম দেশগুলোতে আমদানীকৃত মানবরচিত মূর্তি পূজার আইন এর জন্য ওজর হিসাবে বর্ণনা করে বা বৈধ বলে থাকে। এখানে খারিজি ডিম্বানু উৎপাদন করার ঝগড়ার ক্ষেত্রে আবু মিজলায হতে বর্ণিত একটি আসার রয়েছে। এটিতে যালিম আমীরের কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণকল্পে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ফয়সালার ক্ষেত্রে অজ্ঞ থাকার জন্য কিছু কিছু রায়ের ক্ষেত্রে শরীয়াতের বিপরিত কাজ করেন। আর খারিজিগণ তাদের মাজহাব মতে কাবীরাহ গুণাহগার ব্যক্তি কাফির। তারা বিবাদ করছে এবং আবু মিজলায এর নিকটে তাদের মত অনুসারে ফাতওয়া চাচ্ছে। অর্থাৎ এসকল শাসক কাফির। যেন এটা তাদের মত অনুযায়ী ওদের বিরুদ্ধে স্বসস্ত্র বিদ্রোহ করার জন্য ওযর বা দলীল হয়ে যায়। ত্বাবরী উক্ত আসার দুটি বর্ণনা করেছেন।

এর উপর আমার ভাই মাহমুদ মুহাম্মাদ শাকির অত্যান্ত দামী, শক্তিশালী ও স্পষ্ট সমীক্ষা লিখেছেন। তারপর তিনি বলেনঃ আমার ভাই মাহমুদ মুহাম্মাদ শাকির উক্ত দু'টি আসার এর সম্বন্ধে লিখেছেনঃ হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে পথভ্রষ্টতা হতে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিচ্ছি। অতঃপর বর্তমানে যাদের নিকট হতে বক্তব্য প্রকাশ পায় এমন সংশয়বাদী ও ফিতনাবাজ লোকেরা শাসকদের সম্পর্কে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করার পক্ষে ওজর পেশ করে। এবং সম্পদ সম্পর্কীয় বিষয় ও রক্ত সম্পর্কীয় বিষয়-এর ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর স্বীয় কিতাবে অবতীর্ণ শরিয়াত এর বিপরীত ফয়সালা করতে এবং মুসলিম দেশগুলোতে কাফিরদের আইন গ্রহণ করার পক্ষে অজুহাত উত্থাপন করে। যখন উক্ত দুটি আসার অবগত হয়েছে,

এটাকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং সম্পদ, ইজ্জত ও রক্ত সম্পর্কীয় বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থি ফয়সালা করা সঠিক বলে মনে করছে এবং সাধারণ বিষয়ের ফয়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর শারীয়াতের বিরোধিতা করা এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বা তদনুযায়ী আমল না করলে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না (এমন ফাত্ওয়া দিচ্ছে)।

এটা জানা কথা যে, যারা ইবাযিয়া (খারিজী) এর সম্পর্কে আবূ মিজলায কে জিজ্ঞেস করেছিল, এর মাধ্যমে তারা শাসকদের বিরুদ্ধে হুজ্জাত প্রমাণ করতে চেয়েছিল। কেননা তারা সুলতানের সাথে যুদ্ধেরত ছিল এবং তারা কখনো কখনো অবাধ্য হয়েছিল এবং যে বিষয়ে আল্লাহ বারণ করেছিলেন এর কিছু কিছু কর্মে তারা লিপ্ত হয়েছিল। উক্ত কারণে তিনি প্রথম সংবাদে তাদেরকে বলেছিলেন যদি তারা এর থেকে কোন কিছু পরিহার করে তবে তারা জানত যে, তারা গুণাহের কাজ করেছে। এবং তিনি তাদেরকে দ্বিতীয় সংবাদে বলেছিলেন, "নিশ্চয় তারা এমন কাজ করত, যে বিষয়ে তারা জানত যে, ওটা গুণাহের কাজ" অতএব আমাদের দেশের বিবাদীগণ যে ফয়সালা সম্পর্কে প্রমাণ করতে যাচ্ছে তখন তাদের প্রশ্ন এমনটি ছিল না। সম্পদ অথবা রক্ত ও ইজ্জত সম্পর্কীয় আল্লাহর শারীয়াত পরিপন্থী আইন দ্বারা ফয়সালা করার জন্য তাদের প্রশ্ন ছিল না। তাদের জিজ্ঞাসা এ বিষয়ে ছিল না যে, তারা আইন প্রণয়ন করে মুসলমানদের কে অবাধ্য করে দেবে এবং আল্লাহর কিতাবে বির্ণত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যবাণীতে উল্লেখিত বিধানের বিপরীতে অন্যের নিকট ফয়সালা নিয়ে যাবে।

অতএব উক্ত আচরণ আল্লাহর বিধান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া; তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ফয়সালার উপরে কাফিরদের মতবাদকে অগ্রাধিকার দেয়া এটা কুফর। আহলে ক্বিবলা বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ করলেও উক্ত প্রবক্তা ও এর দিকে আহ্বানকারীকে কাফির প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না। আমরা বর্তমানে যা প্রত্যক্ষ করছি তা হচ্ছে- কোন কিছু বাদ না দিয়ে ব্যাপকভাবে আল্লাহর বিধানকে পরিত্যাগ করা, তাঁর বিধানের বিপরীত মতাদর্শকে তাঁর কিতাব ও তাঁর নাবীর (সাঃ) এর সুন্নাহর উপরে অগ্রাধিকার দেয়া এবং আল্লাহর শারীয়াতে বিদ্যমান এমন সকল বিধানকে শূন্য করে দেওয়া। বরং আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের উপর মানবরচিত আইনকে অগ্রাধিকার প্রদান করার জন্য দলীল দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

দলীল প্রদানকারীদের দাবী হচ্ছে- শারীয়াতের আহকাম আমাদের যুগ ব্যতীত অন্য যুগে বিভিন্ন কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐগুলোর সমাপ্তির সঙ্গে

সঙ্গে সকল বিধানের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতএব আবূ মিজলায এবং বাণী আমর ইবনে সাদূস এর ইবাযিয়াহ দলের হাদীসের সঙ্গে সাদৃশ্য কোথায়? ইবনে মিজলায এর খবর সম্পর্কে তারা যা ধারণা করেছে বিষয়টি যদি ঐরূপ হতো, অর্থাৎ তারা শারীয়াতের আহকাম সম্পর্কে ফয়সালা করার ক্ষেত্রে সুলতানের বিরোধিতা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এটা প্রমাণ নেই যে- নিশ্চয় কোন শাসক বিধান প্রণয়ন করেছে এবং এটাকে মতাদর্শ নির্ধারণ করে তদ্বারা ফয়সালা করতে বাধ্য করে দিয়েছে। এটি একটি বিষয় অন্যটি হচ্ছে নিশ্চয় কোন শাসক নিদিষ্ট কোন বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থি ফয়সালা করে। হয়তো সে না জেনে এমন ফয়সালা করেছে। অতএব, এ বিষয় হচ্ছে শারীয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের বিষয়। নয়তো সে প্রবৃত্তি ও গুণাহের দ্বারা ঐরূপ ফয়সালা করে। তবে এটা গুণাহ হবে এর জন্য তাওবাহ করতে হবে এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। নতুবা সে বিচারের ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যা করে ফয়সালা করে যার মাধ্যমে সে সকল আলিমদের বিপরীত করে। অতএব তার উক্ত ফয়সালা করাই হচ্ছে প্রত্যেক অপব্যাখ্যা কারীর ফায়সালা। সে কিতাব ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাতের কিছু গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অপব্যাখ্যা গ্রহণ করে। অথবা আবূ মিজলায-এর যুগে তাঁর পূর্বে ও পরের সময়ে এমন শাসক থাকবে যে, কোন বিষয়ে শারীয়াতের আহকামকে অস্বীকার করে ফয়সালা করবে, অথবা মুসলমানদের বিধানের উপরের কাফিরদেরকে প্রাধান্য দিয়ে বিচার করবে, কিন্তু ঐরূপ ছিলনা। অতএব, আবূ মিজলায ইবাযিয়াহদের মন্তব্যকে ঐ দিকে ফিরানো অসম্ভব। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত আসারদ্বয় ও অন্যান্য আসার অপপ্রয়োগ ও ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে প্রমাণ করে সে এর দ্বারা শাসককে সাহায্য করতে চায় অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীতে ফয়সালা অনুমোদন কল্পে বাহানা তালাস করে। বরং ওটা দীনে ফয়সালা নিয়ে যাওয়ার মূলনীতিতে ত্রুটি বিদ্যমান। যার নিকট বিরোধের সময় বিষয়গুলোকে ফিরানো হয় এবং জাতীয় জীবনে যার আনুগত্য করা ওয়াজিব এটা কি কিতাব ও সুন্নাহ? না সংসদ ও আইন কমিটি হতে প্রকাশিত মানবরচিত আইন? এই প্রশ্নের অবশ্যই উত্তর দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিধান দেওয়ার অধিকার কার? আল্লাহর শারীয়াতের; না ইউরোপীয় আইনের? রাষ্ট্র কি ইসলামী শারীয়াতকে সালিস নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত হবে? না মানবরচিত আইনকে সালিস নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত হবে?

(তাহকীমুশ শারীয়াহ ওয়া সিলাতুহু বিআসলিদীন ৪৫পৃঃ)

দ্বিতীয় সংশয়ঃ

কোন গুনাহের জন্য কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না, যতক্ষণ না সে এটা হালাল মনে করে

তাদের মন্তব্য কোন গুনাহের জন্য কাউকে কাফির বলা বা আখ্যায়িত করা যাবে না যতক্ষণ না সে এটা হালাল মনে করে। আহলুস সুন্নাহ এর প্রবীণ ও নবীন অনেক আলিম উক্ত সংশয়ের প্রতিবাদ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে আবুল আয হানাফী (রহঃ) বলেছেন, আমরা কাউকে কোন গুণাহের জন্য কাফির বলি না। সাধারণভাবে এমন কথা প্রয়োগ করতে অনেক ইমাম বিরত থেকেছেন। বরং বলা হবে আমরা তাদেরকে প্রত্যেক গুনাহের জন্য কাফির বলি না বা কাফির প্রতিপন্ন করি না, যেমন খারিজীগণ করে থাকে। সাধারণ নাফী (না বোধক) এবং ব্যাপক নাফী এর মধ্যে পাথর্ক্য রয়েছে। ওয়াজিব হচ্ছে ব্যাপক নাফী যা খারিজিদের কথার বিপরীত; যারা প্রত্যেক গুনাহের জন্য কাফির প্রতিপন্ন করে।

(শারহুত তাহাবিয়া ২য় খণ্ড ৪৩২ পৃষ্ঠা)

এ ছাড়া অনেক আলিম উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করেছেন।

শায়খ আবূ কাতাদাহ ফিলিস্তীনী (হাফিযাল্লাহ তায়ালা) উক্ত কথার অনুসরণ করে বলেনঃ এটা স্পষ্ট কথা। কেননা শুধুমাত্র হালাল মনে করা কুফর ও রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ করা)। কেননা এর দ্বারা আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। কেননা শুধুমাত্র হালাল মনে করলেই তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে এবং মিল্লাত হতে বের হয়ে যাবে। আর এটা এক প্রকার কুফর, কিন্তু কুফ্র এর আরো অনেক প্রকার রয়েছে যা ত্বালিবে ইলম এর নিকট জানা আছে। যেমন- ঠাট্টা করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, দুশমনি করা, অবজ্ঞা করা। কখনো কুফর যবান দ্বারা হয়, কখনো অন্তর দ্বারা হয়, কখনো আমল বা কর্মের দ্বারা হয়। এটা সালফে সালেহীন ও সাধারণ ফুকাহাদের মন্তব্য। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে গালি দাতা। কেননা আহলে সুন্নাহ তাকে কাফির আখ্যায়িত করেন। সে এটা হালাল মনে করুক আর না করুক; সে তার (সাঃ) নবুয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করুক আর না করুক

তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা শুধুমাত্র গালি দেওয়া সব চেয়ে বড় কুফর যা তাকে ইসলাম হতে বের করে দেবে। এটা তো গেল এবং নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর বিধানের বিপরীত বা বিরোধী মতবাদ প্রণয়ন করা শাখাগতভাবে বা মৌলিকভাবে যেমন মদ ও যিনা বৈধ করা, জিহাদ হারাম করা এবং একাধিক স্ত্রী হারাম ঘোষণা করা, এটা মৌলিকভাবে অথবা কিছু কিছু হাদ (শাস্তি) এর বৈশিষ্ট পরিবর্তন করা। যেমন শাস্তি কমিয়ে দেওয়া বা বাড়িয়ে দেয়া এটা সবচেয়ে বড় কুফর। সে এটা হালাল মনে করুক বা না করুক, এক সমান। বরং নিশ্চয় সে যেটা করেছে তা স্বয়ং হারাম কে হালাল মনে করা, যে বিষয়ে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (আর্থাৎ উক্ত কার্য সম্পাদনকারী এর কুফরের উপর ইজমা হয়েছে)। আর এটা আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করা। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন নিশ্চয় পরিবর্তন করা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর ও রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ করা)। এবং সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

(তার বিশেষ রিসালা, মাতা ইউশ্তারাতুল ইসতেহালাল লিত তাফসীর উক্ত শিরোনামে তার বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে)

তৃতীয় সংশয়ঃ
“মামুনকে কাফির বলা হয়নি কেন?”

যে মামুন কুরআনকে সৃষ্টি বলেছিল তাকে ইমাম আহমদ (রহঃ) কাফির আখ্যায়িত করেননি কেন? শায়খ উমার ইবনে মাহমুদ আবু উমার (আবু কাতাদাহ আল ফিলিস্তিনি) হাফিযাহুল্লাহু তায়ালা এর নিকটে আমি উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করি তিনি নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করেন-

রহমানের শারীয়াত পরিবর্তনকারী শাসকদের কাফির প্রতিপন্ন না করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ওয়াজিব না হওয়া সম্বন্ধে ও তাদের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা বৈধ না হওয়া সম্পর্কে তাদের কেউ কেউ সাদৃশ্য বিধান করে। তাদের মন্তব্যঃ নিশ্চয় ইমামগণ এবং তাদের শীর্ষে রয়েছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, যিনি মামুনকে কাফির আখ্যায়িত করেননি, অথচ সে কুরআনকে সৃষ্টি বলেছিল এবং স্রষ্টার গুণাবলিকে অস্বীকার করেছিল।

এতদসত্বেও তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। আমরা আল্লাহর সাহায্যে বলছি- নিশ্চয় উক্ত সন্দেহ দ্বারা অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরাই প্রতারিত হয়। এই উক্তিকারী অজ্ঞ অথবা আল্লাহর দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশায় মেতে উঠেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তিনি জানতে পারবেন কোন কারণে বর্তমান শাসকদের কাফির বলা হয়। তদ্রূপ তিনি সালফে সালেহীনদের মাজহাব জানতে পারবেন, সাথে সাথে অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যাও বুঝতে পারবেন। তিনি এটাও জানবেন যে, উক্ত অবস্থার একটির সঙ্গেও তুলনা করা বৈধ হবে না। কেননা যে ব্যক্তি শারীয়াত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এটা স্ব ইচ্ছায় ও নিয়তের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে এবং ঐ তা'বীলকারী (ব্যাখ্যাকারী) যে সত্যের ইচ্ছাপোষণ করে এবং ভুল করে, উক্ত দু'জনের মধ্যে বড় পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব মামুন অতঃপর মু'তাসিম সম্পর্কে তাদের মন্তব্য হচ্ছে তারা কুরআনকে সৃষ্টি বলেছিল এবং জাহমিয়াদের মধ্যে যারা তাদের পদাংক অনুসরণ করে বলেছিল, তারা আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল, তা'বীল বা ব্যাখ্যাকারী আর আমাদের দ্বীনে এবং আহলুস সুন্নাহ এর মাজহাবে ব্যাখ্যাকারীদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য ও কিছু হুকুম রয়েছে। যেটা পূর্ববর্তীদের নিকটে ইজমার ন্যায়, যদিও পরবর্তীদের নিকটে এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান।

তা'বীল (ব্যাখ্যা)ঃ এটা দলিলবিহীন কথাকে দলীল হিসাবে বিশ্বাস করা। এর পদ্ধতি হচ্ছে কোন ব্যক্তি একটি কথা বলল বা কোন একটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করল, কিংবা কোন একটি কাজ করল এ ধারণা নিয়ে যে, নিশ্চয়

উক্ত মন্তব্য, উক্ত কর্ম এবং উক্ত বিশ্বাসই হচ্ছে সত্য। যা রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিয়ে এসেছেন। অথচ বাস্তবে ও প্রকৃতপক্ষে উক্ত বিষয় এমনটি নয়। যে ব্যক্তি সত্যের ইচ্ছা পোষণ করে ও তা অর্জন করতে পারে না, আর এটাই হচ্ছে আমাদের উম্মাতের বিদ'আতিদের অবস্থা। কেননা তারা সত্যের ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু তারা ভুল করে। বিদ'আত কখনো ইলমী (জ্ঞানগত)হয়ে থাকে (যেমন-বিশ্বাসগত বিদ'আত)

এবং কখনো আমলী (কর্মগত) হয়ে থাকে। ঐ লোকেরা তাদের কথা, স্বীয় কর্ম এবং তাদের শরীয়াত বিরোধী বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উক্ত ইচ্ছা বাস্তবে তাদের ওযর হিসাবে পেশ করছে; উক্ত কারণে ইমামগণ তা'বীল বা ব্যাখ্যাকারীদেরকে কাফির আখ্যায়িত করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে হাযম উক্ত বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে ইহকামুল আহকামে এটা উল্লেখ করেছেন এবং এটাই হচ্ছে খারিজী ও মু'তাযিলাদের বিপরীতে আহলুস সুন্নাহ এর মাজহাব। কেননা তারা বিরোধীদেরকে কাফির আখ্যায়িত করে। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ যদিও তারা বিশ্বাস করে যে, বিরোধীদের কিছু মন্তব্য স্বয়ং কুফ্‌র, তা সত্ত্বেও তারা এমন প্রত্যেক মন্তব্যকারীকে কাফির প্রতিপন্ন করা হতে বিরত থেকেছেন। কেননা এক্ষেত্রে এক শ্রেণীকে কাফির আখ্যায়িত করা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, আর উক্ত বিষয় ত্বালিবে ইলমের ছোট বাচ্চারাও অবগত।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ যে কথা বলার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে কাফির প্রতিপন্ন করা হয়, কখনো উক্ত ব্যক্তির কাছে অকাট্য প্রমাণ পৌছেনি, যা তাকে হক চিনতে সহায়তা করত। কখনো ওটা তার নিকটে থাকে কিন্তু ওটা তার কাছে অপ্রমাণিত বলে বিবেচিত হয়। অথবা সে এটা বুঝতে পারে না। কখনো তার কাছে এমন সন্দেহ উপস্থিত হয় যেটাকে আল্লাহ ওজর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব মু'মিনদের যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে স্বচেষ্ট থেকেও ভুল করবে তবে আল্লাহ তার গুণাহ মাফ করে দিবেন, সে যে কেউ হোক না কেন। এটা নযরী মাস'আলার ক্ষেত্রে হোক বা আমলী মাস'আলার ক্ষেত্রে হোক কোন পার্থক্য নেই। এই নীতির উপরেই নবী (সাঃ) এর সাহাবাগণ এবং ইসলামের অধিকাংশ ইমামগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এতটুকু বলেনঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ) জাহমিয়াদেরকে কাফির আখ্যায়িত করতেন যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে অস্বীকার করত। কেননা রসুলুল্লাহ (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তাদের উক্তি এর প্রকাশ্য ও স্পষ্ট বিরোধ। কিন্তু তিনি নির্দিষ্টভাবে তাদেরকে কাফির প্রতিপন্ন করতেন না, কেননা যে ব্যক্তি

উক্ত কথার দিকে আহ্বান করে সে, যে ব্যক্তি ঐরুপ কথা বলে তার থেকে বড় অপরাধী এবং যে ব্যক্তি তার বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয় সে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এর দিকে আহ্বান করে তার চেয়ে বড় অপরাধী।

তা সত্ত্বেও শাসকদের মধ্যে যারা জাহমিয়াদের ন্যায় কথা বলত, লোকদেরকে এর দিকে আহ্বান করত, তারা তাদের শাস্তি দিতো, আর যারা তাদের ডাকে সাড়া দিত না তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করত। তা সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করেছেন। কেননা তিনি জানতেন যে, তাদের কাছে এটা স্পষ্ট নয় যে, তারা রসূল (সাঃ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আর তারা রসূল (সাঃ) কর্তৃক আনিত শারীয়াতকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু তারা তা'বীল (ব্যাখ্যা) করেছে, অতঃপর তারা ভুল করেছে এবং যে ব্যক্তি তাদেরকে ঐরূপ কথা বলেছে তারা তাদের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করেছে।

(নাওয়াকিযুল ঈমান আল ক্বাওলিয়া ওয়াল আমালিয়া, শায়খ ডঃ অব্দুল আযীয আব্দুল লতিফ প্রণীত ৫২, ৫৩পৃঃ)

অতএব এটাই হচ্ছে তা'বীল বা ব্যাখ্যাকারীদের সম্পর্কে ইমামগণের আবস্থা। সুতরাং তা'বীলকারীদের ইচ্ছা হল হক বা সত্যকে পাওয়া এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা না করা, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার না করা, তার এটাই তাদের মধ্যে হতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির প্রতিপন্ন করার প্রতিবন্ধক, যদিও তারা কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে।

কিন্তু বর্তমান যুগের শাসকেরা প্রত্যেক দৃষ্টিসম্পন্ন ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট যে তারা শরীয়াতের বিরোধীতা করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। বরং তারা তাদের সংবিধান ও আইনে প্রকাশ্য ঘোষণা করেছে- জনগণের হাতেই কতৃর্ত থাকবে। নেতৃত্বের মহান অধিকার, বিভিন্ন বিষয় ও কর্ম নির্ধারণে তাদের হক বলে গণ্য হবে। আর এটা আমাদের দ্বীনে রব, নেতা, অমুখাপেক্ষী এবং বিধানদাতা এর নামের সমান করে দিচ্ছে। এটা স্বয়ং কুফর, স্বয়ং আল্লাহর বিধানের সাথে সমকক্ষতা নির্ধারণ করা এবং স্বয়ং প্রত্যাখান ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। অতএব যে ব্যক্তি ঘোষণা করল আল্লাহই বিধি-নিষেধের একমাত্র মালিক, কিন্তু সে আদেশ ও নিষেধ বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করে এবং যে ব্যক্তি বিধি নিষেধ আল্লাহর জন্যই হতে হবে এটা প্রত্যাখান করল এবং এটা নিজের জন্য নির্ধারণ করল ঐ অন্ধ ও জাহেলগণ কিভাবে ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে এক সমান বলে আখ্যায়িত করল? অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ

এটা আর ওটা কি এক সমান? পরিত্যাগ করা হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করছি।

উক্ত কারণে আলিমগণ ইজমা করেছেন যে, আইন রচনা করা কুফর। যেমন ইমাম শাতিবী (রহঃ) স্বীয় ই'তিসাম গ্রন্থে ১ম খণ্ডে ৬১পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ তদ্রূপ তারা ইজমা করেছেন যে, নিশ্চয় দ্বীন পরিবর্তন করা শিরক ও কুফ্র। ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেছেনঃ কোন মানুষ যখন ইজমা হয়েছে এমন কোন হারাম বিষয়কে হালাল করল, কিংবা ইজমাকৃত এমন কোন হালাল বিষয়কে হারাম ঘোষণা করল, অথবা ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন কোন শরিয়াতের বিধানকে পরিবর্তন করল, তবে সে ফকীহ্গণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে কাফির ও মুরতাদ।

(মাজমূউল ফাতাওয়া ৩য় খণ্ড ২৬৭পৃঃ)

অতএব, এই শাসকেরা যা করছে, এর মাধ্যমে কি তারা আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল এবং প্রয়োগ করতে তারা ভুল করেছে? অথবা সূচনাতেই তারা কুরআন ও সুন্নাহকে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করেছে এবং হালাল ও হারাম ঘোষণার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মতবাদ গ্রহণ করতে চেয়েছে?

নিশ্চয় যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, অবশ্যই উক্ত পরিবর্তনকারী শাসকেরা কল্যাণ এবং শরীয়াত বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, কিন্তু তারা পথ ভুল করেছে, তবে সে সর্বপ্রথম তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা বলছে, অতঃপর সে নিজের বিরুদ্ধেও মিথ্যা বলছে। বাস্তবতা তার প্রত্যেক দাবীর প্রতিবাদ করছে এবং তাকে মিথ্যুক বলছে। কেননা এ শাসকদের শরীয়তের বিরোধীতা করা তাদের বুঝের ভুলের জন্য নয়, বরং ইচ্ছা করে এর বিরোধীতা করা, এর সমকক্ষতা দাঁড় করানো এবং এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া, এটা তো স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয়। বরং তারা ব্যাখ্যা করে বলে, শাসন ক্ষমতায় শরীয়াতের কোন প্রভাব থাকবে না এবং এর আইনকানুনেও কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। এবং দাবি করে, শুধুমাত্র দ্বীন (ধর্ম) হচ্ছে বান্দা ও তার রবের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়। অতএব ঐ লোকেরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করুক এবং লোকদেরকে দ্বীন সম্পর্কে অপবাদ না দিক। শাইখ এর বক্তব্য এখানেই শেষ।

আল্লাহ তায়ালা তাকে রক্ষা করুন। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর দ্বারা এবং তাঁর ইলম দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপকৃত করেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। শাইখ এর উত্তর প্রদানের তারিখঃ ১৪ মুহাররম, ১৪১৮ হিজরী মোতাবেক ২১/০৫/১৯৯৭ ইং।

চতুর্থ সংশয়ঃ

ইউসূফ (আঃ) মিশরের রাজার পক্ষে কাজ করেছিলেন বা তার মন্ত্রী ছিলেন

এই যুক্তিটি ঐ সব গোড়ামীপূর্ণ লোকেরা দিয়েছিল যাদের গণতন্ত্রের পক্ষে অন্য কোন দলিল ছিল না। তারা বলত, ইউসূফ (আঃ) কি কাফির রাজার পক্ষে কাজ করেননি যে আল্লাহর শরীআহ্ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করত না?

সুতরাং তাদের মতে কাফির সরকারের সাথে যোগ দেয়া এবং সংসদে বা আইনসভায় অংশগ্রহণ করা এবং এই ধরনের লোকদের ভোট দেয়া বৈধ।

তাদের এই যুক্তির জবাবে যা কিছু বলব, তার সব ভাল দিক আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সব মন্দ দিক আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

প্রথমতঃ ঐ সমস্ত লোকেরা আইনসভায় বা সংসদে যোগদানকে বৈধ করার জন্যে যে যুক্তি দেয় তা অসত্য এবং ভ্রান্ত। কারণ এই সংসদ এমন সংবিধানের উপর নির্ভরশীল যা আল্লাহর দেয়া বিধান বা সংবিধান নয়; অধিকান্তু তা গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যা মানুষের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কোন কিছুকে হালাল (বৈধ) বা হারাম (অবৈধ) করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, মহান আল্লাহর নির্দেশের কোন পরোয়া করে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ "কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায় তবে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আল-ইমরান ৮৫)

অতএব, কোন ব্যক্তি কি এমন দাবি করতে পারে যে ইউসূফ (আঃ) ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন এর অনুসরণ করেছেন, অথবা তিনি স্বীয় মুওয়াহ্হিদ পূর্বপুরুষদের মিল্লাত এর বিপরীত অন্য দ্বীন এর আনুগত্য করেছেন? কিংবা তিনি একে সম্মান প্রদর্শনের জন্য শপথ করেছিলেন কিংবা তদ্রুপ আইন রচনা করেছেন?? যেমন এটা সংসদ পাগল লোকদের অবস্থা??

কিরূপে সম্ভব! অথচ তিনি দূর্বল অবস্থায় নেতৃবৃন্দ এর কাছে ঘোষনা করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেনঃ

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ﴿٣٨﴾

অর্থঃ আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। (৩৮) আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করেছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করি।

(সূরা ইউসূফঃ ৩৭,৩৮)

তিনি আরো বলেছিলেনঃ

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴿٤٠﴾

অর্থঃ (৩৯) হে কারা সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? (৪০) তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কালো ইবাদত করো না। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (সূরা ইউসূফঃ ৩৯, ৪০)

তিনি কি দূর্বল অবস্থায় এর ঘোষণা দিলেন, প্রকাশ্যে বললেন এবং এর দিকে আহ্বান করলেন, অতঃপর ক্ষমতা প্রদানের পর গোপন করলেন কিংবা এটা প্রত্যাখ্যান করলেন..........?? !!

হে সংশোধনকারীগণ আমাদেরকে উত্তর দিন........!!

অতঃপর আপনারা কি অবগত নন যে, হে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ! নিশ্চয় মন্ত্রীগণ প্রয়োগ ক্ষমতা রাখে এবং সংবিধান আইন প্রনয়নের ক্ষমতা রাখে-

তাই এটা ও ওটার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং এস্থলে উক্ত মত পোষনকারীদের কাছে কিয়াস (অনুমান) করা সঠিক হবে না।........ এর দ্বারা আপনি জানতে পারলেন যে ইউসূফ (আঃ) এর ঘটনা দ্বারা সংসদের অনুমোদনের পক্ষে দলীল দেয়া কখনও সঠিক হবে না। বর্তমানে কুফ্‌রি এর সঙ্গে চাকুরীতে অংশ নেয়ার জন্য ওর দ্বারা মন্ত্রিত্বের উপরে দলীল দেয়া বাতিল হওয়া সম্পর্কে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

দ্বিতীয়তঃ নিশ্চয় ত্বাগুতী রাষ্ট্রের ছত্রছায়ার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পক্ষে অনেক বিভ্রান্ত লোক ইউসূফ (আঃ) এর কর্মের উপরে কেয়াস করে যে, ত্বাগুতী রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা যা আল্লাহর সঙ্গে আইন রচনা করে, আল্লাহর ওয়ালীদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাঁর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে, উক্ত কিয়াস কয়েকটি কারণে অকেজো ও বাতিল।

১. নিশ্চয় আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফয়সালাকারী উক্ত প্রশাসনের ছত্রছায়ার ক্ষমতা গ্রহণ অবশ্যই তাদের মানবরচিত সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয় এবং যে ত্বাগুতকে আল্লাহ তায়ালা সর্বাগ্রে অস্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছেন এর সাথে বন্ধুত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা বাধ্য করে দেয়।

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

অর্থঃ তারা ত্বাগুত এর কাছে ফয়সালা নিয়ে যেতে চায়, অথচ ওকে অমান্য করতে তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা নিসাঃ ৬০)

বরং উক্ত পদ গ্রহণ করার পূর্বে তাদের কাছে পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষভাবে এই কুফর এর উপরে শপথ করা প্রয়োজন। যেমন এটা সংসদ সদস্যদের জন্য হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি দাবি করে যে নিশ্চয় ইউসূফ (আঃ) যিনি ছিলেন সত্যবাদী, সম্মানী, সম্মানীয় পুত্র, সম্মানী ব্যক্তির পৌত্র ঐরূপ করেছিলেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উক্ত কর্ম থেকে পবিত্র রেখেছেন।

তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

অর্থঃ তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখবার জন্যে এইভাবে নিদর্শন দেখিয়ে ছিলাম, সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউসূফঃ ২৪)

তবে সে ব্যক্তি মাখলূকাতের সবচেয়ে বড় কাফির এবং সবচেয়ে দুর্গন্ধময়। সে মিল্লাত হতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং দ্বীন হতে বেরিয়ে গিয়েছে। বরং সে ঐ অভিশপ্ত ইবলীস এর থেকে অধিক নিকৃষ্ট যে কসম খাওয়ার সময় কিছু ব্যক্তিকে বাদ রেখেছিল।

আল্লাহ বলেন (সে বলেছিল)ঃ

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

অর্থঃ (৮২) না, সে বলল আপনার ইয্‌যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। (৮৩) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। (সূরা ছোয়াদঃ ৮২, ৮৩)

কালামুল্লাহর অকাট্য প্রমাণ দ্বারা জানা যাচ্ছে নিশ্চয় ইউসূফ (আঃ) আল্লাহর খাঁটি বান্দা ছিলেন বরং তিনি তাদের নেতাদের একজন ছিলেন।

২. নিশ্চয় এ রাষ্ট্রগুলোর ছত্রছায়ায় মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণকারী ব্যক্তি সংসদীয় শপথ বাক্য পাঠ করবে অথবা করবে না। তার জন্য আবশ্যক যে, সে মানবরচিত কুফরী আইন এর কাছে অনুগত হবে এবং এটা হতে বের হয়ে যাবে না কিংবা এর বিপরীত করবে না। তখন সে নিশ্চিত তার দাসে পরিণত হবে এবং সত্য, মিথ্যা অপকর্ম যুলম ও কুফরী করার ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রণয়নকারীদের অনুগত সেবকে পরিণত হবে।

সত্যবাদী ইউসূফ (আঃ) কি অনুরূপ ছিলেন? অতএব জাতীয় কুফরী পদের অনুমোদনের জন্য তাঁর কর্মকে প্রমান স্বরূপ পেশ করা সঠিক হবে কি? নিশ্চয় যে কেউ আল্লাহর নাবী, আল্লাহর নাবীর পুত্র, আল্লাহর নাবীর পৌত্র, আল্লাহর বন্ধুর বংশধর এর সম্পর্কে এমন অপবাদ আরোপ করবে তবে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করব সে কাফির নাস্তিক ও ইসলাম হতে বহিস্কৃত।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থঃ প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছিলাম এমর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগুত হতে দূরে থাক। (সূরা নাহলঃ ৩৬)

এটাই ছিল ইউসূফ (আঃ) এবং সকল রসূলদের মূলনীতি ও বড় স্বার্থ।

অতএব এটা কি আদৌ সম্ভব যে তিনি মানুষকে আল্লাহর হুকুমের দিকে ডেকেছেন সুখের ও দুঃখের সময়ে, দুর্বল ও ক্ষমতাশালী অবস্থায়; অতঃপর

তিনি এর বিরোধিতা করে মুশরিক হয়ে গেলেন। অথচ আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন তিনি একনিষ্ঠ বান্দা ছিলেন?

কোন কোন মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

অর্থঃ রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারতো না।

(সূরা ইউসূফঃ ৭৬)

অত্র আয়াত হচ্ছে একটি দলীল যে, ইউসূফ (আঃ) রাজার আইন ও নিয়ম কানূন প্রয়োগ করেননি এবং তাকে তা মানতে বা প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হয়নি।

বর্তমানে ত্বাগুতের মন্ত্রিপরিষদ বা তাদের সংসদ কি ঐভাবে পরিচালিত যেভাবে ইউসূফ (আঃ) এর সময় পরিচালিত হত? একজন মন্ত্রী কি ঐভাবে দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজ করতে স্বাধীন? যদি তা না হয়, তাহলে এতদুভয়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না।

৩. ইউসূফ (আঃ) মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ্ আয্যা ও জাল্লা এর সাহায্যে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ

অর্থঃ এই ভাবেই আমি ইউসূফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম।

(সূরা ইউসূফঃ ৫৬)

সুতরাং, এটাই হচ্ছে আল্লাহর দেয়া কর্তৃত্ব। কোন ব্যক্তি বা রাজার ক্ষমতা ছিল না তার ক্ষতি করার বা তাকে স্বীয় পদ হতে অপসারণ করা, যদিও তিনি রাজা এবং তার বিধান ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

অতএব, ইউসূফ (আঃ) কে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দেয়ার সঙ্গে এইসব নিকৃষ্ট ও মন্দ লোকগুলোকে, যারা ত্বাগুত সরকারের বড় বড় পদে আসীন, কিভাবে তুলনা করা যায়?

৪. ইউসূফ (আঃ) রাজার কাছ থেকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়েই মন্ত্রীপরিষদে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

অর্থঃ "অতঃপর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বলল, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই তুমি আজ আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান ভাল করেছে।" (সূরা ইউসূফঃ ৫৪)

অতএব তাঁকে কোন প্রকার শর্ত বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মন্ত্রীপরিষদে কর্তৃত্ব করার জন্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ

অর্থঃ এভাবেই ইউসূফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম; তিনি সে দেশে যথা ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারতেন। (সূরা ইউসূফঃ ৫৬)

সুতরাং তাঁর কোন প্রতিপক্ষ বা বিরোধী দল ছিল না, কেউ তাঁকে তাঁর কাজের জন্য প্রশ্ন করার ছিল না।

এখনকার ত্বগুতের মন্ত্রীদের কি এমন কোন কিছু আছে যা এক্ষেত্রে তুলনাযোগ্য? যদি মন্ত্রী এমন কিছু করেন যা রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা বা রাজপুত্রের দ্বীন বা দেশের সংবিধানের বিরোধী, তাহলে তাকে মন্ত্রণালয় থেকে বরখাস্ত করা হবে। তাদের মতে মন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা বা রাজপুত্রের ইচ্ছা, তাদের নীতি বা প্রজাতান্ত্রের দাস এবং তাকে তা অবশ্যই মানতে হবে। সে কখনই রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার হুকুমকে বা সংবিধানকে অমান্য করতে বা এর অবাধ্য হতে পারবে না, যদিও তা আল্লাহর হুকুমের এবং তাঁর দ্বীনের (ইলামের) বিরোধী হয়। যে কেউ বর্তমান অবস্থাকে ইউসূফ (আঃ) এর অবস্থার মতই দাবী করবে, সে নিজের অপরিসীম ক্ষতি করবে। সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে একজন কাফির বলে বিবেচিত হবে এবং ইউসূফ (আঃ) কে আল্লাহ যে পরিশুদ্ধি করেছেন তাকে অবিশ্বাসী বলে বিবেচিত হবে।

যেহেতু বর্তমান অবস্থা ইউসূফ (আঃ) এর মত নয়, তাই এই দু'য়ের মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়। সুতরাং ত্বাগুতদেরকে তাদের নির্বোধ কথাবার্তা এবং কুটতর্ক এখানেই ত্যাগ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ এই মিথ্যা যুক্তিকে খন্ডন করার আরেকটি মারাত্নক অস্ত্র হচ্ছে, কোন কোন মুফাস্সিরীনের মতে সেই রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ছাত্র মুজাহিদ (রহঃ) তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই প্রমাণই এ ঘটনাকে ব্যবহার করার সকল যুক্তিকে বাতিল করে দেয়।

আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি যে, তাঁর কোন সৃষ্টির কথা অথবা ব্যাখা, যার কোন দলীল ও প্রমাণ নেই, তার চেয়ে আল্লাহর কিতাবের আক্ষরিক অর্থের আনুগত্য করা আরও বেশি যথার্থ। ইউসূফ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা এর কথাই আমাদের জন্য সুদৃঢ় প্রমানঃ

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

অর্থঃ "সুতরাং এইভাবেই ইউসূফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম।" (সূরা ইউসূফঃ ২১)

এটা সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গ্রন্থের অন্যত্র এই বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি মুমিনদের অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন, যখন তাদেরকে তিনি কোন ভূমিতে কর্তৃত্ব দেনঃ

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

অর্থঃ আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কার্য হতে নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে!

(সূরা হাজ্জঃ ৪১)

আমাদের এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইউসূফ (আঃ) তাদের মধ্যে একজন। শুধু তাই নয় তিনি তাদের মধ্যেও একজন মহান নেতা, যাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজের নিষেধ করে। যারাই ইসলাম সম্পর্কে জানে তাদের কারও কোন সন্দেহ নেই ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট বিষয় হল তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), যা ছিল ইউসূফ (আঃ) এর দাওয়াতের মূল বাণী এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশীদারীত্ব (শিরক) যেই ব্যাপারে ইউসূফ (আঃ) সতর্ক করেছিলেন, ঘৃণা করেছিলেন এবং অংশীদারীত্ববাদের মিথ্যা প্রভুদের ও দেবতাদের আঘাত করে ছিলেন। অবশ্যই সুনিশ্চিত নিদর্শন আছে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন ইউসূফ (আঃ) কে ক্ষমতা দান করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ, ইয়াকুব (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন এবং মানুষকে সেদিকে আহবান করেছিলেন এবং যারা এই

দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরন করত বা অসম্মতি প্রকাশ করত তাদের প্রত্যেককেই আক্রমণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর শরীয়াহ্ পরিত্যাগ করেননি। তিনি আল্লাহর শরীয়াহ বা বিধান প্রতিষ্ঠিত না করার ক্ষেত্রে কাউকে সাহায্য করেননি। তিনি কোন বিধানদাতা যারা আল্লাহর আইন বিরোধী বিধান প্রতিষ্ঠা করে তাদের এবং ত্বাগুতদের সাহায্য করেননি। তিনি তাদের এরূপ সাহায্য করেননি যেরূপ বর্তমান সময়ের ক্ষমতার দাসে পরিণত হওয়া মানুষের করছে। তিনি এমন কোন শপথ গ্রহণ করেননি যা ছিল ইসলাম বিরোধী। তিনি তাদের সাথে আইন প্রনয়নে অংশগ্রহণ করেননি যেরূপ আজকের মোহগ্রস্থ লোকগুলো সংসদে করছে। তিনি তাদের আচার আচরণ এবং কর্মপন্থা অস্বীকার ও বর্জন করেছিলেন। তিনি তাদের খারাপ কাজগুলোকে পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদের দিকে মানুষকে ডেকেছিলেন এবং তাদেরকে আক্রমণ করেছিলেন যারা এর বিরোধিতা করেছিল, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন। যে কেউ এমন বিশ্বাসযোগ্য, সম্মানজনক, মহৎ ব্যক্তিদের সন্তানের নামে এমন কিছু বর্ণনা দেয় যা আল্লাহর দেয়া বর্ণনা থেকে ভিন্ন, তাহলে সে পবিত্র ইসলাম থেকে বের হয়ে একজন অপবিত্র কাফিরে পরিণত হবে।

এ ব্যাপারে অপর এবটি দলিল হচ্ছে আল্লাহর এই কথার ব্যাখ্যাঃ

অর্থঃ রাজা (যখন এই ব্যাপারটি শুনল সে) বলল, ইউসূফকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব; যখন সে (রাজা) তাঁর (ইউসূফ (আঃ) সাথে কথা বলল, সে বলল, নিশ্চয়ই আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছে। (সূরা ইউসূফঃ ৫৪)

কেউ কি চিন্তা করতে পারে রাজার সাথে ইউসূফ (আঃ) কি বিষয়ে কথা বলেছিলেন; তিনি কি রাজাকে তার ভালবাসার জন্যে তাকে ক্ষমতা দেয়ার জন্যে; তাকে বিশ্বাস করার এবং তার প্রতি আস্থা রাখার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন?

তিনি কি মন্ত্রী আল আযীয এর স্ত্রীর ঘটনার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, যে ঘটনার সমাপ্তি হয়েছিল সকলের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে? অথবা তিনি কি জাতীয় ঐক্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন!! না অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে???

কেউই এমন দাবী করতে পারবে না যে তার অদৃশ্যে জ্ঞান আছে অথবা কেউ প্রমাণ ছাড়া কথা বলতে পারেনা। যদি সে তা করে, সে একজন মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে। কিন্তু এই- আয়াত "যখন সে তাঁর সাথে কথা বলেছিল"– এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থঃ প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল প্রেরণ করেছিলাম এমর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদাত কর এবং তৃগুত হতে দূরে থাক। (সূরা নাহলঃ ৩৬)

এবং আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, আপনি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করলে আপনার সমস্ত আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হবেন। (সূরা যুমারঃ ৬৫)

এবং তাঁর (তায়ালা) কথার মাধ্যমে ইউসূফ (আঃ)-এর দাওয়াত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴿٣٧﴾وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ﴿٣٨﴾

অর্থঃ (৩৭) যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্যাস করেনা এবং আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। (৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইস্হাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি, কোন বস্তুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। (সূরা ইউসুফ ৩৭, ৩৮)

এবং আল্লাহ তায়ালার তাঁর সম্পর্কে বক্তব্যঃ

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴿٣٩﴾مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴿٤٠﴾

অর্থঃ (৩৯) ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? (৪০) তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলি নামের ইবাদাত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো। এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই, বিধাণ দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, আর কারো ইবাদাত করবে না, এটাই সরল সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (সূরা ইউসুফঃ ৩৯, ৪০)

অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই ইউসুফ (আঃ)-এর মহান বক্তব্য। এটি তাঁর মহা মুল্যবান দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) এবং এটাই তাঁর দাওয়াতের, তার দ্বীন ও তাঁর পিতৃপুরুষদের দ্বীনের ভিত্তি। অতএব যখন তিনি কোন সৎ কাজের আদেশ করেছিলেন, তাহলে এটিই বড় সৎকাজ যা তিনি সম্পাদন করেছিলেন এবং যদি তিনি কোন অসৎ কাজের নিষেধ করে থাকেন, তাহলে তাঁর মধ্যে শির্কের চেয়েও অধিক কোন খারাবি হতে পারে না, যা তা এই মূলনীতির বিরোধিতা-(তাওহীদের) করে থাকে। সুতরাং যখন এটা সত্য বলে গৃহীত হবে এর তাঁর প্রতি রাজার উত্তর হচ্ছেঃ

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্থ হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ।" (সূরা ইউসুফঃ ৫৪)

তাহলে এটা স্পষ্ট প্রমান যে, রাজা তার অনুসরণ করেছিল, তাঁর সাথে এক মতও হয়েছিল, শির্কী মিল্লাত (জীবন ব্যবস্থা) পারিত্যাগ করেছিল এবং ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)-এর মীল্লাত (দ্বীন)-এর অনুসরণ করেছিল।

ধরে নেই যে, অন্তত রাজা ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর পিতার তাওহীদ ও দ্বীন যে সঠিক সে ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছিল। সে তাঁকে বলার স্বাধীনতা, তাঁর দ্বীনের দিকে আহ্বান করার অনুমতি এবং যারা এর বিরোধী তাদের আক্রমণ করার অনুমতি দিয়েছিল। এবং রাজা তাঁকে কোন বাধা দেয়নি এই কাজগুলো করার জন্য, না তাঁকে তাঁর দ্বীনের বিপরীত কোন কিছু করার জন্য আদেশ করেছিল। তাহলে ইউসুফ (আঃ) এর অবস্থা ও আজকে যারা তৃগুতের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে আছে, আর যারা তাদের সাহায্য করে

সংসদে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে, তাদের অবস্থার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থতঃ যদি আপনি উপরোক্ত সব কিছু জানেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত যে, ইউসুফ (আঃ)-এর মন্ত্রনালয়ে অংশগ্রহণ একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের সাথেও সাংঘর্ষিক ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ের ত্বগুতের মন্ত্রনালয়ে অংশ গ্রহণ তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক।

ধরে নেই, রাজা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কাফেরই ছিল। তারপরও ইউসুফ (আঃ)-এর শাসনভার গ্রহণ করা একটা ছোট বিষয়, এটা প্রধান বিষয় হতে পারেনা, কারণ এটা হয়তোবা দ্বীনের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না। কারণ ইউসুফ (আঃ) কোন প্রকার কুফরী বা শিরক করেনি। তিনি কাফেরদের অনুসরণ করেননি অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বিধান মেনে নেননি। তিনি মানুষকে তাওহীদের দিকে ডেকেছিলেন।

শরীয়াতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

অর্থঃ "আমি তোমাদের প্রত্যেক (সম্প্রদায়)-এর জন্য নির্দিষ্ট শরীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা মায়িদহঃ ৪৮)

এমনকি নবীদের শরীয়াহ শাখাগতভাবে ভিন্ন ভিন হতে পারে কিন্তু তারা সবাই তাওহীদের ক্ষেত্রে এক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমরা সব নবীর দল পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সবারই দ্বীন এক। (বুখারী)

তিনি বুঝিয়েছেন যে, তাদের সকলেই তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ছিলেন এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে এবং শরীয়াহ-এর ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল। সুতরাং কোন একটি জিনিস আমাদের পূর্বের কোন শরীয়াহ অনুসারে হারাম হতে পারে কিন্তু আমাদের শরীয়ায় তা হালাল হতে পারে। যেমন গণীমতের মাল। অথবা বিপরীতটাও সত্য হতে পারে; অথবা তা পূর্ব জাতিদের জন্য কঠিন ছিল অতঃপর তা আমাদের জন্য সহজ করা হয়েছে। সুতরাং অতীতের সমস্ত আইনই আমাদের আইন নয়, বিশেষকরে যখন তা আমাদের শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক (পরস্পরবিরোধী) হয়।

এরূপ একটি সাংঘর্ষিকতার নিদর্শনস্বরূপ বলা যায়, যা ইউসূফ (আঃ) এর জন্য বৈধ ছিল, তা আমাদের জন্য অবৈধ। ইবনে হিব্বান তা সহীহ্ গ্রন্থে

এবং আবূ ইয়ালা এবং আত-তাবারানীতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "শীঘ্রই নির্বোধ শাসকেরা তোমাদের কাছে আসবে। খারাপ লোকেরা হবে তার সঙ্গী এবং তারা সালাত বিলম্বে আদায় করবে। তোমাদের মধ্যে যারাই তা অনুধাবন করবে, তারা যেন তাদের উচ্চ পদে আসীন না হয় বা তাদের কর্মচারী না হয় অথবা তাদের সংগ্রকারী অথবা কোষাধক্ষ না হয়।"

এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই শাসক কাফের নয়, কিন্তু তারা হবে অসৎ চরিত্রের এবং নির্বোধ।

একজন সতর্ককারী সাধারণত সবচেয়ে বড় অন্যায় এবং গর্হিত কাজ সম্পর্কে সতর্ক করে। তাই যদি তারা কাফের হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা উল্লেখ করতেন। কিন্তু তাদের সবচেয়ে খারাপ কাজ যা রসূল (সাঃ) এখানে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে তারা সবচেয়ে খারাপ লোকদেরকে বন্ধু বানাবে এবং সালাতে শৈথিলতা প্রকাশ করবে। এরই কারণে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের কাউকে তাদের কোষাধক্ষ বা মন্ত্রি হতে অনুমতি দেননি। সুতরাং যদি আমাদের আইনে অত্যাচারি শাসকের কোষাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করা নিষিদ্ধ এবং অবৈধ হয়ে থাকে, তবে কিভাবে একজন কাফের রাজা এবং মুশরিক শাসকের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করা বৈধ হবে?

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ "আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রধান করুন, আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।" (সূরা ইউসুফঃ ৫৫)

এটা সত্য এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, এটা পূর্ববর্তী লোকদের দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এটাকে আমাদের আইনে বাতিল করা হয়েছে এবং আল্লাহই ভাল জানেন। এটাই পর্যাপ্ত হওয়া উচিত তার জন্য যে হেদায়াত চায়, কিন্তু যে তার নিজের চিন্তা ভাবনা, মানুষের মাতামত এবং কথাকে দীলল এবং প্রমান থেকে বেশী প্রাধান্য দেয় সে সুনিশ্চিতভাবে হেদায়াত পাবেনা।

وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

অর্থঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। (সূরা মায়িদাহঃ ৪১)

পরিশেষে, এই অসার অমুলক যুক্তি শেষ করার পুর্বে আমরা কিছু মোহগ্রস্থ ব্যক্তিদের একটি বিষয় জানাতে চাই-যাদের শিরক ও কুফর প্রামাণিত হয় কুফরী মন্ত্রণালয়ে যোগদানের ব্যাপারে শাইখ- উল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার উক্তিকে তাদের যুক্তি ও অযুহাতের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। এটা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যার সাথে সত্যের সংমিশ্রণ।

এটা শাইখ-এর উপর অপবাদ এবং তার সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া ছাড়া কিছুই নয়। তিনি এই ঘটনা উল্যেখ করে সংসদে অংশ গ্রহণ এবং কুফরী করার অথবা আল্লাহর বিধান প্রয়োগ না করার দলীল হিসাবে তা ব্যবহার করেননি। না, আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মুসলিম শাইখ তাঁর দ্বীন এবং তাঁর অন্তর এই খারাপ দাবী থেকে মুক্ত, যা পরবর্তী কালের ভণ্ড লোকেরা ছাড়া আর কেউই তা দাবী করতে পারেনা। আমরা এটা বলছি কারণ কোন জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান এই ধরণের বক্তব্য দিতে পারেনা।

কাজেই শাইখের মতো একজন আলেম কিভাবে এটা বলতে পারেন, যদিও এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার এবং পুরুপুরিভাবে আপোষহীণ। তার সমস্ত বক্তব্যের মূল লক্ষ ছিল দুটি কাজের মধ্যে জঘন্যতমটি প্রতিরোধ করা এবং দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মধ্য থেকে যেটা উত্তম তা গ্রহণ করা। আপনি জানেন যে, দুনিয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহর সাথে শরীক করা। বর্নিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এবং ভাল কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথা আল হিসবাহ অর্থাৎ বিভিন্ন কাজের উপর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করতেন।

(মাজমু আল-ফাতাওয়াঃ ২৮ তম খণ্ড ৬৮ পৃঃ)

ইউসুফ (আঃ) এর কাজের বর্ণনায় তিনি (ইবনে তাইমিয়া) বলেছেন, "তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাদেরকে ইমানের দিকে ডেকেছেন যতটুকু তাঁর পক্ষে সম্ভব।"

তিনি আরো বলেছেন, "কিন্তু তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজ সম্পাদন করেছিলেন।"

(মাযমু আল ফাতওয়া ২০ তম খণ্ড ৫৬ পৃঃ)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ উল্লেখ করেননি যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর পাশাপাশি বিধান দিয়েছিলেন বা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান

দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন করেছিলেন বা তিনি গণতন্ত্রের আথবা এমন দ্বীনের (জীবন ব্যাবস্থা) অনুসরণ করেছেন যা আল্লাহর দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক। বর্তমানে মোহগ্রস্থ ব্যক্তিরা তার কথার সাথে তাদের কুৎসিত প্রমানের মিশ্রণ ঘটায় এবং সাধারণ মানুষদেরকে বিপথে নেয়ার জন্যে মিথ্যাযুক্তি দাঁড় করায়। তারা মিথ্যার সাথে সত্যকে এবং অন্ধকারের সাথে আলোর সংমিশ্রণ ঘটায়।

আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে যে দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে তা হল, আল্লাহর বাণী এবং তার রসূল (সাঃ)-যিনি আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক। আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর কথার পর অন্য কারো কথা গ্রহণ করা হতে পারে, নাও পারে। একারণেই যদি এই কথা শাইখুল ইসলাম ইব্নে তাইমিয়ারও হয় তারা যেরূপ দাবী করেছে যা তার চেয়েও বড় কোন আলেমরও হয় আমরা তা গ্রহণ করব না যতক্ষণ না তারা প্রমাণ দিতে পারে।

যেরূপ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ

অর্থঃ "বলুনঃ আমি তো কেবল ওয়াহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৪৫)

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

অর্থঃ "বলঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।" (সূরা বাকারাঃ ১১১)

কাজেই নিজের তাওহীদকে শক্ত হাতে ধরে রাখুন। শিরকের অনুসারীদের এবং তাওহীদের শত্রুদের বিপথগামী মিথ্যা প্রচারণার দিকে মনোনিবেশ করবেন না। আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণ করে এমন লোকের মত হয়ে যান, যেসব লোকদের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী (সাঃ) বলেছেনঃ

"তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যারা তাদের বিরোধিতা করবে অথবা তাদেরকে ত্যাগ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহর পরিবর্তে নির্ধারিত দিবস আসে, সে সময় পর্যন্ত তারা ঔ (সত্য) পথেই অটল থাকবে।"

((বুখারী ফতহুল বারী, ১৩শ খণ্ড, ৯৫ পৃঃ) (উত্তর প্রদান করেছেন ফযিলাতুশ শাইখ, আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসী, গণতন্ত্র একটি দ্বীন নামক গন্থে; ১২-১৭ পৃঃ))

পঞ্চম সংশয়ঃ

যদিও নাজ্জাসী আল্লাহর শরীআহ প্রয়োগ করেনি, তথাপি সে মুসলিম ছিল।

(উত্তর প্রদান করেছেন, ফাজিলাতুশ শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী স্বীয় গ্রন্থ গণতন্ত্র একটি দ্বীন এর মধ্যে; ১৮-২০ পৃঃ)

রাজনৈতিক দলগুলো, হোক না তারা ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী বা বিরোধী দল, নাজ্জাসীর ঘটনাকে ব্যবহার করে তাগুতের কার্যবলীকে বৈধ করার জন্য তারা বলেঃ "নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণের পর তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করেননি এবং এরপর রসূল (সাঃ) তাকে আল্লাহর ন্যয়নিষ্ঠ দাস বলেছেন, তার জন্য জানাযার সালাত পড়েছিলেন এবং সাহাবীদের তাই করতে আদেশ করেছিলেন।

সফলতা আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, এই ব্যপারে আমাদের কথা হলঃ

প্রথমতঃ যারা এই প্রতারণামূলক যুক্তিটি দেখান, সর্ব প্রথম তাদেরকে যাচাই ও সঠিক দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে, নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণের পরও আল্লাহর দেয়া বিধান প্রয়োগ করেননি। আমি তাদের যুক্তিটি বিচার বিশ্লেষণ করার পর যা জানলাম তা হল অসত্য বিবৃতি ও ভিত্তিহীন আবিষ্কার যা কিনা সত্যিকারে বা যাচাই যোগ্য কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

আল্লাহ বলেনঃ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

অর্থঃ "বল: যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।" (সূরা বাকারাঃ ১১১)

যদি এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আনয়ণ করতে না পারে তবে তারা সত্যবাদী নয় এবং মিথ্যাবাদী।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের মতে এবং যারা আমাদের বিরোধীতা করেন তাদেরও মতে এবিষয়টি সত্য যে নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন ইসলামের হুকুম পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদাঃ ৩)

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বিদায় হজ্জের সময়, কিন্তু নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন তার বহু পূর্বে যেরূপ হাফিজ ইবনে কাসীর এবং অন্য আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩য় খণ্ড, ২২৭ পৃ ঃ)

সুতরাং সেই সময় তার জন্য কর্তব্য ছিল আল্লাহর বিধান যতটুকু জানা ততটুকু অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করা; আনুগত্য করা এবং কার্য সম্পাদন করা। এই ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় ছিল আল-কুরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌছানো মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

অর্থঃ "এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌছাবে তাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি।" (সূরা আনআমঃ ১৯)

সেই সময় যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এ রকম ছিলনা যা আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি। কিছু হুকুম কারও কাছে পৌছাতে কয়েক বছর লেগে যেত এবং কোন কোন সময় এমন হতো যে, রসূল (সাঃ) এর কাছে না আসা পর্যন্ত কোন কোন হুকুম জানাও যেত না।

সুতরাং সেই সময় দ্বীন ছিল নতুন এবং আল কুরআন তখনও নাযিল হচ্ছিল। সেই কারনেই দ্বীন তখনও পরিপূর্ণ হয়নি। এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে; আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "আমরা রসূল (সাঃ)- কে সলাতের মধ্যে সালাম দিতাম এবং তিনি তার উত্তর দিতেন। কিন্তু নাজ্জাসীর কাছ থেকে ফিরে আসার পর আমরা তাকে সালাম দিলাম কিন্তু সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি বলেনঃ "সালাতের একটা উদ্দেশ্য আছে।"

যে সমস্ত সাহাবীরা ইথিওপিয়ায় ছিলেন, যা ছিল নাজ্জাসীর পাশে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হুকুমের অনুসরণ করে আসছিলেন কিন্তু এ সংবাদ পৌছেনি যে সালাতের মধ্যে কথা বলা এবং সালাম দেয়া নিষেধ হয়ে গিয়েছিল; যদিও সালাত একটি ফরজ হুকুম এবং রসূল (সাঃ) প্রতিদিন দিনে পাঁচবার করে সালাতের ইমামতি করেছিলেন। অতএব সকল ইবাদত আইন-

কানুন এবং হুদূদ (শাস্তি)-এর অবস্থা কিরূপ হবে যেগুলো সালাতের মত বার বার করা হয়নি ???

অতএব, আজ যারা শিরকী মতবাদে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তারা কী এমন দাবী করতে পারবেন যে তার কাছে কুরআন ও ইসলাম অথবা দ্বীন পৌছেনি? তারা কিভাবে তাদের এই অবস্থানকে নাজ্জাসীর ঐ অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করবে যখন ইসলাম পরিপূর্ণ ছিলনা???

তৃতীয়তঃ এটা জানা কথা যে নাজ্জাসী আল্লাহর হুকমের যতটুকু যানতেন ততটুকু প্রয়োগ করতেন; আর যে কেউ এর বিপরীত কথা বলবে, তাকে প্রমাণ ছাড়া কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না।

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

অর্থঃ "বল; যদি তোমরা সত্যবাদি হও তবে তোমাদের প্রমান পেশ কর।" (সূরা বাকারাঃ ১১১)

কারণ ইতিহাসের প্রমাণাদি আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে তিনি সেই সময় আল্লাহর আইন সম্পর্কে যতটুকু জানতেন ততটুকু প্রয়োগ করতেন।

১। সেই সময় তাকে আল্লাহর যে সব হুকুম মানতে হত তার একটি হলঃ "আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করা এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)- কে আল্লাহর রসূল হিসাবে মান্য করা এবং ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর দাস ও রসূল বলে বিশ্বাস করা। তিনি তা করেছিলেন কিন্তু আপনি কি তা দেখতে পান তাদের প্রমাণে? নাজ্জাসীর যে চিঠিটি তিনি রসূল (সাঃ) কে দিয়েছিলেন তা তারা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

ওমর সুলাইমান আল আসকার তার পুস্তিকা "হুরুমুল মুশারাকাহ্ ফিল ওয়াযারাহ ওয়াল মাজালিসিন নিয়ারিয়াহ" ৭১ পৃষ্টায় তা উল্লেখ করেছেন। (এটি) যাদুল মায়াদ গ্রন্থে ৩য় খণ্ডে ৬০পৃষ্টাঃ বর্ণিত আছে।

২। তাঁর রসূল (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং হিজরাত করার জন্য অঙ্গিকার: পূর্বের চিঠিতে সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, নাজ্জাসী বলেছিলেনঃ "আমি রসূলের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গিকার করছি" এবং তার ছেলে জাফর (রাঃ) এবং তার সঙ্গিদের কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তিনি জাফর (রাঃ) এর সাহায্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এই চিঠিতে উল্লেখ ছিল যে নাজ্জাসী তার ছেলে আরিহা ইবনে আসহাম ইবনে আবজারকে রাসূল (সাঃ) এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এতে আরো উল্লেখ ছিল যে, "ও আল্লাহর রসূল (সাঃ) যদি আপনি চান আমি আপনার কাছে চলে আসি, আমি অবশ্যই তা করব, কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনার কথা সত্য।" তারপরই তিনি মারা যান, অথবা রসূল (সাঃ) সেই সময় চাচ্ছিলেন না যে তিনি তা করুক। এই সমস্ত ব্যপারগুলো পরিষ্কার নয় এবং এই ঘটনার কোন সঠিক প্রমান নেই। সুতরাং এই ধরনের কোন রায় এবং একে একটি দলীল হিসাবে ব্যবহার করা গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকন্তু, তা তাওহীদ ও ইসলামের মূলনীতির বিরোধী হয়ে যাবে।

৩। রসূল (সাঃ) ও তার দ্বীনকে সাহায্য করা এবং তাঁর আনুগত্য করাঃ নাজ্জাসীর কাছে যারা হিজরত করে গিয়েছিলেন, তিনি তাদের সাহায্য করেছিলেন। এবং তাদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে পরিত্যাগ করেননি। তিনি তাদেরকে কুরাইশদের হাতেও তুলে দেননি। তিনি ইথোপিয়ান খ্রীষ্টানদের তাদের ক্ষতি করতে দেননি, যদিও ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাদের আকীদাহ সঠিক ছিল।

আরও একটি চিঠি ছিল যা নাজ্জাসী রাসূল (সাঃ) কে প্রেরণ করেছিলেন (ওমর আল-আসকার এই চিঠিটির কথাও উক্ত পুস্তিকাতে উল্লেখ করেছেন) যাতে উল্লেখ ছিল যে, তিনি তার ছেলেকে ৬০ জন ইথোপিয়ান লোক সহ রাসূল (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন-তাঁকে সাহায্য, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্যে।

তথাপিও ওমর আল-আসকার সহসা তার উক্ত পুস্তিকাতে বলে যে, নাজ্জাসী আল্লাহর দেয়া বিধান প্রয়োগ করেননি, যা কিনা একটি মিথ্যা এবং একজন মুওয়াহীদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, সেই সময় তিনি যতটুকু আল্লাহর হুকুম জেনেছিলেন ততটুকু প্রয়োগ করেছিলেন। এবং যে এটা ছাড়া অন্য কিছু বলবেন, আমরা তা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সুনিশ্চিত দলীল দিতে পারেন। অন্যথায় সে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবেঃ "বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"

তিনি (উমর আল-আসকার) তার দাবীর পক্ষে কোন সুনিশ্চিত দলীল দেননি। কিন্তু তিনি তার প্রমাণের জন্যে কিছু ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ

করেছেন এবং আমরা সকলেই জানি এইসব ইতিহাস গ্রন্থের অবস্থা; আর তা নিঃসন্দেহে ঘোলাটে বা অনিশ্চিত তথ্য সম্বলিত।

চতুর্থতঃ নাজ্জাসীর অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি যখন দেশের শাসক, তিনি কাফির ছিলেন এবং তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন তার রাজত্ব চলাকালে। তিনি তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন পরিপূর্ণভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তার পুত্রকে প্রেরণ করা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে কিছু লোকবল প্রেরণ, এবং হিজরত করার জন্যে রসূল (সাঃ) এর কাছে অনুমতি চাওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এবং তার দ্বীনকে সাহায্যে করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল তার অনুসারীদের সাহায্য করা। আপাত দৃষ্টিতে তিনি সব ত্যাগ করেছিলেন যা ছিল ইসলাম বিরোধী। তিনি সত্যকে জানার এবং দ্বীনকে শেখার চেষ্টা করেছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত। যা ঘটেছিল দ্বীনের বিধান পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং তার কাছে পরিপূর্ণরূপে পৌঁছানোর পূর্বে। এই ব্যপারটি রসূল (সাঃ) এর বাণী থেকে এবং এ সম্পর্কিত সঠিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত। যারা এ ব্যাপারে একমত নন তাদের প্রত্যেককে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তাঁরা যা বলে তা প্রমাণ করার জন্যে সঠিক দলিল দিন। কারণ শুধুমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ কোন দলিল হতে পারে না।

যে পরিস্থিতির সঙ্গে তারা বর্তমান পরিস্থিতিকে তুলনা করেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিন্ন। এটা হচ্ছে এমন একদল লোকের ব্যাখ্যা, যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে, আর তারা ত্যাগ করছে না যা ইসলামের বিপরীত বা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা ইসলামের উপর আছে বলে দাবী করছে, অথচ একই সময়ে তারা ধরে রেখেছে যা ইসলামের বিপরীত এবং এটা নিয়ে তারা গর্ববোধ করছে।

তারা নাজ্জাসী যেভাবে খৃষ্টধর্ম প্রত্যাখান করেছিলেন, সেভাবে গণতন্ত্রের দ্বীনকে প্রত্যাখান করেনি। বরং গণতন্ত্রের পক্ষে দেয়া বক্তব্যসূমহ প্রচারনায় মোহগ্রস্থ হয়ে মানুষদেরকেও এই মিথ্যা দ্বীনের প্রতি আহ্বান করছে। তারা নিজেদেরকে আলিহা'তে পরিণত করে, মানুষের জন্যে আইন প্রণয়ন করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন দিনও অনুমতি দেননি। তারা মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সাথে তাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে একমত হয়ে তাদের কাজে যোগদান করে, তারা কাফিরদের সাথে তাদের তৈরী সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করছে। তারা এই সংবিধানকে অনুসরণ করছে এবং তাদেরকে ঘৃণা করছে

যারা এই সংবিধানকে আক্রমণ বা প্রত্যাখ্যান করে। তারা দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পরে এবং তাদের কাছে আল কুরআনের বাণী রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ পৌছানোর পরেও এই সবকিছু করছে।

আপনি যেই হোন না কেন, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলতে বলছি এটা কি ন্যায় সংগত যে, এই মিথ্যা অন্ধকারময়, দুর্গন্ধময় পরিস্থিতিকে এমন একজন মানুষের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা, যে কিনা ইসলামের সঙ্গে বেশীদিন ধরে পরিচিত নয়। যে কিনা সত্যের সন্ধান করেছেন এবং সাহায্য করেছিলেন দ্বীনকে তা পরিপূর্ণ হওয়ার এবং তার কাছে পৌছানোর পূর্বে। কতই না ব্যবধান এই দুই পরিস্থিতির মানুষগুলোর মধ্যে।

হ্যাঁ তারা হয়তো বুঝাতে চায় দু'টি পরিস্থিতি একই, কিন্তু তা সত্যের মাপকাঠিতে নয়। এই দুই অবস্থা সমান হতে পারে বাতিলের মানদন্ডে যাদের উপর থেকে আল্লাহ তার হেদায়াত বুঝার বোধশক্তি উঠিয়ে নিয়েছেন। তাদের ইসলাম বিরুধী গণতন্ত্র নামক দ্বীন বিশ্বাসের কারণে।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

অর্থঃ (১) দূর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। (২) যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয়। (৩) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুণরুত্থিত হবে। (৫) সেই মহাদিবসে।

(সূরা মুতাফ্ফিফীনঃ ১-৫ আয়াত)

৬ষ্ঠ সংশয়ঃ

বর্তমান পদ্ধতিকে কাফির আখ্যায়িত করা যায়না। কেননা এটা আইন প্রনয়ণের জন্য প্রতিষ্ঠিত নয়; এটা তো পূর্ববর্তীদের আইন কানুনের উওরাধিকারী হয়েছে

(উত্তর প্রদান করেছেন ডঃ ছালাহ আস-ছাবী স্বীয় গ্রন্থঃ "ফা'লাম আন্নাহু লা-ইলাহা ইল্লালাহ" ৯০-৯১পৃষ্ঠায়)

কোন কোন সময় কিছু কিছু লোকের কাছে এইকথা উদয় হয়, এই পদ্ধতি বিধান প্রত্যাখান করার জন্য এবং ইসলামের আইনকে পরিবর্তন করার জন্য সুচনা করা হয়নি। এটা তো পূর্বের মতাদর্শের উত্তরাধিকারী হয়েছে এবং এটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে।

নিঃসন্দেহে এই সংশয় প্রকাশ করে লোকদের একটি বড় দল এর উপরে নির্ভর করছে। তারা জেনেশুনে সন্দেহ ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করুক, কিংবা এর দ্বারা তারা ফিতনায় পতিত হয়ে মনে করছে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করছে তারা সমান অপরাধী।

দুটি মাস্আলায় এর উত্তর রয়েছেঃ-

প্রথম মাস্আলাহ্ঃ-

দ্বীনে ইসলাম এবং সকল রসূলের দ্বীন হতে এটা নিশ্চিত জানা বিষয় যে, যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম সত্যকে অস্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও অনুসরণের মাধ্যমে অন্যের নিকট থেকে এর উত্তরাধিকারী হবে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।

সুতরাং সর্বপ্রথম তাওরাত ও ইনজীল এর পরিবর্তন করা এবং পরবর্তীতে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা এর উত্তরাধিকারী হবে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বিকৃতি প্রদান করবে এবং এর অনুসরণ করবে। এবং যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মূর্তি পূজার প্রচলন ঘটিয়েছে এবং পরবর্তীতে অন্ধ অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যেমে যারা এর পূজা করেছে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এবং কোন পার্থক্য হবে না আমর ইবনে লুহা এর মধ্যে, যে সর্ব প্রথম ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীন পরিবর্তন করেছে। অতঃপর হিজাজে মূর্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং আল্লাহর পরিবর্তে এর পূজা করার জন্য লোকদেরকে আহ্বান

করেছে এবং দ্বীনের এমন আইন কানুন নির্ধারণ করেছে, আল্লাহ যার কোন অনুমতি প্রদান করেননি এবং ঐ ব্যক্তির মধ্যে যে পরবর্তীতে আরবদের মধ্যে উক্ত কর্মে তার অনুসরণ করেছে।

ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষ যে কর্মে লিপ্ত হয়েছিল উক্ত কারণে আহলে কিতাবকে কুরআনে কারীম সম্বোধন করেছিল। এটা তো এজন্য ছিল যে, তারা ওটাকে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ওর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাই বিশ্বাস করি। এবং তা ছাড়া যা রয়েছে তা তারা অবিশ্বাস করে, অথচ এটা সত্য, তাদের সাথে যা আছে এটা তারই সত্যতা প্রতিপাদক, তুমি বল যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে তবে ইতিপূর্বে কেন আল্লাহর নবীগনকে হত্যা করেছিলে? (সূরা বাকারাঃ ৯১)

তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা যদি তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এর প্রতি ঈমানের দাবী সম্পর্কে সত্যবাদী হও তবে তোমরা ঐ নবীদেরকে কেন হত্যা করেছিলে, যারা তোমাদের সামনে রক্ষিত তাওরাতকে সত্যায়নের জন্যে এসেছিলেন, অথচ আমি তোমাদেকে তাদের অনুসরণ করতে এবং তাদেরকে সত্য বলে মেনে নিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম? এটা নবী (সাঃ)এর যুগে ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এটা জানা কথা যে, এদের কেউ উক্ত অপরাধে জড়িত ছিল না। এটি এমন একটি বিষয় যা ইতিপূর্বে তাদের পূর্বপুরুষেরা করেছিল। অতঃপর এর দ্বারা তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তারা উক্ত কর্মে সন্তুষ্ট ছিল এবং এর সমর্থনে তাদের স্বীকৃতি ছিল। কুরআনে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় মাস্আলাহ্ঃ-

এটা বলাঃ নিশ্চয় এই পদ্বতি পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে। আর এটা সন্তুষ্টি ও অনুসরণের সংশয়কে খণ্ডন করছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

যে ব্যক্তি এর সূচনা করেছে এর সম্পর্কে উক্ত হুকুম সহীহ্ বলে প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্বের কুফরী মতবাদের উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি এর থেকে বের হয়ে যাওয়া, একে অস্বীকার করা ও এর সাথে সম্পর্কহীন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, অতঃপর এটাকে পরিবর্তন করার ও এটাকে অপসারণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, নিঃসন্দেহে তার উপর পূর্বের হুকুম ফিরে আসবেনা এবং অন্য ব্যক্তি যে অপরাধ করেছে সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। বরং যদি সত্যবাদী হয় তবে সে মুজাহিদীনদের পথে চলবে।

কিন্তু যদি সে চালাকী করে ও দিক পরিবর্তন করে ঈমানের দাবী করে এবং পরিবর্তন করার দিকে মনোনিবেশ করার দাবী করে, এর সাথে অসুস্থ ও গুরুত্বহীন আমলকে প্রাধান্য দেয়, অতঃপর তার ভূল বাতিল এর দিকে মোড় নেয়, যার সামনে ও যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, যাকে রক্ষা করার কারণে এবং যার পক্ষে বিবাদ করার নিমিত্তে সে উত্তরাধীকারী সূত্রে লাভ করেছে, বরং সে এর ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব ও দুশমনী করে। অতএব, যে ব্যক্তি তার আইন ও মতাদর্শের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাকে কাছে নেয় ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি এর প্রতি খারাপ ধারণা রাখে তাকে দুরে ঠেলে দেয় ও শত্রুতা করে বরং সত্যের দিকে আহবান করে এমন প্রত্যেক আওয়াজকে শ্বাসরোধ করে এবং দ্বীন প্রতিষ্টা ও শরীয়তকে বাধ্যতামুলক গ্রহণ করার লক্ষে কর্মরত প্রত্যেকটি দাওয়াতকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। অতএব, তখন ঐ কথা যার প্রতারনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, এর পক্ষপাতিত্ব করা বৈধ হবে না। যে দাওয়াত এর বাতিল হওয়া প্রকাশ পেয়েছে এবং যার মিথ্যা দাবীর মুখোশ উম্মোচিত হয়েছে এর পক্ষে সমর্থন করা বৈধ হবে না। বরং এই সকল লোক ঐ ধর্মহীনদের সাথে মিশে যাবে। অধিকাংশ আলেমদের মতে তাদের তাওবা গ্রহণ করা হবে না।

ভিন্ন সংশয়সমূহ

সংশয়ঃ এই শাসকদের কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে কিংবা অন্য বিধান দ্বারা ফয়সালা করা বৈধ মনে করে।

উক্ত সন্দেহ তিনটি কারণে অগ্রহণীয়ঃ-

১। নিশ্চয় অস্বীকার করা ও হালাল মনে করা কাফির আখ্যায়িত করার কারণ সমূহের অন্যতম। তা সত্ত্বেও যে সকল আয়াত শাসকদের কাফির হওয়ার প্রমাণ করেছে ঐ আয়াতগুলোর মধ্যে এটা (অস্বীকার করা ও হালাল মনে করা) কাফির প্রতিপন্ন করার কারণ নয়। যেমনঃ (যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না....) অত্র আয়াতে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করা এবং অন্য মতবাদ দ্বারা ফায়সালা করাকে কাফির হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর বাণীঃ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ

অর্থঃ তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদিগকে তাদের রব বা পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা তাওবাঃ ৩১)

তাঁর বাণী ঃ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

অর্থঃ যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আনআমঃ ১২১)

অত্র আয়াতদ্বয়ে রচিত বিপরীত আইন এর আনুগত্য করাকে কাফির হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। নিশ্চয় স্বয়ং ঐ সকল গুনাহ যার দ্বারা তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হয়, যেমনঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফায়সালা করা, এর সাথে অস্বীকার বা হারাম মনে করলে তবে কাফির আখ্যায়িত করা হবে, এরূপ শর্তারোপ করা হয়নি। বরং যে ব্যক্তি এরূপ শর্তারোপ করবে সে তো সীমালজ্ঘনকারী মুর্জিয়াদের ন্যায় কথা বলল, যাদেরকে সালফে সালেহীন কাফির বলেছেন।

৩। মানবরচিত আইনে ফায়সালা করার ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যাকে হালাল মনে করে করা হয় যে জন্য তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে।

(আল জামী ফী ত্বালাবিল ইলমিশ শরীফ,
শাইখ আব্দুল কাদের ইবনে আব্দুল আযীয প্রণীত ৯১১-৯১৩ পৃঃ)

সংশয়ঃ- মানবরচিত আইন যার দ্বারা আমল করা হয়, এর মধ্যে কিছু কিছু ইসলামী শরীয়াতের বিধান রয়েছে।

এটা তাদের কাফির হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে না (এটা এই জন্য যে, আল্লাহ তায়ালার বাণীতে যে ধমকী বিদ্যমান–

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৪)

এটা আল্লাহর বিধান সমুহের মধ্য হতে একটি বিধান পরিবর্তনের উপরে সাব্যস্ত হয়েছে। এটা হচ্ছে "বিবাহিত যেনাকারীর শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। এই ধমকীর আওতায় আসার জন্য দ্বীনের সকল বিধানকে পরিবর্তন করা আবশ্যক নয়।" যেমন- আবু হাইয়ান আন্দালুসীর প্রতিবাদ ও আবদুল আযীয কেনানী এর প্রতিবাদে আবদুল কাইয়্যূম এর আলোচনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এটাকে আমি ৬ষ্ঠ মাসআলার শেষে উল্লেখ করেছি। (আল জামী ফী ত্বালাবিল ইলম্ আশ্ শরীফ)

যখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিধানসূমহের মধ্য হতে একটি বিধান পরিবর্তন করলেই কুফর এর হুকুম আরোপ করেছেন, আর যে ব্যক্তি শরীয়তের সকল 'হদ' (শাস্তি) অপসারণ করেছে এবং অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হারাম বস্তুকে হালাল করেছে তার অবস্থা কিরূপ হবে?

এছাড়া তাতারদের সম্পর্কে ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ফাতওয়া আমাদের উক্ত বিষয়কে দৃঢ় করেছে। অথচ তাদের আইন (আল ইয়াসিক) ইসলামী শরীয়তের কিছু কিছু বিধানকে শামিল করেছে। অতএব, ঐ অবস্থা আর এই অবস্থা একই এবং ঔ হুকুম এটার উপর প্রযোজ্য হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

অর্থঃ "অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু সাথে সাথে শিরক করে।" (সূরা ইউসুফঃ ১০৬)

সংশয়ঃ- তাতারদের ক্ষেত্রে আলিমদের ফাতওয়াসমূহ বর্তমান যুগের শাসকদের উপর প্রয়োগ করা বৈধ হবে না।

এ সন্দেহের তিনটি প্রতিবাদ করা হবে,

১। এ শাসকদেরকে কাফির আখ্যায়িত করার দলীল হচ্ছে শরীয়াতের অকাট্য প্রমানসমূহ।

২। কাফির আখ্যায়িত করার কারণ পাওয়া যাওয়ার দিক দিয়ে তাতারদের অবস্থার চেয়ে বর্তমান যুগের শাসকদের অবস্থা গুরুতর বেশী।

৩। ফলে তাদের সম্বন্ধে আলিমদের ফাতওয়ার তাকলীদ করা বৈধ হবে। কেননা ইতিপূর্বে আমি মৃত ব্যক্তির তাকলীদ বৈধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিরূপে আমরা তাদের তাকলিদের মুখাপেক্ষী হতে পারি, কেননা অকাট্য প্রমাণ ও ইজমার দলীল বিদ্যমান রয়েছে? এটা কিভাবে সম্ভব অথচ তাদের ফাতওয়া মনগড়া নয়, তারা তো এবিষয়ে ইজমা সংঘটিত হওয়ার কথা বলেছেন। অতএব, তাদের ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করা হচ্ছে, ইজমা অনুসারে আমল করা এটা দলীল শূন্য শুধুমাত্র তাকলীদ নয়।

সংশয়ঃ- নিশ্চয় এই শাসকদের সংবিধান প্রমাণ করেছে যে, আইন প্রণয়নের জন্য ইসলামী শরীয়াতই মূল উৎস।

তিনটি কারণে এটা প্রত্যাখ্যাতঃ

১। নিশ্চয় সংবিধান প্রমাণ করেছে যে, শরীয়তই মূল উৎস, একমাত্র উৎস নয়। অর্থাৎ এখানে আইন প্রণয়নের জন্য অন্য উৎস বিদ্যমান। অর্থাৎ "এখানে আইন রচনার জন্য আল্লাহর সাথে অন্য রব" বিদ্যমান। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিশ্চয় এই সংবিধানিক দলীল তাদের কুফরের বিষয় কে চুড়ান্তভাবে স্পষ্ট করেছে। কেননা এটা আল্লাহর সঙ্গে অন্য রব গ্রহণ করার বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থঃ তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম যাজকদের রব (প্রভু) বানিয়েছে এবং মারয়ামের পুত্র মাসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মাবুদের ইবাদত করবে। যিনি ব্যতীত মাবুদ হওয়ার যোগ্য কেহই নেই; তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। (সূরা তাওবাঃ ৩১)

এই রুবুবিয়াহ (প্রভুত্ব) বিপরীত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ছিল। অতঃপর আল্লাহ বর্ণনা করলেন যে, এ বিষয়ে তাদের আনুগত্য করলে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা হবে।

২। নিশ্চয়ই সংবিধান এটা প্রমাণ করছে না যে, শরীয়াতের বিধানই মূল উৎস বরং এটা প্রমাণ করছে যে, শরীয়তের নীতি মূল উৎস। এদুটির মধ্যে পাথর্ক্য বিদ্যমান। বিধান তো সকলের জানা। আর এটা প্রত্যেক মাসআলায় ব্যাখ্যামুলক বিধান। কিন্তু নীতি এটা তো সাধারণ নিয়ম কানুন। যেমনঃ ইনসাফের বাস্তব অবস্থা। মূলত এটা দায়িত্ব হতে অব্যহতি পাওয়ার বিষয়। অনুরূপভাবে অন্য বিষয় সম্পর্কে মানবরচিত আইন প্রণেতাগণ দাবী করে যে, এটা উক্ত নীতি অনুসারে হয়েছে এর মাধ্যমে আপনি জানতে পারলেন, এটা সাংবিধানিক দলীল এর উপরে সাব্যস্থ হয় না। অর্থাৎ শরীয়াতের বিধান অনুসারে ফায়সালা করার জন্য প্রশাসনকে বাধ্য করে না।

৩। যদি আমরা ধরে নেই নিশ্চয় এই কুফরী দলীল শরীয়তের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ফয়সালা করার উপর সাব্যস্থ হচ্ছে, তবে এখানে অন্য সাংবিধানিক দলীল রয়েছে যা ওটাকে পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। আর প্রতিষ্ঠিত ঘটনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হবে এটা এবিষয়ের উপর প্রমাণ করেছে যে, আদালতে মানবরচিত আইন দ্বারা ফায়সালা করা হবে। মোট কথা, যে ব্যক্তি ধারণা করে এই সাংবিধানিক দলীল এই শাসকদের কাফির হওয়াকে অপসারণ করছে। তবে সে ভুল করবে। বরং এই দলিল কুফর এর অপরাধে তাদের দোষী সাব্যস্থ করছে এবং ধ্বংস করছে। কেননা এটা আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছুকে আইন প্রণয়ণ করার জন্য উত্তম হিসাবে গ্রহণ করতে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করছে।

সংশয়ঃ নিশ্চয়ই নবী (সাঃ) ইসলামী শরীয়াহ ব্যতীত অন্য বিধান অর্থাৎ তাওরাত দ্বারা বিচার করেছিলেন। অতএব, এটা পরবর্তীতে তার উম্মাতের জন্য বৈধ হবে।

এটা এমন একটি সংশয়, যে জন্য উক্ত মন্তব্যকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। কেননা এর দ্বারা রসূল (সাঃ) কে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। ইবনে হাযম (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে রসূল (সাঃ) ইয়াহুদীদের দুজন ব্যভিচারী ব্যক্তির মধ্যে মানসুখ গ্রন্থ তাওরাত দ্বারা ফায়সালা করেছিলেন তবে সে মুর্তাদ।

(আল ইহকাম ফী উসুলিল আহকাম, ২য় খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

মুরতাদ হওয়ার কারণঃ অকাট্য দলিল প্রমাণ করছে যে নবী (সাঃ) ইসলামী শরীয়াহ ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা ফায়সালা করেননি, উক্ত মন্তব্য এর বিপরীত। কেননা কুরআন পূর্ববর্তী সকল শারীয়াতকে বাতিল করে দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

অর্থঃ আমি এ কিতাব (কুরআন) কে তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা নিজেও সত্যতাগুণে বিভুষিত এবং এর পরবর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐসব কিতাবের সংরক্ষকও। অতএব, তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এ কিতাব অনুযায়ী মিমাংসা করো। (সূরা মায়েদাঃ ৪৮)

রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ لَوْكَانَ مُوْسٰي حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَا عِيْ

অর্থাৎ যদি মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর গত্যান্তর ছিল না। (আহমাদ দারেমী)

উক্ত অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে নবী (সাঃ) মুসা (আঃ) এর কিতাবের অনুসরণ করতে পারেন?

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

অর্থঃ এবং আল্লাহ যখন নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করবার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী একজন রসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে, তিনি আরো বলেছিলেন তোমরা কী এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল আমরা স্বীকার করলাম, তিনি আরো বললেন- তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।

(সূরা আল ইমরানঃ ৮১)

অতএব, সকল নবী স্বীকার করেছিলেন যে, যখন তাদের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রেরণ করা হবে তাঁরা তাঁর আনুগত্য করবেন। সুতরাং কিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) মুসা (আঃ) এর শারীয়াহকে অনুসরণ করতে পারেন? উক্ত সন্দেহের কারণ হল ব্যভিচারী দুজন ইয়াহুদীদের রজম সম্পর্কীয় হাদীসের রেওয়ায়াত সমূহের একটি বর্ণনা যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি তাওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করব। তিনি তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তাদের রজম করা হল।

(আহমদ, আবুদাউদ)

দু'ভাবে এর প্রতিবাদ করা হবেঃ

প্রথমঃ এই রেওয়ায়াত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না। কেননা ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন, এর সনদে (সূত্রে) একজন অস্পষ্ট ব্যক্তি রয়েছে।

(ফাতহুল বারী, ১২শ খণ্ড, ১৭০-১৭১ পৃঃ)

দ্বিতীয়ঃ যদি আমরা এই রিওয়াতকে সহীহ্ বলে ধরেও নেই তবে আমরা ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে এটা বুঝা উচিৎ নবী (সাঃ) ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ দ্বারা ফায়সালা করেননি। এমন বিচারের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিধানকে এভাবে প্রতিবাদ করা উচিৎ, তাঁর (সাঃ) এর মন্তব্য "আমি তাওরাত অনুসারে বিচার করব" অর্থাৎ এই মাসআলার ক্ষেত্রে তাওরাতে যা বর্ণিত হয়েছে অনুরুপ ফায়সালা করব। এর দ্বারা উক্ত বিষয়ে তাওরাতের অনুসরণ করা হয় না। বরং উক্ত বিষয়ে তাওরাতে যা বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এবং উক্ত গ্রন্থে আল্লাহ বিধানে যা অবতীর্ণ করেছেন অনুরূপ রয়েছে, এতে কোন পরিবর্তন সাধন করেনি।

এই কাফির শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা ওয়াজিব

(শাইখ আহমাদ আঃ সালাম শাহীন এর রচিত গ্রন্থ ফাতহুর রহমান ফির রদ্দি আলা বায়ানিল ইখওয়ান থেকে নকল করা হয়েছে)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর মধ্যে উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বলেছেনঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

অর্থঃ নবী (সাঃ) আমাদের আহবান করলেন, আমরা তাঁর নিকট বাইয়াত করলাম। তিনি আমাদের থেকে যে সব আনুগত্যের বাইয়াত নিয়েছিলেন তা হচ্ছে, আমাদের সুখের ও দুঃখের আবস্থায় সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় এবং আমাদের স্বার্থ হানির অবস্থায় শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তি (শাসক) এর সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না, যতক্ষণ না তাকে প্রকাশ্য কুফরীতে দেখতে পাও, এবং এ ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে দলীল থাকবে। (সহীহ্ বুখারী হাঃ নং ৭০৫৫, ৭০৫৬)

ইমাম নববী বলেন, ক্বাযী আয়ায বলেছেনঃ আলেমগণ এবিষয়ে ইজমা করেছেন যে, নিশ্চয় ইমামত (নেতৃত্ব) কোন কাফির এর জন্য অনুষ্ঠিত হয় না এবং যদি তার উপর কুফর আপতিত হয় তবে সে অপসারিত হবে। তিনি এতটুকু বলেন, যদি তার উপর কুফর ও শারীয়াত পরিবর্তনকারী কর্ম আপতিত হয় অথবা বিদাআত প্রকাশ পায়, তবে সে নেতৃত্বর হুকুম হতে বের হয়ে যাবে, তার আনুগত্য বাতিল হয়ে যাবে, এবং তার বিরুদ্ধে (সশস্ত্র) যুদ্ধ করা, তাকে অপসারণ করা, এবং সম্ভব হলে ন্যায় পরায়ণ ইমাম প্রতিষ্টা করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি এটা সংঘটিত হয় তবে একটি দল হলেও কাফিরকে অপসারণ করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। বিদআতির ক্ষেত্রে এটা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যখন তারা তার বিরুদ্ধে সক্ষম হবে বলে ধারণা করবে তখন ওয়াজিব হবে। যদি বাস্তবে অক্ষমতা প্রমাণ হয় তখন সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব হবে না। এমতাবস্থায় স্বীয় দেশ ছেড়ে অন্যত্রে হিজরত করা উচিৎ এবং স্বীয় দ্বীন নিয়ে পলায়ন করা উচিৎ। (সহীহ্ মুসলিম, শরহে নাববীসহ, ১২শ খণ্ড, ২২৯পৃঃ)

হাফিজ ইবনে হাজার বলেন, রসূল (সাঃ) এর বাণী এ ব্যাপারে তো যাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে দলীল থাকবে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে কোন আয়াত বা কোন হাদীস এর অকাট্য প্রমাণ যাতে তাবীল (ব্যাখ্যা) করার কোন অবকাশ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা বৈধ হবে না। নববী বলেন, এখানে কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য অপরাধ বা গুনাহ। আর হাদীসের অর্থ ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তাদের ক্ষমতা বিষয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না এবং তাদেরকে প্রতিরোধ করবে না, কিন্তু তোমরা যদি তাদেরকে নিশ্চিৎ মুনকার (নিকৃষ্ট কাজ) কাজ করতে দেখতে পাও যেটা ইসলামের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত। অতএব যখন তোমরা এটা প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তোমরা যেখানেই থাকনা কেন সত্য কথা বলবে। অন্যরা বলেনঃ এখানে গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য অপরাধ ও কুফ্‌র, অতএব, স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসককে প্রতিরোধ করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, ইবনে ত্বীন, দাউদী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন আলেমগণ অত্যাচারী শাসকদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যদি কোন ফিৎনা ও যুলুম ব্যতীত তাকে অপসারণ করা সম্ভব হয়, তবে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব, নচেৎ ধৈর্য্য ধারণ করা ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমে ফাসিক ব্যক্তি কে ক্ষমতা প্রদান করা বৈধ নয়, যদি ইনসাফ করার পরে যুলুম করে, এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা বৈধ কিনা এ বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। সঠিক কথা হচ্ছে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু যদি কুফরী করে তবে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

(ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড ১০পৃঃ)

হাফিজ আরো বলেনঃ ইবনে বাত্তাল বলেন, ফকিহগণ ইজমা করেছেন, বিজয়ী শাসকের আনুগত্য করা ও তার সঙ্গে থেকে জিহাদ করা ওয়াজিব। কেননা এর মধ্যে রক্তপাতকে বন্ধ রাখা যায় এবং জনতাকে শান্ত রাখা যায়। তাদের দলীল এই হাদীস ও এর সহায়ক অন্যান্য হাদীস। এর থেকে তাঁরা কোন কিছুকে বাদ দেননি। কিন্তু যদি শাসক থেকে স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায় তখন তার আনুগত্য করা যাবে না, বরং সত্যবান ব্যক্তির পক্ষে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড ৯পৃঃ)

আলেমদের মতামত উল্লেখের পর আপনার নিকট স্পষ্ট হল, তারা ফাসিক শাসক কিংবা বিদআতী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ সামর্থ থাকাকে শর্তারোপ করেছেন।

কাযী আয়াজ বলেন, বিদআতীর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি তারা তাকে অপসারণ করার সামর্থ রাখে বলে মনে করে তবে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব (ইবনে ত্বীন দাউদি হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন অত্যাচারী শাসকদের সম্পর্কে আলিমগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যদি ফিৎনা ও যুলুম ব্যতীত তাকে অপসারণ করা সামর্থ হয় তবে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব। কিন্তু কাফির শাসক তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা শুধু বৈধই বলেননি বরং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা ওয়াজিব বলেছেন)। হাফিজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন, সহীহ্ মত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু যদি কুফরী করে তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা ওয়াজিব। ইবনে বাত্তাল বলেছেন কিন্তু যখন শাসকের পক্ষ হতে স্পষ্ট কুফ্‌র সংঘটিত হবে এমতাবস্থায় তার আনুগত্য করা বৈধ হবে না। বরং সামর্থবান ব্যক্তির জন্য তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। কাযী আয়াজ বলেন, যদি একটি দলের পক্ষেও সম্ভব হয় তবে কাফিরকে অপসারণ করার জন্য সশস্ত্র জিহাদ করা ওয়াজিব।

অপারগ অবস্থায় প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। কিন্তু এ সকল শাসকদের কাফির হওয়া সম্পর্কে দলীল স্পষ্ট হওয়া সত্বেও এবং এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সময় কেউ কেউ বলেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে সামর্থ রাখি না। এবং তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার আমাদের কোন ক্ষমতা নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

অর্থাৎ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।
(সূরা বাকারাঃ ২৮৬)

আমরা বলছি এটা এক দিক দিয়ে ঠিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তার সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। কিন্তু সামর্থ না থাকা শক্তি অর্জনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে বাতিল করে না। অতএব, মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে সরঞ্জাম প্রস্তুত করা, যাতে তারা কাফির শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে এবং অপসারণ করতে সক্ষম হয় এর প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থঃ তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে। (সূরা আনফালঃ ৬০)

ইমাম কুরতুবী বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর 'আমর' ওয়াজিব এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যতক্ষণ না কোন কারীনাহ (ইঙ্গিত) পাওয়া যায়। উসূল শাস্ত্রের আলেমগণ এমনটি মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

অর্থঃ আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছে করত তবে ওরা কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করতো, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন এজন্যে তাদেরকে তাওফীক দেননি এবং বলে দেওয়া হল তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক। (সূরা তাওবাঃ ৪৬)

ইমাম জাসসাস, উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, সরঞ্জাম হচ্ছে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য মানুষেরা যা প্রস্তুত করে ও তৈরী করে। এটা প্রস্তুতির অন্যতম। এটা জিহাদ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ করছে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থঃ "তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথা সাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে।"

(আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ১১৯ ও ১২০পৃঃ)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, অপারগতায় জন্য জিহাদ হতে বাদ পড়ার সময় জিহাদের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করা ওয়াজিব, কেননা যে জিনিস ব্যতীত ওয়াজিব পরিপূর্ণ হয় না, ওটাও অর্জন করা ওয়াজিব। (মাজমুউল ফাতওয়া, ২৮ তম খণ্ড, ২৫৯পৃঃ)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণীঃ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শিখল ও পরে তা ছেড়ে দিল সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা বলেছেন সে নাফরমানী করল।

(মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাবু ফাযলির রময়ি ওয়াল হাছ আলাইহি ওয়া জাম্মি মান আলিমাহু ছুম্মা নাসিয়াহ, বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, হাঃ নং ৩৬৮৭)

ইমাম নববী উক্ত হাদীসের পরে বলেছেনঃ উক্ত হাদীসে তীরন্দাজী শিক্ষা গ্রহণের পর তা ভুলে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এটা কোন কারণ ব্যতীত ছেড়ে দেবে তার জন্য এটা অত্যন্ত ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় কাজ।

(সহীহ্ মুসলিম শরহে নববী, ১৩শ খণ্ড, ৬৯পৃঃ)

যখন এই ধমকী ও হুমকী ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে যে তীরন্দাজী শিক্ষা গ্রহণ করেছে অতঃপর, চর্চা না করার কারণে ভুলে গেছে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রথমত শিক্ষা নেয়নি তার সম্পর্কে হুমকি কিরূপ হবে? পূর্বের আলোচনা দ্বারা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব এবং প্রস্তুতি না নেওয়া মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। যে শক্তি প্রস্তুত করা ওয়াজিব-

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

অর্থঃ উক্‌বা ইবনে আমির (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মিম্বারে দাড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রাখ প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা।

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমারত, বাবু ফাযলীর রময়ী ওয়াল হাছ আলাইহি, বাংলা মিশকাত, এমদাদীয়া পুস্তকালয় হাঃ/৩৬৮৫)

কিন্তু আমি এখানে কয়েকটি বিষয়ের উপর সতর্ক করতে চাই

প্রথমতঃ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ এর আনুগত্য, ইখলাছ (আন্তরিক হওয়া), নিঃসার্থতা, ধৈর্য্য, দান, উৎস, তাওয়াক্কুল, বিশ্বাস ও ইত্যাদি বিষয়কে অন্তরে রোপন করে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঈমানী প্রস্তুতি গ্রহণ করা হতে অমনোযোগী হওয়া উচিৎ নয়। কেননা ইখলাছ ও আনুগত্য সাহায্য পাওয়ার পূর্বশর্ত ইমাম নাসায়ী সাদ (রাঃ) এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। যখন তিনি ধারণা করলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিম্মপর্যায়ের সাহাবিদের মধ্য হতে তার মর্যাদা বেশী। এ কথা শ্রবণ করে নবী (সাঃ) বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের দুর্বল ব্যক্তিদের দু'আ, প্রার্থনা ও ইখলাসের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করে থাকেন।

(নাসায়ী, জিহাদ অধ্যায়, দুর্বলদের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করা অনুচ্ছেদ। আব্দুল কাদির এটাকে সহীহ্ বলেছেন, আত তালীক আলা যাদিল মায়াদ ৩য় খণ্ড ১০১পৃঃ)

কেননা গুনাহ পরাজয়ের কারণ। উহুদের যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় সাহায্য মুসলমানদের পক্ষেই ছিল। কিন্তু যখন তীরন্দাজগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশ অমান্য করল এবং স্বীয় স্থান হতে অবতরণ করল তখন এটা পরাজয়ের রূপ নিল।

দ্বিতীয়তঃ জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব, এর দ্বারা আমরা এটা বলছিনা যে, ইলম শিক্ষা, লোকদের জন্য সত্য প্রকাশ করা, দাওয়া এর কাজ করা, আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহয়ি আনিল মুনকার ইত্যাদি হতে অমনোযোগী হবে।

তৃতীয়তঃ অক্ষম অবস্থায় আমাদের এটা উচিৎ হবে না যে, এই সকল তাগুতদের সঙ্গে নরম নরম কথা বলব এবং তাদের প্রসংশা করব, যেমন কোন নেতা পর্যায়ের ভাইয়েরা করে থাকেন। বরং আমাদের উচিৎ হবে, এ তাগুতদের অস্বীকার করা ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। কেননা এটা তাওহীদের জন্য আবশ্যক।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে। (সূরা বাকারাঃ ২৫৬)

শাইখ আব্দুল লতিফ ইবনে আব্দুর রহমান বলেছেন, নিশ্চয় মূল ভিত্তি সঠিক হবে না এবং দৃঢ় হবে না যতক্ষণ না আল্লাহর শত্রুদের বর্জন করা হবে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও জিহাদ করা হবে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। আর তাদের সঙ্গে ঘৃণা ও দুশমনির মধ্যেই আল্লাহর নৈকট্য নিহিত আছে। (আর রাসায়িল আল মুফিদাহ ৬০পৃঃ)

চতুর্থতঃ সাধারণভাবে সকল মুসলমানের এবং বিশেষকরে ইসলামী আন্দোলনের উচিৎ হবে, শাসন বিষয়ের মাসআলা শিক্ষা গ্রহণ করা, লোকদের মধ্যে তাগুতকে অস্বীকার করার বিষয়টি প্রচার করা এবং এটাও প্রচার করা কর্তব্য যে মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে এবং সামর্থ হলে তাদেরকে অপসারণ করতে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব। অপারগতার সময় এটার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। উক্ত প্রচারণার দ্বারা আল্লাহর শত্রুদের ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে এবং সাহায্য ও সহযোগিতাকারীদের আকর্ষণ করা যাবে। তদ্রূপ এর মাধ্যমে জাতিকে অমনোযোগিতা থেকে জাগ্রত করা যাবে এবং তাদের অধঃপতন ও অনুন্নতির কারণ বর্ণনা করা যাবে।

পঞ্চমতঃ কাফির শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব। আমাদের এ কথার দ্বারা এটা বুঝা উচিৎ হবে না যে, কোন অনিয়মতান্ত্রিক কর্মের মাধ্যমে আমরা বিদ্রোহ করতে চাচ্ছি, যার দ্বারা কল্যাণের চেয়ে বড় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমরা সত্য ও ইসলামের সঙ্গে সকল মান ঠিক রেখে সুদৃঢ় পরিকল্পনা ও উত্তম প্রস্তুতির কথা বলছি আর এ উপকরণের উপর অন্তর নির্ভর করবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

অর্থঃ "আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" (আল ইমরানঃ ১২৬)

দ্রুত ও তাড়াহুড়া করা যাবে না। কেননা বিষয়টি দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন। যখন মুসলমানগণ দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্ধারিত শক্তি ও সামর্থ পরিপূর্ণ করবে এবং সাফল্যের ব্যাপারে প্রবল ধারণা জন্মিবে তখন কাফির শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য ঝাপিয়ে পড়বে।

উপসংহারঃ

হে মুসলিম ভাই, পরিশেষে আমরা আশা করছি, আপনি এই পুস্তিকা ধৈর্যের সাথে পাঠ করবেন, যেন এ শাসকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার হুকুম আপনার জ্ঞান ও অন্তরে স্থায়ী হয় ও গেঁথে যায়। এটা হচ্ছে তারা কাফির শাসক। তারা দ্বীন ইসলাম হতে সবিস্তারে ও পুরোপুরিভাবে মুর্তাদ হয়ে গেছে। কেননা তাদের হুকুম বিষয়ে মানবরচিত আইন এর জন্য কাফির আখ্যায়িত করা যায়, এরূপ চারটি কারণের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বয়ং এর প্রত্যেকটিকে কাফির আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাফির প্রতিপন্ন করা যায় এর কারণসমুহ নিম্নরূপ।

১/ আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা পরিহার করা।

২/ আল্লাহর আইন এর বিপরীত আইন প্রণয়ন করা।

৩/ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর বিপরীত ফয়সালা করা।

৪/আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ) ব্যতীত অন্যের আনুগত্য করা।

আপনি যখন এটা জানতে পারলেন তদ্রূপ এটাও জেনে নিন যে এদের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে তাদেরকে অপসারণ করা ওয়াজিব। তাদের সাথে ও তাদের কাফির দলগুলোর সাথে দুশমনি করে বিরোধিতা করা ওয়াজিব। অতএব, হে আমার মুসলিম ভাই, আপনার ও আপনার সকল ভাই এর অবস্থান হবে আপনার মুজাহিদীন ভাইদের সাহায্য করা-যারা যুদ্ধ করতে এবং এ সকল কাফির শাসকদের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত। তারা (আল্লাহর নির্দেশে) তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হতে তখনো বিরত থাকবে না যতক্ষণ না তারা দুটি কল্যাণের একটি লাভ করবে।

১। হয়তো ঐসাহায্য যা আল্লাহ এই উম্মতের জন্য ওয়াদা করেছেন।

২। নচেৎ শাহাদাত বরণ করা। এরাই হচ্ছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মধ্যে তায়িফা আল মানসুরাহ (সাহায্য প্রাপ্ত দল), যারা আল্লাহর ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না। তারা ভয় পায় না, (প্রশাসনের তাগুতকেও না, তাদের কাফির দলকেও না, তাদের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এবং ঐ সকল অনুগত ব্যক্তিদেরকেও না, যারা এই দ্বীন হতে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাদের জেল জুলুম এর ভয়ে ভীত নয়)। তারা তাদের নরম নরম কথা বলে না যেমনটি শোধনকারী ও শিক্ষা দানকারী আলেমগণ করে থাকেন। যারা জাতিকে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এমন শ্লোগান দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করেন। শোধন করা ও শিক্ষা প্রদান করা এটা একটি ওয়াজিব বিষয়। কিন্তু এটা শুধু দ্বীন নয়, যেমন- কারো কারো ক্ষেত্রে এটা মনে করা হয়। এরা তো ঐ সকল লোক যারা এরূপ মাদ্রাসায় (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) অবস্থান করেন। তারা দাবি করেন, লোকদেরকে জামা খাটো করা ও দাড়ি লম্বা করার পদ্ধতি শিক্ষা দেন, (এই দুটি নিঃসন্দেহে সুন্নাহ)। তারা দাবী করেন লোকদেরকে

এমন বিষয় শিক্ষার মাধ্যমে বিনা রক্তপাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যেমন- বর্তমানে এটাই খারেজীদের দুঃসাহসী আমল দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে, তারা খারেজী দ্বারা ঐ সকল মুজাহিদদের বুঝাচ্ছে যারা এই দ্বীনের প্রতিরক্ষায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করছেন। যারা এই উম্মতের মস্তক উন্নত করছেন এবং এটা প্রমাণ করছেন, এই জাতি সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে যতক্ষণ জিহাদই তাদের পথ বলে বিবেচিত হবে। অতএব, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর। যারা স্বীয় মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে এই উম্মাতের শক্তি চুর্ণ করে দিয়েছে? তারা দাবী করে আল্লাহর কসম আমরা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছি না, সুতরাং এটাই তাদের অবস্থা ও বক্তব্যের ভাষা। হে মুসলিম ভাই, দ্বিতীয় প্রকার গুণে গুণান্বিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। অথচ সত্য প্রথম দলের সঙ্গেই রয়েছে, যাদের সম্বন্ধে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে সম্পর্কে আস সাদিক ওয়াল মাসদুক (সাঃ) সংবাদ প্রদান করেছেন। সাবধান! এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের তায়িফাহ আল মানসুরা (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) এর বৈশিষ্ট্য। (তারা যুদ্ধকারী) হ্যাঁ তারাই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী।

ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, এই উম্মাতের ছোট একটি দল হক এর উপর থেকে (যুদ্ধ করবে)। বিরোধীদের উপর সর্বদা বিজয়ী থাকবে, এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি মাসিহুদ্দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

(সহীহ আবু দাউদ, এটা ভিন্ন শব্দে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে)

এ গুণাবলী এসকল ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে প্রমাণিত হয় না, যারা ডান হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে বন্দুক বহন করেন। হ্যাঁ এটাই তাদের গুণাবলী। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের সঙ্গে মিলিত করেন, এবং আমরা তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে চাই না যারা বলে অথচ বাস্তবায়ন করে না। হে মুসলিম ভাই, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ত্বায়িফাহ মানসূরাহ এর আর্দশকে আকড়ে ধরার জন্য ছুটে যান, সাহায্য করুন এবং সমর্থন করুন, যারা লোকদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করেন। তাদের সাথে যুক্ত হওয়া সম্পর্কে দ্বিধা করা হতে সাবধান থাকুন! কেননা তাদের হতে বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্চনা ও ধ্বংস বিদ্যমান। এটা আমার ও আমার ভাইদের উপদেশ স্বরূপ পছন্দ করেছি যদি আমি সত্য উপস্থাপন করে থাকি তবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি নিজ থেকে করে থাকি তাহলে শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর থেকে দায় মুক্ত।

আল্লাহর সাহায্যে উক্ত পুস্তিকার লিখনি সমাপ্ত হলঃ ২৮শাওয়াল, ১৪২০ হিজরী, শুক্রবার সকাল, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ইংরেজী, সিডনি, অষ্ট্রেলিয়া।
লেখক, আবু সুহাইব আব্দুল আযিয ইবনে সুহাইব।

গ্রন্থপঞ্জী

**আল আদিল্লাতুন নাকলিয়া ওয়াল আকলিয়া আলা হুরমাতী দুখুলিল বারলামাত আত তাশরীইয়া, শাইখ আবু ত্বালাল আল কাসেমী।

**আল ইসলাম বাইনা জাহলী আবনানীহ ওয়া ইজযি আলমানিহ, শহীদ (আমরা এরুপ ধারণা করি) আব্দুল কাদির ঊদাহ। পঞ্চম মুদ্রণ, আল ইত্তিহাদুল ইসলামী।

**আল ইসলাম ওয়াল আলমানিয়া ওয়াজহান লিওয়াজহিন, ডঃ ইউসুফ আল কারযাবী। প্রথম মুদ্রণ দারুস সাহওয়া, কায়রো।

**আল ইমামাতুল উযমা ইনদা আহ্লিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার আদ দুমাইজি। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৯ হিজরী, দ্বার তাইয়িবা, রিয়াদ।

** ইমতাউন নযর ফী কাশফী সুবহাতি মুর্জিয়াতিল আসর, শাইখ আবু মুহাম্মদ ইছাম আল মাকদীসি।

**আল ঈমান আরকানুহ, নাওয়াকিযুহু, ডঃ মুহাম্মদ নাঈম ইয়াসীন। দারুত তাওযী'ত ওয়ান নাশারিল ইসলামিয়া, কায়রো।

**আল বিদায়াহ ওয়াল নিহায়া, হাফিয ইবনে কাসীর। প্রথম মুদ্রণ, মাকতাবাতুল মাআরিক, বৈরুত।

**বায়ান বিউনওয়ান "ইখসা ফালান তা'দু কাদরাক ওয়া ইন্না জুনদানা লাহুমুল গালিবূন" জামাআতে ইসলামিয়া, মিসর।

**বায়ান বিউনওয়ানি আসদা ওয়া আরা, শাইখ রিফায়ী আহমাদ ত্বাহা, জামাআতে ইসলামিয়া এর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, মিসর।

**আত তিবইয়ান ফী আহাম্মী মাসায়িলিল কুফর ওয়াল ঈমান, আবু আমর আব্দুল হাকিম হাসসান।

**আত তাজরিবাতুল জিহাদিয়া ফী সূরিয়া, উসতাদ, উমার আব্দুল হাকিম, আবু মুসআব আস সূরী নামে প্রসিদ্ধ, পাকিস্থানে মুদ্রিত।

**তাহরীযুল মুজাহিদীন আলা কিতালিত ত্বাওয়াগীত আল মুর্তাদ্দীন, রচনায়; আবু কুতাইবা আশ শামী। প্রচার ও পরিবেশনে দারুল মাআলিম।

**তাহক্বীকুত তাওহীদ, আবু হাতিম মাহমুদ আব্দুল মাজীদ।

**তাহকিমুশ শারীআহ ওয়া সিলাতুহ বি আসলিদ্দীন, ডঃ ছালাহ আস ছাবী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, দারুল ই'লাম আত দাওলা, কায়রো।

**তাহকীমুল কাওয়ানীন, আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আলি শাইখ। এর পরবর্তীতে রয়েছেঃ ওয়াজুবু তাহকীমি শারয়িল্লাহ ওয়া নাবয়ু মা খালাফাহ্, শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায, প্রথম মুদ্রণ, প্রকাশনায় দারুল মুসলিম, রিয়াদ।

**তাফসীরুল কোরআনিল আযীম, হাফিজ ইবনে কাসির, প্রথম মুদ্রণ, দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

**আল জামি'ফী ত্বালাবিল ইলমিশ শারীফ, শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আযীয, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১৫ হিজরী।

**টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংবাদপত্র, সিডনী হতে ১৬-০৪-১৯৯৭ ইংরেজী।

**আল হাকিমিয়াহ, আল ইত্তিহাদুল ইসলামী হতে প্রকাশিত, অস্ট্রিয়া (মাসজিদুস সাহাবা)।

**আল হাবশী শুযুযুহ ওয়া আখতাউহ, শাইখ আব্দুর রহমান দিমাশকী, তৃতীয় মুদ্রণ।

**হাক্বীক্বাতুল খিলাফ বাইনাস সালফিয়াতিশ শারয়িয়াহ ওয়াদ্দিআয়িহা ফী মাসায়িলিল ঈমান, শাইখ ডঃ মুহাম্মদ আঃ রহীম, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪১৯ হিজরী।

**আল হুক্মু, বিগাইরী মা আনযালাল্লাহু বাইনাত তারকী ওয়াত তাবদীল, শাইখ মুহাম্মদ মুস্তফা আল মিকরা (আবূ ঈসার), বিশেষ পুস্তিকা।

**আল হুকুম ওয়াত তাহাকুম ফী খিতাবিল ওয়াহী, শাইখ আব্দুল আযীয মুসতাফা কামিল, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৫ হিজরী, প্রকাশনায় দারুল তাইয়িবাহ।

**আল হিওয়ার মায়াত ত্বাওয়াগীত মাকবারাতাত দাওয়া ওয়াত দুয়াত, আবু হাতিম মাহমুদ আব্দুল মাজিদ।

**আল খুতুতুল আরীযাহ ফী মিনহাজিল জামাআতিল ইসলামিয়াহ আল মুকাতিলাহ, (লিবিয়া), শাইখ আবুল মুনযির আসসায়িদী।

**রুদুদ আলা আবাতীল ওয়া শুবহাত হাওলাল জিহাদ, ডঃ বূত্বী এর রচিত গ্রন্থ আল জিহাদ ফিল ইসলাম এর প্রতিবাদে লেখা হয়েছে। শাইখ আব্দুল মালিক আল বাররাক।

**আর রদ্দ আলমামুন, শাইখ আবূ উবাইদাহ আব্দুল কারীম আশ শাজলী (আল মাগরীবি), দ্বিতীয় মুদ্রণ, তাবআহ্ মাতবুআতিল উকুফ, আদ দারুল বাইযাহ।

**আর রাসায়িলুস সালাফিআহ, ইমাম শাওকানী, প্রথম মুদ্রণ, দারুল কিতাব আল আরাবী বৈরুত।

**রিসালাহ (আল নাসিহাহ্ লিল উম্মাহ) লি আদাদিম মিন উলামায়িস সাউদিয়াহ আল্লাতি তাহুচ্ছু আলা মুনাসারাহ আহলিস সুন্নাহ ফিল ইয়ামান আল মুবারাকাহ্।

**রিসালাতুল মুনাশাদাহ, লি আদাদিম মিন উলামায়িস সাউদিয়া, আল্লাতি বুয়িসাত নাসিহাতাল লিশ- শাইখ ইবনে বায।

**রিসালাহ্ মাকতুহাহ্ ইলা ফাহাদ ইবনে আবদিল আযীয, শাইখ উসামাহ ইবনে লাদিন, ০৫/০৩/১৪১৬ হিজরী, ০৩/০৮/১৯৯৫ ইংরেজী।

**সাবীলুন নাজাত ওয়াল ফিকাক মিন মুওয়ালাতিল মুর্তাদ্দীন ওয়া আহলিল ইশরাক, শাইখ হামদ ইবনে আতীক, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, রিয়াদ।

**সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহীহাহ, শাইখ আলবানী তাবআতুল মাকতাবিল ইসলামী ওয়া মাকতাবাতিল মা'আরিফ, রিয়াদ।

**আস্ সালাফ ওয়াস সালাফিউন রু'ইয়াহ মিনাদ দাখিল, উস্তাদ ইবরাহীম আসআস, দারুল বায়ারিক।

**শারহুল আকিদাতিত ত্বাহাবিয়াহ, ইমাম ইবনে আবিল আয হানাফী, প্রথম মুদ্রণ, মুয়াসসাসাহ আর রিসালাহ, বৈরুত।

**শারীত বিউনওয়ান হুকমুদ দুখূল ফিল বারলামানাতিত তাশরীইয়াহ লিআদাদিম মিনাল উলামা।

**শারিত বিউনওয়ান ফাসলুদ দ্বীন আনিদ্ দাওলাহ, শাইখ আব্দুর রহীম আত্ ত্বাহহান।

**শারিত্ব মারয়ি বিউনওয়ান কাইফিয়াতু ইত্তিবাইন নবী (সাঃ), শাইখ ওয়াজদী গানীম।

**শারিত নাওয়াকিযুল ইসলাম, শাইখ বাশার ইবনে ফাহদ আল বাশার।

**শিফাউ সুদুরিল মুমিনীন, ডঃ আইমান আল জাওয়াহিরী, আমির জামাআতুল জিহাদ, মিসর, ১১তম প্রকাশ, ইসদারাত আল মুজাহিদীন, মিশর, প্রথম মুদ্রণ ১৯৯৬ ইংরেজী।

**আশ শুরা আল মুফতারা আলাইহা ওয়াদ্ দীমকারাতিয়া, শাইখ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল ফাযাযী, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৭ হিজরী।

**ত্বায়াতু উলিল আমর হুদুদুহা ওয়া কুয়ূদুহা, ডঃ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল মিসআরী।

**ত্বাগুত, শাইখ আব্দুল মুনয়িম মুসতাফা হালিমাহ (আবু বাছীর), প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৭ হিজরী, দারুল বায়ারিক।

**আত-ত্বারীক ইলাল খিলাফাহ, আবূ আম্মার মুহাম্মদ ইবনে হামিদ আল হুসাইনি, প্রকাশনায়, দারুত তাইয়িবাহ, রিয়াদ।

**আকীদাতুস সালাফিয়ীন ফী মীযানি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, শাইখ মুহাম্মদ আবুন-নিয়াত মাগরীবি।

**আল আলমানিয়া, শাইখ ডঃ সাফার ইবনে আব্দুর রহমান আল হাওয়ালী, তাবআতুশ শারয়িয়াতুল উলা ১৪১৮ হিজরী, মাকতাবুত তাইয়িব, কায়রো।

**আল আলমানিয়া ওয়া ছামারুহাল খাবীসাহ, শাইখ মুহাম্মদ শাকির আশ শারীফ, প্রথম মুদ্রণ, প্রকাশনায় দারুল ওয়াত্বান, রিয়াদ।

**গায়াতুল বায়ান ওয়াত তাদক্বীক্ব ফী ইকামাতিল হুজ্জাহ আলা কাযীত তাহক্বীক, শাইখ আলী বিন হাজ্জ, প্রথম মুদ্রণ, আল জাযায়ীর।

**ফা'লাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, শাইখ ডঃ সালাহ আস সাবী।

**ফাতহুর রহমান ফির রদ্দি আলা বায়ানিল ইখওয়ান, শাইখ আহমদ আবদুস সালাম শাহীন।

**ফাতহুল ক্বাদীর, ইমাম শাওকানী, প্রথম মূদ্রণ, দারুল ফিকর, বৈরুত।

**ফাতহুল মাজিদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, শাইখ আব্দুর রহমান আলি শাইখ, প্রথম মুদ্রণ, দারুল হাদীস, কায়রো।

**ফাতওয়া খাতীরাহ আযীমাতুশ শান ফী হুকমিল খুতাবা ওয়াল মাশায়িখ, আল্লাযীনা দাখালু ফী নুসরাহ ওয়া তায়ীদিল মুবাদ্দিলীনা লিশারীআতির রহমান, শাইখ আবু কাতাদাহ আল ফিলিস্তিনী, প্রথম মূদ্রণ, মূদ্রণে মারকাযুন নূর লিল ই'লামিল ইসলামী, ডেনমার্ক।

**আল ফারদু ওয়াদ দাওলাহ ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়া, ডঃ আব্দুল কারীম যায়দান, চতুর্থ মুদ্রণ, আল ইত্তিহাদুল ইসলামী।

**ফুসুল আনিস সিয়াসাতিশ শারয়িয়াহ, শাইখ আব্দুর রহমান, আব্দুল খালিক দারুত তাকওয়া।

**ফী যিলালিল কুরআন, উসতাদ সাইয়িদ কুতুব, ১৫তম মুদ্রণ, দারুশ শুরুক্ব, বৈরূত।

**আল ক্বাওলুল ক্বাতি, ফীমান ইমতানায়া আনিশ শারায়ি, ইছামুদ্দীন দারবালাহ ও আসিম আব্দুল মাজীদ, প্রকাশনায়, জামাআতে ইসলামীয়া, মিশর।

**কালিমাতু হাক্ব (ওয়া আসলুহা মুরাফাআহ ফী কাযিয়াতিল জিহাদ আমামাল মাহকামাতিল আসকারিয়া, বিমিছর) শাইখ, ডঃ, উমার আব্দুর রহমান, মুদ্রণে, দারুল ইতিসাম, মিশর, রচনায় আল জামাআতুল ইসলামিয়া, মিশর।

**আল কাওয়াশিফুল জালি'য়া ফী কুফরিদ দাওলাতিস সাউদিয়া, উসতাদ মুরশিদ ইবনে সুলাইমান, আন নাজদী, প্রথম মুদ্রণ।

**কাইফা কাতালনাস সাদাত, ইউহওয়া হাযাল কিতাব মুকাবালাহ মায়া আহাদি ক্বিয়াদিল জামাআতিল ইসলামিয়াহ, মিশর, মুজাহিদ আবূদুয যুমার, লিকাতিবি মিশরী আলমানী।

**লিমাযা খাফু মিনাল লাজনাতিশ শারইয়াহ? মায়া দিরাসাহ আন ওয়াকিয়িল ক্বাযা ফিস সাউদিয়া, সুলাইমান আন নাহদী, প্রথম মুদ্রণ।

**লিমাযা নারফুযুল আলমানিয়া, রচনায় মুহাম্মদ বাদরী।

**মাতা ইউশতারাতুল ইসতিহলাল লিত্ তাকফীর, শাইখ আবু কাতাদাহ আল ফিলিস্তিনী।

**ম্যাগাজিন আল ফাজর ১৭, ২১, ২২, ২৬, ৪৭ ও ৪৮নং সংখ্যা, প্রকাশনায়, মারকাযুল ই'লামিল ইসলামী, ডেনমার্ক।

**ম্যাগাজিন, আল মিনহাজ, ১, ২ ও ৩ নং সংখ্যা, লন্ডন হতে মুদ্রিত।
**ম্যাগাজিন, নিদাউল ইসলাম, ১২ ও ২৭নং সংখ্যা, প্রকাশনায়, শাবাবুল হারকাতিল ইসলামিয়া, সিডনি অষ্ট্রেলিয়া।
**ম্যাগাজিন, মায়ালিমুল জিহাদ, ১ম সংখ্যা, প্রকাশনায় জামাআতুল জিহাদ, মিশর।
**মাজমূউল ফাতাওয়া। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)।
**মায়ালিমুল ইনতিলাকাহ আল কুবরা ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ, শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল হাদী আল মিশরী, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ।
**মা'রিফাতু হুকমিল্লাহি তায়ালা ফী হুক্কামি বিলাদিনা, শাইখ আবু কাতাদাহ আল ফিলিস্তিনী।
**মা'লুমাত মুহিম্মাহ ফিদ্দীন লা ইয়া'লামুহা কাছীরুম মিনাল মুসলিমীন, মুহাম্মদ জামীল যাইনু।
**মাফহুমুল হাকিমিয়াহ ফী ফিকরিশ শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম, রচনায় আবু উবাদাহ আল আনছারী, প্রথম মূদ্রণ, পেশওয়ার।
**আল মাকালাতুস সুন্নিয়া ফী কাশফী যালালাতিল ফিরকাতিল হাবশিয়া, প্রথম মুদ্রণ, দারুল মুহাজ্জার সিডনী।
**মিন শুবহিল্লাযীনা লাম ইউকাফফিরুল হুক্কামাল মুবাদ্দিলীনা লিশারীআতীর রহমান, শাইখ আবু কাতাদাহ আল ফিলিস্তিনী।
**মীছাকুল আমালিল ইসলামী লিল জামাআতিল ইসলামিয়া, মিশর, শাইখ ডঃ উমার আব্দুর রহমান, প্রকাশনায় জামাআতে ইসলামীয়া, মিশর।
**নাহবু দাওয়াতি ইসলামিয়া রশিদিয়া, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির হানাদী, প্রথম মুদ্রণ, মুদ্রণে মাকতাবাতুল আবীকান, সউদিয়া।
**নাওয়াকীযুল ঈমান আল কৃওলিয়া ওয়াল আমালিয়া, ডঃ, আব্দুল আযীয, আব্দুল লতীফ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, দারুল ওয়াতান রিয়াদ।
**হুমূমুল মুসলিম আল ইয়াওমিয়া, ফাতাওয়া শাইখ, আব্দুল হামীদ কাশাক, দারুল মুখতার আল ইসলামী কায়রো।
**ওয়াকফাত মাআশ শাইখ আলবানী হাওলা শারীত্ব মিন মিনহাজিল খাওয়ারিজ" শাইখ আবু ইসরা আল উসউত্বী, প্রথম মুদ্রণ, প্রকাশনায়, জামাআতে ইসলামিয়া, মিশর।
**আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, ডঃ, মুহাম্মদ আল কাহতানী, পঞ্চম মুদ্রণ, দারুত তাইয়িবাহ, রিয়াদ।

সুব্হা-নাকা আল্ল-হুম্মা, ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আংতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।